পরম প্রেম

নীরেন্দ্র গুপ্ত

BIRCHANDRA STATE CENTRAL LIBRARY
AGARTALA, TRIPURA

চিরন্তনী প্রকাশ ভবন
৪এ, হেমচন্দ্র নস্কর রোড কলিকাতা-১০

প্রথম প্রকাশ : চৈত্র ১৩৪১

দাম : ১৭.০০

সর্বস্বত্ব গ্রন্থকার কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রচ্ছদ : শিল্পী ত্রিদিবকুমার চক্রবর্তী

প্রকাশিকা : মাধুরী দত্ত। ৪এ হেমচন্দ্র নস্কর রোড, কলিকাতা-১০।
মুদ্রক : শ্রীদুলাল চন্দ্র ভূঞা। সুদীপ প্রিণ্টার্স, ৪/১এ সনাতন শীল লেন,
কলিকাতা-১২

শ্রদ্ধেয়া মামিমা

শ্রীযুক্তা সাধনা দাশগুপ্তাকে

পরম প্রেম

'পরম প্রেম' গ্রন্থে দুই পর্বের পটভূমিতে দুটি নদী—যমুনা আর গঙ্গা। যমুনা-পুলিনে প্রেম-বিজয়িনী শ্রীমতী রাধা, গঙ্গাতীরে প্রেম-সন্ন্যাসিনী দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া। প্রথম চরিত্রটি পৌরাণিক, দ্বিতীয়টি ঐতিহাসিক। প্রেম-প্রবাহিনীর ধারা বয়ে এসেছে পৌরাণিক যুগ থেকে ঐতিহাসিক যুগে। দুটি পর্ব তাই এক অচ্ছেদ্য ভাবসূত্রে গ্রথিত।

ভারতীয় বৈষ্ণবধর্মের অলৌকিক প্রেমচেতনা আর তার ব্যাপক ও গভীর অনুভূতি সমগ্র বিশ্বের ভাব-ভাণ্ডারে অতি দুর্লভ। এ কেবল ভক্তের সাধন-সম্পদ নয়, শিল্পী-মানসের অজস্র সৃষ্টির মহোৎসব।

বাঙ্গালীর কল্পনা ও মনীষা এ রসানুভূতিকে চৈতন্যদেবের জীবন ও সাধনার সঙ্গে যুক্ত করে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন গড়ে তুলেছিল। এ দর্শন একান্তভাবেই বাংলার নিজস্ব অবদান এবং তার সংস্কৃতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত। শ্রীরাধার ভাবমূর্তি পরিকল্পনায় সর্বভারতীয় স্পর্শ আছে, কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়ার ভাবমূর্তি বাঙ্গালীর বিশিষ্ট একক পরিকল্পনায় বিভাসিত। বিষ্ণুপ্রিয়া বাংলার সাধনা আর শ্রীরাধা সর্বভারতের সিদ্ধি।

দুইরূপে লীলায়িত এই যে পরিপূর্ণ অখণ্ড পরমপ্রেম তার প্রভাব নিত্য সনাতন, প্রকাশ নিত্য নূতন।

সূচী

প্রসঙ্গ কথা	…	…	১—১২
প্রথম পর্ব : শ্রীমতী	…	…	১৩—১২৫
দ্বিতীয় পর্ব : বিষ্ণুপ্রিয়া	…	…	১২৭—২২৫
টীকা	…	…	২২৬—২৪০

লেখকের অন্য বই

প্রবন্ধ

বাংলা সাহিত্যের কাহিনি

মানব সভ্যতার কাহিনী

কবিতা

প্রথম জাগ্রত পাখি

সীমা পারাবার

তোমায় দিলাম

একা পরস্পর

নাটক

পরশ-রতন

নচিকেতা

জীবনী

রাধা কাহিনী

প্রসঙ্গ-কথা

'পরমপ্রেম' গ্রন্থের উদ্দেশ্য তত্ত্ববিশ্লেষণ নয়, সাহিত্যরস পরিবেশন। কিন্তু লীলাকাহিনী তত্ত্ববিরোধী হলেও রসাভাস ঘটে। তাই এর মূলে যে-সব তত্ত্ব আছে ভূমিকায় সে-বিষয়ে সাধ্যমত কিছু বলে নেওয়া ভাল।

উপনিষদের কাহিনীতে দেখা যায় বিত্তদ্বারা অমৃতত্ব লাভ করা যায় না জেনে যাজ্ঞবল্ক্যের স্ত্রী মৈত্রেয়ী বলেছিলেন—যার দ্বারা আমি অমৃতা হব না তা দিয়ে কি করব? 'যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাম্।'

তাহলে প্রশ্ন জাগে, কি দিয়ে লাভ করা যায় এ অমৃতত্ব?

এ প্রশ্নের বহুবিধ উত্তরের মধ্যে সবচেয়ে সুস্পষ্ট উত্তর পাওয়া যায় ভাগবতে —'ময়ি ভক্তিহি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে।'

শ্রীকৃষ্ণ নিজমুখে বলছেন, তাঁর প্রতি ভক্তিদ্বারাই অমৃতত্ব লাভ করা যায়।

তাহলে উপনিষদের প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেল ভাগবতে।

কিন্তু তার পরেও প্রশ্ন থাকে—কি এই ভক্তি?

ভক্তির স্বরূপ বহু শাস্ত্রপুরাণে বহুভাবেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে। খুব

সংক্ষেপে এবং সুন্দরভাবে ভক্তির মূল স্বরূপটি প্রকাশিত হয়েছে 'নারদভক্তিসূত্র' গ্রন্থে—'সা ত্বস্মিন্ পরমপ্রেমরূপা।' অর্থাৎ ভক্তি হচ্ছে তাঁর প্রতি পরমপ্রেমরূপা। ভাষান্তরে ওই একই কথা বলা হয়েছে 'শাণ্ডিল্যসূত্র' গ্রন্থে—'সা পরানুরক্তিরীশ্বরে।' অর্থাৎ ঈশ্বরে পরম অনুরক্তিই ভক্তি। তাহলে ভক্তির যথার্থ স্বরূপ হচ্ছে এই পরম-অনুরাগ বা পরমপ্রেম।

পরমপ্রেম হচ্ছে প্রেমের চরম বিকাশ, যা ভক্তিরও শেষ সীমা।

সাধারণত ভক্তি দু ধরণের—বৈধী ভক্তি ও রাগময়ী ভক্তি। বৈধী ভক্তিতে শান্তরস আর রাগময়ী ভক্তিতে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই চারটি রস আছে। এর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মধুররস থেকেই জন্ম নেয় মধুরা-রতি। এই মধুরা-রতি যখন আপনার সুখ-বাসনা নিঃশেষে পরিত্যাগ করে কৃষ্ণসুখবিধানে একান্তভাবে আত্মবিসর্জন করে তখনই তা হয়ে ওঠে সামর্থা-রতি। এই রতি ঘনীভূত হলে হয় প্রেম। প্রেম বৃদ্ধি পেয়ে রাগে পরিণত হয়, রাগ গাঢ় হয়ে হয় অনুরাগ। এই অনুরাগেরই চরম পরিণতি মহাভাব। চৈতন্যচরিতামৃতে কবিরাজ গোস্বামী বলছেন—

'সাধনভক্তি হৈতে হয় রতির উদয়।
রতি গাঢ় হইলে তারে প্রেম নাম কয়।।
প্রেমবৃদ্ধি ক্রমে নাম—স্নেহ, মান, প্রণয়।
রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব হয়।।'

এই মহাভাবই পরমপ্রেম।

কিন্তু এখানেও এর শেষ নয়। শ্রীরাধার মধ্যে এই পরমপ্রেমরূপ মহাভাব আরো গভীর থেকে গভীরতর হয়েছে। রূঢ়ভাব অতিক্রম করে অধিরূঢ়ভাবে উপনীত হয়েছে। তখন এই প্রেমের আখ্যা অধিরূঢ় মহাভাব।

এই অধিরূঢ় মহাভাবের আবার দুটি বিভাগ—মোদন ও মাদন। মোদনভাব পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণেও আছে, কিন্তু তার চেয়েও উচ্চতর মাদনভাবটি একমাত্র আছে শ্রীরাধিকার প্রেমে। মাদনাখ্য অধিরূঢ় মহাভাবই রাধাভাব।

গীতায় শ্রীকৃষ্ণের প্রতিজ্ঞাবাক্য আছে—'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।'—যে আমাকে যে-ভাবে ভজনা করবে আমিও তাকে সেইভাবে ভজনা করব। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের এই প্রতিজ্ঞা রাধার প্রেমের ক্ষেত্রে ভঙ্গ হল। কেননা শ্রীরাধার মাদনাখ্য অধিরূঢ় মহাভাব শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে নেই, তাই তার প্রতিদানও অসাধ্য।

এদিক থেকে রাধার প্রেম কৃষ্ণপ্রেম অপেক্ষাও উচ্চে। চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে কৃষ্ণের উক্তির দ্বারা এ কথার প্রমাণ দেওয়া হয়েছে। যথা—

'রাধিকার প্রেম গুরু আমি শিষ্য নট।'

অথবা,

'না জানি রাধার প্রেমে আছে কত বল।
যে বলে আমারে করে সর্বদা বিহ্বল ॥'

এই যে রাধার আশ্চর্য প্রেম তারই মহিমা জানবার জন্যে রাধার ভাবকান্তি নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হলেন চৈতন্যরূপে—এলেন ব্রজধাম থেকে নদীয়ানগরে।

সুতরাং দেখা যায় মানুষের কল্পনায় প্রেমের মহিমা যত ঊর্ধ্বে যেতে পারে শ্রীরাধার প্রেম তারই শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি।

শ্রীরাধার এই অনন্য পরমপ্রেমকেই চৈতন্যচরিতামৃতে 'চিন্তামনিসার' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু শুধু তত্ত্ব দিয়ে তো এর স্বরূপ উপলব্ধি সম্ভব নয়। তাই রাধা-কৃষ্ণের লীলাকাহিনী অবলম্বন করে বহু কাব্য-সাহিত্য পদ-গীতি রচিত হল।

ভারতীয় ধর্মের ইতিহাসে ভক্তিবাদ কোনো নূতন মতবাদ নয়। পৌরাণিক যুগ থেকেই এর প্রাধান্য সুরু হয়েছে। কেউ কেউ মনে করেন আর্যেতর সভ্যতা থেকেই এর উদ্ভব এবং দক্ষিণভারতই এর জন্মভূমি। এ সম্পর্কে আড়ুবার বা আলোয়ার সম্প্রদায়ের নাম সকলেই উল্লেখ করে থাকেন। বেদান্তের ভক্তিভাষ্যপ্রণেতা রামানুজও দক্ষিণভারতের অধিবাসী। এই ভক্তিবাদ পরিপুষ্ট হলে একে প্রধানত দু' স্তরে ভাগ করা হয়—অপরাভক্তি ও পরাভক্তি। পরাভক্তিই শুদ্ধাভক্তি। অপরাভক্তি নিম্ন সোপানে গৌণীভক্তি, যার নামান্তর বৈধী ভক্তি। এই ভক্তি উচ্চতর সোপানে আরোহণ করে হয় মুখ্যাভক্তি, যার নামান্তর রাগানুগাভক্তি। মুখ্যাভক্তির চরম অবস্থায় পরাভক্তির উদয় হয়। একেই বলা হয় রাগভক্তি বা মহাভাব।

গীতায় ভক্তিতত্ত্বের যে-বিশ্লেষণ পাওয়া যায় তারও চেয়ে সূক্ষ্মতর বিশ্লেষণ আছে নারদভক্তিসূত্রে। কিন্তু ভক্তিতত্ত্বের এই সব সূত্রকে রসাভিষিক্ত করে দেখানো হল ভাগবতের ব্রজলীলায়। ভাগবতেই প্রথম হল কাব্য ও দর্শনের সমন্বয়।

ভাগবতে ব্রজগোপীদের মধ্য দিয়ে প্রেমের সূক্ষ্মতম এবং গভীরতম প্রকাশ দেখানো হলেও শ্রীরাধার প্রেমের বিশিষ্ট স্বরূপ তাতে অনুক্ত থেকে গেল। বস্তুত ভাগবতে রাধার নামেরই কোনো উল্লেখ নেই। শুধু ইঙ্গিতে বলা হয়েছে, কোনো এক বিশেষ আরাধিকা গোপী শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা বলে তাকে নিয়ে ভগবান রাসমণ্ডল ত্যাগ করে একান্তে গমন করেছিলেন।

'অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যমনয়দ্রহঃ॥'

ভাগবত ॥ ১০।৩০।২৮ ॥

এই বিশিষ্টা আরাধিকাকে রাধা বলে স্বীকার করে নিলেও তাঁর প্রেমের বিশিষ্ট স্বরূপের বিশ্লেষণ ভাগবতে নেই।

প্রেমের এই বিশিষ্ট স্বরূপের পরিচয় দিলেন শ্রীচৈতন্যদেব তাঁর জীবন ও শিক্ষার মধ্য দিয়ে। পরবর্তীকালে গোস্বামীগণ মহাপ্রভুর প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হয়ে শ্রীরাধার মধ্যে প্রেমভক্তির যে পরিপূর্ণ মহিমা প্রদর্শন করলেন সে বিষয়ে পূর্বেই কিছু কিছু আলোচনা করা হয়েছে। এইভাবে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগোস্বামীগণ ভক্তিবাদকে সর্বাধিক উচ্চমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করলেন।

শ্রীরাধার প্রেমের মহিমাকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবশাস্ত্রে আর এক ভাবেও দেখানো হয়েছে—পরকীয়া প্রেম আখ্যা দিয়ে।

'পরকীয়া প্রেমে রসের অধিক উল্লাস।' পরকীয়া প্রেম নিরুপাধি বা অনপেক্ষ অর্থাৎ কোনো কিছুরই অপেক্ষা রাখে না। সমস্ত রকম সামাজিক-সাংসারিক বন্ধনের ঊর্ধ্বে ও স্বার্থ-সম্পর্কের অতীত যে-প্রেম তারই প্রতীক পরকীয়া প্রেম। এ প্রেম 'অকৈতব' বা 'প্রোজ্ঝিতকৈতব', অর্থাৎ চাতুরীহীন আর সে জন্যেই অহৈতুক। স্বকীয়া প্রেমে স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধজনিত হেতু আছে তাই তার পূর্ণতায় সন্দেহ আসতে পারে। রামের প্রতি সীতার যে-প্রেম তা স্বকীয়া-প্রেম। তাই সীতা রামকে কতটা 'স্বামী' হিসাবে ভালবাসেন আর কতটা 'রাম' হিসাবে ভালবাসেন তা নির্ণয় করা যায় না। কিন্তু রাধা কৃষ্ণকে ভালবাসেন শুধুমাত্র কৃষ্ণ বলেই, আর কোনো হেতু নেই। দ্বিতীয়ত স্বামীকে ভালবাসার মধ্যে একটা গৌরব ও মর্যাদাবোধ আছে—সতীত্বের অহমিকা আছে। এসব ভাবও স্বকীয়া-প্রেমের এক বিশেষ হেতু।

কিন্তু অসতী নামের নিন্দা ও কলঙ্ক বহন করেও জেগে থাকে যে পরকীয়া-প্রেম তার গভীরতা ও আকর্ষণ অবশ্যই সর্বাধিক আর তাতে রসের পরিপূর্ণতাও সন্দেহাতীত।

এসব কারণে রাধার পরকীয়া-প্রেমই আদর্শপ্রেম বা পরমপ্রেমের প্রতীক। চণ্ডীদাসের একটি পদে এ প্রেমের ইঙ্গিত দিয়ে বলা হয়েছে—

'তোরা পরপতিসনে সদাই গোপনে
সতত করিবি নেহা।'

এখন আর একটি প্রশ্ন। রাধার মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত এই যে পরমপ্রেম, এ প্রেমকে বলা হয়েছে নিত্যসিদ্ধ অর্থাৎ তা সাধনসিদ্ধ নয়। কেননা যা সাধনা দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় তার আদি আছে, কিন্তু শ্রীরাধার প্রেম অনাদি অনন্ত, তাই সতত বর্তমান—নিত্যস্থায়ী। এখানেই প্রশ্ন হতে পারে যে, প্রেম যত উচ্চস্তরের বা যত স্বতঃস্ফূর্তই হোক্ তা অনাদি-অনন্ত হওয়া কি করে সম্ভব? রাধার যদি আদি-অন্ত থাকে তাহলে তার প্রেমেরও আদি-অন্ত থাকবে।

এর উত্তরে বৈষ্ণব শাস্ত্রকারগণ বলেছেন, শ্রীরাধা হচ্ছেন অনাদি অনন্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরই স্বরূপশক্তির অংশ। ভগবান সচ্চিদানন্দময় অর্থাৎ সৎ চিৎ ও আনন্দ—এই তিনটি গুণ তার মধ্যে রয়েছে। সৎ গুণ থেকে সন্ধিনী শক্তি, চিৎগুণ থেকে সম্বিত শক্তি আর আনন্দ থেকে হ্লাদিনীশক্তির উদ্ভব। এই হ্লাদিনী শক্তিরই মূর্তিমতী প্রতিমা শ্রীরাধা।

চৈতন্যচরিতামৃতে বলা হয়েছে—

'রাধিকা হয়েন কৃষ্ণের প্রণয়-বিকার।
স্বরূপশক্তি হ্লাদিনী নাম যাঁহার॥
....
সচ্চিদানন্দপূর্ণ কৃষ্ণের স্বরূপ।
একই চিচ্ছক্তি তার ধরে তিন রূপ॥
আনন্দাংশে হ্লাদিনী সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সংবিৎ—যারে জ্ঞান করি মানি॥'

শ্রীরাধার প্রেম নিত্যসিদ্ধ একথা মেনে নেবার পর আর একটি প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। রাধা নিত্যসিদ্ধা এবং তার প্রেম নিত্যসিদ্ধ হলে

দুটি বস্তুই চিরকাল একইভাবে বর্তমান থাকবে। তার মধ্যে হ্রাস-বৃদ্ধি বা পরিবর্তন বা ক্রমবিকাশজনিত কোনো গতিই থাকবে না। তত্ত্বহিসাবে তা যতই প্রশস্ত হোক্ শিল্প-সাহিত্যে সৃষ্টির দিক থেকে একেবারেই উপযোগী হতে পারে না। যে-চরিত্রে পরিবর্তন নেই তা কি করে জীবন্ত হবে? যে-প্রেমে নেই ক্রমবিকাশ তাতে রসমাধুর্য বিকশিত হবে কি করে?

কিন্তু দেখা যায়, রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা অবলম্বন করে বহু সার্থক শিল্প-সাহিত্য রচিত হয়েছে। ভাগবত, গীতগোবিন্দ, বৈষ্ণব-পদাবলী প্রভৃতি ছাড়াও বিদগ্ধ-মাধব, ললিতমাধব, চন্দ্রাবলীলাভ প্রভৃতি বহু সার্থক নাটকাদি রচিত হয়েছে। তাহলে এইসব কাব্য-নাটকে কি সাহিত্য-রস সৃষ্টির খাতিরে বৈষ্ণবতত্ত্বকে লঙ্ঘন করা হয়েছে?

এ প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে শ্রীরাধার মাদনাখ্য অধিরূঢ় মহাভাব নামক পরমপ্রেমের আর একটি বৈশিষ্ট্য নিয়ে কিছু আলোচনা করা দরকার।

শ্রীরাধার প্রেমের যে-সব বিশিষ্টতার কথা আগে বলা হয়েছে তা ছাড়া তার মধ্যে আরো একটি বিশিষ্টতা আছে—তা হচ্ছে বিরুদ্ধধর্মাশ্রয়ত্ব। অর্থাৎ একই সঙ্গে তাতে পরস্পরবিরোধী গুণের সমাবেশ হতে পারে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে যেমন বিরুদ্ধগুণ আছে, যথা—ঐশ্বর্যভাবে স্বতন্ত্র, মাধুর্যভাবে ভক্তাধীন—ঐশ্বর্যে পূর্ণপ্রাজ্ঞ, মাধুর্যে অজ্ঞ শিশু ইত্যাদি, তেমনি তার স্বরূপশক্তি রাধার প্রেমেও স্ববিরোধী গুণ বর্তমান।

এই বিরুদ্ধ গুণগুলি রসাশ্রয়ী। প্রথমত, রাধার প্রেম অনন্ত সীমাহীন, বৈষ্ণবশাস্ত্রে যার আখ্যা 'বিভু'। অনন্ত ও সীমাহীন বস্তুর আর বৃদ্ধি সম্ভব নয়, কিন্তু রাধার প্রেম বিভু হয়েও সর্বদা বর্ধনশীল সুতরাং গতিশীল।

'বিভুরপি কলয়ন্ সদাভিবৃদ্ধিম্।' —শ্রীরূপ গোস্বামী

দ্বিতীয়ত রাধার প্রেম গুরু অর্থাৎ গৌরবযুক্ত। যথা—'রাধিকার প্রেম গুরু আমি শিষ্য নট।' অথচ গুরুবস্তু হয়েও এই প্রেম গৌরববর্জিত বা বিনীত।

তৃতীয়ত রাধার প্রেম অকৈতব অর্থাৎ ছলনাহীন তাই নির্মল ও শুদ্ধ। শুদ্ধ বস্তুতে কুটিলতা অসম্ভব, অথচ রাধার প্রেমে আছে বাম্যতা বা বক্রতা, যার প্রকাশ ঈর্ষা অভিমান প্রভৃতিতে।

শ্রীরাধার প্রেম নিত্যসিদ্ধ হলেও এইসব বিরুদ্ধ গুণের সমাবেশ থাকায় সাহিত্য-রস সৃষ্টির ক্ষেত্রেও অতি উপযোগী। তাই দেখা যায় বৈষ্ণব-

পদাবলীতে রাধার যে-চিত্র অংকিত হয়েছে তা অতি জীবন্ত ও রসসমৃদ্ধ।

বড়ু চণ্ডীদাস রচিত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। এই কাব্যে শ্রীরাধার চরিত্রসৃষ্টিতে কবি অপূর্ব দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তত্ত্ব-রাধাকে তিনি কাব্য-রাধায় রূপান্তরিত করেছেন।

বিভিন্ন ভাবের ভক্তভাবুক রাধাকে বিভিন্নরূপে উপলব্ধি করেছেন। কেউ বা তাকে দেখেছেন ভক্তপ্রতীকরূপে, আবার কেউ বা তাকে গ্রহণ করেছেন প্রেমভক্তির আদর্শরূপে। যিনি যেভাবেই ব্যাখ্যা করুন না কেন একথা স্বীকার করতেই হয় যে, যে-কোনো দেশে বা কালে যে-কোনো ভগবদ্ভক্তের মনে যে-কোনো রকম অনুভব জাগা সম্ভব তা সবই খুঁজে পাওয়া যাবে শ্রীরাধার মধ্যে।

কিন্তু পরমপ্রেমের শেষকথা কি রাধাভাবের মধ্যেই প্রকাশিত? বহুকাল পর্যন্ত মানুষের ধারণা তাই ছিল। চৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত সাধ্যসাধনতত্ত্বে দেখা যায়, রায় রামানন্দের মুখে রাধাপ্রেমের স্বরূপ এবং রাধাকৃষ্ণের স্বরূপ বিশ্লেষণ শোনার পরও—

'প্রভু কহে ইহ হয় আগে কহ আর।
রায় কহে ইহা বই বুদ্ধিগতি নাহি আর।।'

এই বলে রায় রামানন্দ যখন 'ন সো রমণ ন হাম রমণী'—নিজের রচিত এই পদটি গেয়ে শোনালেন, তখন 'প্রেমে প্রভু স্বহস্তে তার মুখ আচ্ছাদিল।'

মহাপ্রভু এ প্রসঙ্গ এখানে চাপা দিতে চাইলেন কেন? যেহেতু আর অগ্রসর হলে রাধাপ্রেমের পরবর্তী অধ্যায় প্রকাশিত হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশিত হবে মহাপ্রভুরও প্রকৃত স্বরূপ।

শুধু তাই নয়, এ যুগে নদীয়ায় মহাপ্রভু যেমন ছদ্মসন্ন্যাসী, বিষ্ণুপ্রিয়াও তেমনি ছদ্ম-সাধিকা। পরমপ্রেমের বিষয়রূপ শ্রীকৃষ্ণ এই প্রেমের আশ্রয়রূপ রস-আস্বাদন করবার জন্য গৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হয়ে ছদ্ম-সন্ন্যাসীবেশ ধারণ করলেন। শ্রীরাধাও তেমনি তার সাধ্যতত্ত্ব প্রেমকে সাধনতত্ত্বের মধ্য দিয়ে উপলব্ধি করবার আনন্দ আস্বাদ করতে চাইলেন। কারণ রাধারূপে তিনি নিত্যসিদ্ধা, তাই ব্রজলীলায় সাধিকার ভূমিকা গ্রহণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি।

গৌরাঙ্গ-অবতারে নবদ্বীপে একই সঙ্গে উভয়ের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হল। শ্রীকৃষ্ণ রাধার ভাব ও কান্তি গ্রহণ করলেন। রাধার এই ভাবটিই হচ্ছে নিত্যসিদ্ধ মহাভাব। যখনই রাধার মধ্য থেকে তাঁর নিত্যসিদ্ধ মহাভাবটি শ্রীকৃষ্ণ গ্রহণ করলেন, তখনই রাধার পক্ষে সাধিকাভাব আশ্রয় করা সম্ভব হল। বিষ্ণুপ্রিয়ারূপে তিনি এলেন ছদ্ম-সাধিকা হয়ে আপন ইচ্ছা পূরণ করতে। শ্রীগৌরাঙ্গের বহিরঙ্গ উদ্দেশ্য যেমন নাম-প্রেম বিতরণ করা, বিষ্ণুপ্রিয়ার বহিরঙ্গ উদ্দেশ্য তেমনি সাধনতত্ত্ব প্রচার করা। রাধার যে-প্রেমানুভবকে আস্বাদন করতে এলেন মহাপ্রভু, সেই প্রেমপ্রাপ্তিরই সাধনপদ্ধতি শেখাতে এলেন বিষ্ণুপ্রিয়া। তাই বিষ্ণুপ্রিয়ার জীবনে দেখতে পাই কেমন করে রাধিকা হয়েও সাধিকা হওয়া যায়—কেমন করে রাগভক্তিকে গোপন রেখেও বৈধী ভক্তির পথে ভজনের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করা যায়।

পরমপ্রেমের ক্ষেত্রে বিষ্ণুপ্রিয়া তাই শ্রীরাধার পরিশিষ্ট।

শ্রীরাধার মধ্যে যা ছিল ভাবমুখী, বিষ্ণুপ্রিয়ার মধ্যে তাই হল আচরণমুখী। ভাব এবং আচরণ—দুই মিলিয়েই পরমপ্রেমের পরিপূর্ণতা সাধিত হল।

রাধা অপেক্ষা বিষ্ণুপ্রিয়ার জীবনে লৌকিক অভিব্যক্তি কঠিনতর। কেননা রাধা তার ভাবের অনুকূলে স্ব-ভাবে জীবনলীলা সম্পাদন করেছেন, কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়া জীবন-যাপন করেছেন ভাবকে আচ্ছন্ন রেখে তার ছদ্ম-প্রতিকূলতায়।

দ্বিতীয়ত রাধার বিরহ অপেক্ষাও বিষ্ণুপ্রিয়ার বিরহ অধিকতর দুঃসহ। রাধার বিরহ শ্রীকৃষ্ণের প্রবাসজনিত। সে-বিরহে প্রবাস থেকে প্রত্যাবর্তনের আশা সর্বদাই জাগ্রত থাকে। কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়ার বিরহ গৌরাঙ্গের সন্ন্যাসজাত। সন্ন্যাসীর পক্ষে সংসার-জীবনে ফিরে আসার সম্ভাবনা সুদূরপরাহত, তাই বিরহিনীর হৃদয়ে তা কোনো আশাই বিস্তার করতে পারে না। রাধার বিরহ-তাপ মিলনের আশায় ছায়াময় আর বিষ্ণুপ্রিয়ার বিরহ-বেদনা নিরাশাতাপে মরুময়।

তাই আলোচ্য গ্রন্থে রাধাকে বিরহ-বিদ্ধা এবং বিষ্ণুপ্রিয়াকে বিরহসিদ্ধা রূপে অঙ্কিত করা হয়েছে।

বৈষ্ণবশাস্ত্রে বিষ্ণুপ্রিয়া কিন্তু প্রায় উপেক্ষিতা।

পরম প্রেম : ৯

রূপ-সনাতন-জীবপ্রমুখ গোস্বামীগণ বিষ্ণুপ্রিয়া সম্বন্ধে প্রায় নীরব। বাংলাভাষায় যে-দুটি চৈতন্যজীবনী প্রামাণ্য বলে স্বীকৃত সেই চৈতন্য-ভাগবত এবং চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থেও বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রসঙ্গ অতি সামান্যই স্থান পেয়েছে। সম্ভবত বিষ্ণুপ্রিয়ার স্বরূপ সম্বন্ধে সন্দেহ এবং মতানৈক্যই এর মূল কারণ।

বর্তমানে বৈষ্ণবদের মধ্যে বিভিন্ন মতাবলম্বী সম্প্রদায় বিদ্যমান। কোনো কোনো সম্প্রদায় বিষ্ণুপ্রিয়া সম্পর্কে উদাসীন এবং বিষ্ণুপ্রিয়া-ভজনের বিরোধী। অপর সম্প্রদায় বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রতি গভীর-শ্রদ্ধাশীল এবং তাঁর ভজনেরও একান্ত সমর্থক। উভয়পক্ষই নিজেদের সমর্থনে তত্ত্বগত এবং রসগত বহু সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যুক্তিতর্ক তুলে থাকেন। সে-সব জটিল তর্কের মধ্যে না গিয়ে মোটামুটি বলা যায়, গোঁড়া বৈষ্ণবদের মূল আপত্তি হচ্ছে এই যে মহাপ্রভুই একাধারে রাধাকৃষ্ণের মিলিত বিগ্রহ, সুতরাং বিষ্ণুপ্রিয়া রাধা হতে পারেন না। এর উত্তরে অন্যদল বলেন যে শ্রীকৃষ্ণ রাধার ভাব এবং কান্তিমাত্র গ্রহণ করে মহাপ্রভু চৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। সুতরাং শ্রীরাধা ভিন্নতর ভাব ও ভিন্নতর রূপ গ্রহণ করে বিষ্ণুপ্রিয়ারূপে আবির্ভূতা হলেন।

বিরুদ্ধবাদীদের আর একটি যুক্তি হল এই যে, মনুস্মৃতি মতে দ্বিতীয়া স্ত্রী ধর্মপত্নীর মর্যাদা লাভ করতে পারে না।

এর উত্তরে বলা হয়, বৈষ্ণবশাস্ত্র মনুস্মৃতিদ্বারা নিয়মিত হতে পারে না, কেননা তাহলে স্বয়ং রাধার স্থান হয় কোথায় ?

অনেকে বলেন, বিষ্ণুপ্রিয়া হচ্ছেন গৌরাঙ্গ-অবতারে শ্রীরাধার বিলাসমূর্তি। এ বিষয়ে শ্রীপাদ মধুসূদন গোস্বামী সার্বভৌম বলেছেন—

'শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী তত্ত্ববিচারে ভক্তিস্বরূপা।···হ্লাদিনী নাম্নী শ্রীভগবানের স্বরূপ শক্তি ভক্তিরূপিণী শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী ; সুতরাং তিনি হ্লাদিনী শক্তি।···হ্লাদিনী শক্তিস্বরূপা শ্রীমতী রাধিকা এবং শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া, অতএব শ্রীমতী রাধিকার বিলাসমূর্তি শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী।'

অর্থাৎ সহজ কথায় যিনি শ্রীরাধা, তিনিই শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া।

কেউ কেউ আবার বলেন মহাপ্রভুর প্রথমা পত্নী লক্ষ্মীপ্রিয়া স্বয়ং লক্ষ্মী বা রুক্মিণীর অবতার এবং বিষ্ণুপ্রিয়া হচ্ছেন সত্যভামার অবতার। কিন্তু শ্রীরূপ গোস্বামী তাঁর 'ললিতমাধব' নাটকে শ্রীরাধাকে সত্যভামারূপিণী করে

চিত্রিত করেছেন। সুতরাং শ্রীরূপের মতেই সত্যভামা ও রাধা অভিন্ন বলে প্রতিপন্ন হয়। তাই বিষ্ণুপ্রিয়াকে সত্যভামার অবতার বলে স্বীকার করলেও রাধার সঙ্গে তার ভিন্নতা থাকে না।

এইসব কারণে বহু তত্ত্বজ্ঞ বৈষ্ণবভক্তই বিষ্ণুপ্রিয়াকে শ্রীরাধা বলে স্বীকার করে থাকেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ শ্রীপাদ হরিদাস গোস্বামী তাঁর 'গম্ভীরায় শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া' গ্রন্থে বলেছেন—

'শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দ-বল্লভা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী তত্ত্বে শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দবল্লভা শ্রীমতী রাধিকার আবির্ভাব বিশেষ।...ইনি যে শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দের মুখ্যাশক্তি—এ বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোনো কারণই নাই।'

অন্যত্র—

'গৌরগোবিন্দরূপের স্বরূপশক্তি শ্রীরাধাস্বরূপিনী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী... তাহার অন্তরঙ্গা সখিদ্বয় কাঞ্চনা ও অমিতাসহ নিগূঢ় নবদ্বীপরসাস্বাদ করিতেছেন।...এখানে তিনি শ্রীরাধিকাই—তিনি অন্য কোনো রূপের বিশিষ্ট ভাবমাত্রও অঙ্গীকার করেন নাই।'

শ্রীরাধার প্রেম যদি 'সাধ্যশিরোমণি' হয় তবে বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রেম 'সাধনশিরোমণি'। এখানেও একটি প্রশ্ন থাকে। আগে সাধনা তারপর সাধ্যবস্তু লাভ। কিন্তু ব্রজধামে সাধ্যলীলার পর নবদ্বীপধামে সাধনলীলার অনুষ্ঠান—এ যে উল্টা ব্যাপার। সাধনলীলার পরেই তো সাধ্যলীলা হওয়া উচিত।

এ সম্পর্কে মধুসূদন গোস্বামীপাদের উক্তি—

'ব্রজলীলা আর নবদ্বীপলীলাতে সাধ্যসাধনরূপ ভেদ স্বীকার করাই অপসিদ্ধান্ত। বাস্তবিক উভয়লীলাই একরূপ।'

অর্থাৎ ব্রজলীলা ও নবদ্বীপলীলা উভয়ই নিত্যলীলা, সুতরাং যুগপৎ সংঘটিত। তাই 'গৌরকথা' গ্রন্থে শ্রদ্ধেয় মহানামব্রত ব্রহ্মচারী বলছেন—

'বাহ্যদৃষ্টিতে নবদ্বীপ ও বৃন্দাবন বহু ব্যবধান, কিন্তু অন্তরদৃষ্টিতে তাহারা একে অন্যে অনুপ্রবিষ্ট।'

তাছাড়া দুটি তত্ত্বকে ভিন্ন বলে গ্রহণ করলেও এবং পূর্বে সাধন পরে সাধ্যলাভ একথা স্বীকার করলেও সাধ্যসাধনতত্ত্ব বর্ণনের ক্ষেত্রে দেখা যায়, যে-কোনো দর্শনসূত্রাদির গ্রন্থেই ক্রমঅনুযায়ী প্রথমে সাধ্যতত্ত্ব নির্ণয় করা হয়, তারপর সাধন-পন্থা বিবৃত করা হয়। সেদিক থেকেও প্রথমে প্রেমের

সাধ্যসীমারূপে শ্রীমতী রাধার লীলাবিস্তারের পর প্রেমের সাধন সীমারূপে শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার লীলাপ্রকাশ কিছুমাত্র অসঙ্গত নয়। উভয়লীলাই স্বয়ং-সম্পূর্ণ, তথাপি উভয়ই উভয়ের পরিপূরক।

তাই বর্তমান গ্রন্থে 'রাধাসূত্রের ভাবভাষ্য বিষ্ণুপ্রিয়া'—একথা উল্লেখ করা হয়েছে।

রাধা ও বিষ্ণুপ্রিয়া উভয়ের মধ্যেই আর একটি বিষয়ে মিল লক্ষ্য করা যায়। বৈষ্ণবশাস্ত্রের ও কৃষ্ণলীলার প্রামাণিক গ্রন্থ ভাগবতে রাধার প্রসঙ্গ পাওয়া যায় না—পাওয়া যায় অন্যান্য পুরাণে, যথা—ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে ও পদ্মপুরাণে। ঠিক তেমনি প্রামাণিক চৈতন্য জীবনীগ্রন্থ চৈতন্যভাগবত বা চৈতন্য চরিতামৃতে বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রসঙ্গ প্রায় কিছুই পাওয়া যায় না—পাওয়া যায় বিশেষভাবে জয়ানন্দ ও লোচনদাসের 'চৈতন্যমঙ্গল' কাব্যে। রাধা এবং বিষ্ণুপ্রিয়া উভয়েরই প্রেমানুভূতি গভীরভাবে প্রকাশিত হয়েছে পদাবলীগীতির মধ্যে। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি বৈষ্ণবমহাজনেরা যেমন তাদের পদের মধ্যে রাধাকে জীবন্ত করে তুলেছেন, তেমনি বিষ্ণুপ্রিয়া জীবন্ত হয়ে উঠেছেন নরহরি ঠাকুর, বাসুদেব ঘোষ, মুরারি গুপ্ত, বল্লভদাস প্রভৃতির রচিত পদসমূহে।

তবে একথা সত্য, শ্রীরাধার লীলাকাহিনী যেমন প্রচারিত ও জনপ্রিয় হয়েছিল, বিষ্ণুপ্রিয়ার কাহিনী তেমন হয়নি। তাই বিচ্ছিন্নভাবে কিছু কিছু জানা গেলেও বিষ্ণুপ্রিয়ার সমগ্রজীবন ও সাধনলীলা প্রায় অজ্ঞাতই থেকে গেছে। বৈষ্ণবগোস্বামী সমাজের একাংশের বিরোধিতাও এর একটি প্রধান কারণ, সেকথা আগেই বলা হয়েছে।

প্রেমানুভূতি মানুষের চিরন্তন অনুভূতি এবং শিল্প-সাহিত্য-সৃষ্টির অনন্ত প্রেরণা। এই প্রেম কত ঊর্ধ্বে আরোহণ করতে পারে তারই দৃষ্টান্ত এই মহাভাবস্বরূপ পরমপ্রেম—যার ভাণ্ডারী শ্রীমতী রাধা।

মরমী কবি ও ভক্তসাধকেরা বিভিন্নযুগে আপন অনুভব ও উপলব্ধির মধ্য দিয়ে যেভাবে তা আস্বাদ করেছেন তার পরিচয় বহুভাবে ছড়িয়ে আছে কাব্য-সাহিত্য-সঙ্গীতে। এই পরমপ্রেম সর্বযুগের সর্বকালের শাশ্বত সম্পদ। বহুবার বহুভাবে পরিবেশিত হলেও আরো বহুবার নতুনতরভাবে পরিবেশনের অপেক্ষা রাখে। কেননা—

'সোই পিরীতি অনুরাগ বাখানিতে তিলে তিলে নূতন হোয়।'

বর্তমান গ্রন্থ সেই চিরপুরাতনকে নূতনভাবে পরিবেশনেরই একটি চেষ্টা-মাত্র। কি সেই পরমপ্রেমরূপা ভক্তি আর তা লাভ করে কি অর্থে কেমন করে ভক্ত অমৃতস্বরূপ হয়ে যায়, সেকথাই শ্রীমতী রাধা ও বিষ্ণুপ্রিয়ার মনস্তত্ত্ব অবলম্বন করে পরিস্ফুট করবার সাধ্যমত চেষ্টা করেছি। দার্শনিক তত্ত্বাদি যথাসম্ভব পরিহার করে প্রেমময় হৃদয়ানুভূতিকেই এখানে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে—আর সেই অনুভব-আস্বাদকে সূত্রবন্ধ করবার জন্য যতটুকু ঘটনার প্রয়োজন ততটুকুই গ্রহণ করা হয়েছে। এক কথায় এই গ্রন্থকে তত্ত্বপ্রধান বা ঘটনাপ্রধান না করে অনুভব-প্রধান করাই মূল উদ্দেশ্য। তাই প্রেমের বিষয়-রূপ শ্রীকৃষ্ণ ও চৈতন্যকে যথাসম্ভব অন্তরালে রেখে প্রেমের আশ্রয়ভূত কৃষ্ণপ্রিয়া ও গৌরপ্রিয়াকেই সম্পূর্ণভাবে অবলম্বন করে এই গ্রন্থ রচনার প্রয়াস।

আবার তাদেরও বহিজীবন অপেক্ষা অন্তর্জীবনের চিত্র অঙ্কিত করার অভিপ্রায়কেই অধিকতর প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। কেননা, সাহিত্য-রস সৃষ্টিই এই রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য।

শ্রীমতী রাধা ও শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রেমভক্তির মধ্যে সর্বদেশের সর্বকালের ভক্ত-ভাবুকদের আশা-প্রতীক্ষা মিলন-বিরহের আনন্দ-বেদনাময় অনুভবই নিহিত আছে।

বৈষ্ণবধর্মের গোপীভাবাশ্রিত রাগানুগা-সাধক, অন্যান্য ধর্মের সহজিয়া ও মরমী সাধক, পাশ্চাত্যের 'মিষ্টিক'-সাধক—সকলেই এই একই পথের পথিক। ব্যাপকদৃষ্টিতে জীব ও ব্রহ্মের অনন্ত প্রেমলীলারই বিশেষ প্রকাশ পরমপ্রেম। প্রিয়তমের সঙ্গে নিত্যমিলনের আনন্দ ও নিত্যবিচ্ছেদ-বেদনার মধ্যে নিয়ত-দোলায়িত এই জীবন-প্রেমের ঝুলনলীলা।

তাই যে-পরমপ্রেমের অভিব্যক্তি শ্রীমদ্‌ভাগবত গ্রন্থে, যার বিকাশ বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে এবং যার পরিণতি রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ কবিগণের কাব্য-দ্যোতনায়, সেই প্রেমানুভূতির কিছু দ্বিধা-কম্পিত প্রকাশ চিরন্তন ভক্ত-ভাবুকদের উদ্দেশ্যে নিবেদিত হল।

প্রথম পর্ব ঃ শ্রীমতী

তদেব রম্যং রুচিরং নবং নবং
তদেব শশ্বৎ মনসো মহোৎসবম্ ।
তদেব শোকার্ণবশোষণং নৃণাং
যদুত্তমশ্লোকযশোঽনুগীয়তে ।।
—শ্রীমদ্‌ভাগবত ।।

সে যে রমণীয় সে যে মধুময় সে যে নিতি নব নব,
সে যে চিরদিন হৃদয়মনের উৎসব অভিনব ।
শোষণ করে সে মানবের শোক-দুঃখের পারাবার,
মধুর ভাষায় যদি গাওয়া যায় সদা যশোগাথা তাঁর ।

'হে দেব হে দয়িত হে ভুবনৈকবন্ধো
হে কৃষ্ণ হে চপল হে করুণৈকসিন্ধো।
হে নাথ হে রমণ হে নয়নাভিরাম
হা হা কদানুভবিতাসি পদং দৃশোর্মে ।।'

শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত ।। ৩২ ।।

এক

ওহে দেব হে দয়িত একমাত্র বন্ধু বসুধার
ওহে কৃষ্ণ হে চপল তুমি যে সাগর করুণার।
ওহে নাথ হে রমণ নিখিলের নয়নাভিরাম
চরণ দর্শনে কবে পূর্ণ হবে সর্বমনস্কাম ।।

বেলাশেষের কোমলতা মধুমাধবী সুরে বেজে উঠেছে আর আকাশে ফুটেছে রক্তরাগ। প্রিয়-অভিসারে সন্ধ্যার প্রসাধন। প্রসাধন তার অন্তরে বাহিরে। প্রকৃত সাধনায় প্রাণের প্রসাধন, আর দেহের প্রসাধন প্রকৃষ্ট সজ্জাসাধনে।

তাই রূপ-প্রসাধন থেকে অরূপ-প্রসাদন। প্রসাদন থেকে প্রসার। প্রসার থেকেই প্রকাশ—যার নাম প্রেম।

তারপরই নিবিড় প্রদাহের মধ্য দিয়ে গভীর প্রশান্তি।

বৃষভানুনন্দিনী শ্রীমতী তার সজ্জাকক্ষে বসে সান্ধ্য-প্রসাধনে তন্ময়। তাকে ঘিরে আছে প্রিয় হতে প্রিয়তর সখি-সহচরীগণ।

কস্তুরী-সুরভিত ধূপের ধোঁয়ায় শ্রীমতীর মেঘোপম কেশভার ছড়িয়ে দিয়েছে বিশাখা। বাসন্তীসখি তার কমল-বিনিন্দিত রক্তিম পদযুগলে অতি সাবধানে অলক্তক রেখা টেনে দিল। তারপর হেমকান্তি অনুপম ললাটে কুঙ্কুম-বিন্দুটিকে ঘিরে চন্দনলেখা এঁকে দিকে লাগল।

সখি বিরজা রৌপ্যপেটিকা খুলে স্বর্ণবিন্দুখচিত নীলাম্বরী বের করে শ্রীমতীর সামনে মেলে ধরল। শ্রীমতী একটিবার মাত্র তার প্রতি দৃষ্টিপাত করে সুললিত মরাল-গ্রীবা ঈষৎ বঙ্কিম করল। বিরজা আভাসে তার অসম্মতি বুঝতে পেরে নীলাম্বরী ফিরিয়ে নিয়ে গেল। পরিবর্তে নিয়ে এল ময়ূরকণ্ঠী সূক্ষ্ম দুকুল-বসন। এবারেও সম্মতির চিহ্ন পাওয়া গেল না শ্রীমতীর ভ্রূভঙ্গিমায়। বিরজা তাই নিয়ে এল রৌপ্যরেখাময় রক্ত পট্টাম্বর। অপূর্ব তার উজ্জ্বলতা। কিন্তু শ্রীমতীর অপ্রসন্ন হাসি তাও অনুমোদন করল না।

অবশেষে অনেক বিচার করে নিয়ে এল রত্নখচিত ভ্রমরবর্ণ মেঘাম্বর। সূক্ষ্মতায় কারুকার্যে অতুলনীয়। শ্রীমতীর গাঢ় রক্তবর্ণ অন্তর্বাসের ওপর তা মেলে ধরল বিরজা। যেন নবীন মেঘের শ্যামলতা ভেদ করে বিচ্ছুরিত হল আলোকের লোহিত আভা। সন্ধ্যার আকাশ মাটিতে নেমে এল।

শ্রীমতীর মৌন অনুমোদন অকুণ্ঠিত ললাটে ফুটে উঠল।

চিত্রা ও মায়া ততক্ষণে রাজনন্দিনীর বেণীরচনা শেষ করে সুবর্ণসূত্রমিলিত হরিৎ পট্টজাদে তা শোভিত করল। তারপর কানাড়া-ছন্দে কবরী-বিন্যাস করে সখি রূপমঞ্জরী তা সাজিয়ে দিল নবমল্লিকা ফুলে।

বেশবাস অলংকরণ সমাপ্ত হলে রত্নমুকুর হাতে নিয়ে বৃষভানুনন্দিনী সগর্ব ভঙ্গিতে তাকাল আপন প্রতিচ্ছবির পানে।

বাক্‌নিপুণা ললিতা বলল—সখি, আমার ভয় হয় কখন বুঝি তোমার চঞ্চল নয়নদুটি খঞ্জনপাখি হয়ে উড়ে পালায়। তাই কাজলের ফাঁদে তাদের বন্দী করতে আর দেরী করো না।

বলে তাড়াতাড়ি অঞ্জন-শলাকা তুলে দিল শ্রীমতীর হাতে।

বিশাখা বাধা দিয়ে বলল—না ললিতা, তুমি কি লক্ষ্য কর নি আজকাল শ্রীমতীর চঞ্চল চোখদুটি ধীরে ধীরে কেমন স্বপ্নমন্থর হয়ে উঠছে। উড়ে পালাবার শক্তি যেন আর তার নেই।

নেত্রপ্রান্তে অঞ্জনের সুষম রেখা টানতে টানতে মধুর হাসি হাসল শ্রীমতী। বীণা-ঝংকৃত কণ্ঠে বলল—সখি, আজ আমার চোখদুটি যেন কোন গভীর সায়রে পদ্ম হয়ে ফুটে থাকতে চাইছে। থেকে থেকে কেন যে দৃষ্টি উদাস হয়ে যাচ্ছে কিছুই বুঝতে পারছি নে।

মধুমঞ্জরী শ্রীমতীর পদযুগলে মণিমঞ্জির বেঁধে দিয়ে বলল—রাজকুমারী,

এ যে হৃদয়ের জাগরণ। অসীম সাগরে খেয়াতরী বেয়ে প্রেম আসছে তোমার জীবনে। এ তারই আগমনী।

বাইরে তোরণরক্ষকের বিষাণধ্বনিতে সন্ধ্যার প্রহর সূচিত হল। ললিতা প্রসাধন-সামগ্রীগুলি যথাস্থানে সন্নিবেশ করবার নির্দেশ দিল। তারপর বলল —চল সখি, আমরা প্রাসাদ-অলিন্দ থেকে সান্ধ্যগগনের শোভা দর্শন করি।

শ্রীমতী যাবার জন্য প্রস্তুত হল, কিন্তু যাওয়া হয়ে উঠল না। অদূরে দেখা গেল এক হাস্যময়ী বৃদ্ধা যোগিনীকে। পরিধানে গৈরিকবাস, কণ্ঠে ও বাহু-যুগলে তুলসীমাল্য। শুভ্র কেশজাল জটা বেঁধে পিঙ্গলবর্ণ ধারণ করেছে। ললাটে তপোবিভা। ওষ্ঠাধর সদাপ্রসন্ন।

সখিরা বৃদ্ধাকে দেখে উল্লসিত হল। তাঁকে ঘিরে আনন্দ-কোলাহল জুড়ে দিল। সহাস্য অভ্যর্থনা জানিয়ে শ্রীমতী বলল—বড়িমা, তুমি তীর্থ পরিক্রমা থেকে কবে ফিরলে ? সমস্ত কুশল তো ?

বিরজা বড়িমার জন্য আসন নিয়ে এল। মাঝে বসলেন বড়িমা আর সখিরা বসল তাঁকে ঘিরে। যেন প্রভাত-কমলিনীদের মাঝখানে রাত্রিশেষের কুমুদী।

ললিতা শ্রীমতীর দিকে একবার তাকিয়ে বড়িমাকে বলল—আজ তোমার মুখ থেকে আমরা তীর্থের কাহিনী শুনব।

বৃদ্ধা যোগিনী একটু হাসলেন। বললেন—বহু বৎসর ধরে বহু তীর্থে ঘুরেছি আমি কন্যা। গিয়েছি দক্ষিণ প্রান্তের সেতুবন্ধ থেকে উত্তর প্রান্তের হিমালয় পর্যন্ত। কত শক্তিপীঠ শৈবক্ষেত্র পরিক্রমা করেছি। কত বৈষ্ণব-তীর্থে দর্শন করেছি পবিত্র বিগ্রহ। তবু হৃদয় ভরে নি। কোথাও পাই নি তাঁর কৃপার স্পর্শ।

ললিতা বলল—কিন্তু বড়িমা, তোমার দুচোখে আনন্দের উজ্জ্বল দীপ্তি, মুখে গভীর শান্তির ছবি।

: সে কাহিনীই তো বলতে যাচ্ছি ললিতা। বড়িমা একটু থামলেন। তারপর আবার বলতে লাগলেন—এমনি করে যখন অতৃপ্ত মনে তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াচ্ছি, তখন পরমভাগ্যবশে শচীতীর্থে মহামুনি গর্গদেবের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হল। তাঁর কাছে শুনলাম এক আশ্চর্য বার্তা।

: কি সে বার্তা ? শুনবার জন্য উৎসুক হয়ে উঠল শ্রীমতী। ব্যাকুলতা জেগে উঠল সখিদের হৃদয়ে।

চারদিকে একবার তাকালেন বড়িমা। অদূরে দ্বারপ্রান্তে প্রতিহারিণীকে

ছাড়া আর কাউকেই দেখা গেল না। অপেক্ষাকৃত ঘনিষ্ঠকণ্ঠে তিনি বলতে লাগলেন—মহামুনি গর্গদেবকে আমি আমার অন্তরের অতৃপ্তির কথা নিবেদন করলাম। সব শুনে তিনি হেসে বললেন—মাতা, সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ ত্যাগ করে তুমি কেন এসেছ বৃথা সন্ধানে। ফিরে যাও বৃন্দাবনে। তোমার হৃদয় যা চায় তা শুধু সেখানেই পাওয়া সম্ভব।

গর্গদেবের কথা শুনে আমি বিস্মিত হলাম। বুঝতে পারলাম না তাঁর বক্তব্যের তাৎপর্য। বৃন্দাবন তো আমার অপরিচিত নয়। কি এমন মহিমা আছে তার। তবু মহামুনির আদেশ শিরোধার্য করে ফিরে এলাম বৃন্দাবনে।

ঃ তারপর বড়িমা, তারপর ?

ঃ তারপর এখানে এসে দেখলাম, অব্যর্থ মহামুনি গর্গদেবের বাক্য। আজ বুঝেছি বৃন্দাবনেই এসে মিলিত হয়েছে পৃথিবীর সমস্ত তীর্থ। এখানকার ধূলিতলেই আমি কুড়িয়ে পেলাম জীবনের পরম সম্পদ। তৃপ্ত হলাম, পূর্ণ হলাম—শান্ত হল অন্তরের সকল আকুলতা।

শ্রীমতী অধীর কণ্ঠে প্রশ্ন করল—বড়িমা, কি সে পরম সম্পদ, যা এক-মুহূর্তে তোমার সকল শূন্যতাকে পূর্ণ করে দিয়েছে। জানবার জন্য আমাদের মন কৌতূহলী।

বড়িমা বললেন—তবে শোন শ্রীমতী, শোন ব্রজবালাগণ, সে একখানি পদচিহ্ন। বৃন্দাবনে এসে প্রবেশ করতেই গোষ্ঠের পথে ধূলিতলে দেখতে পেলাম এক অপূর্ব চরণ-চিহ্ন। জানিনে কি আকর্ষণ ছিল সেই চিহ্নে। আমি মন্ত্রমুগ্ধের মত তার পাশে বসে পড়লাম। ভাল করে নিরীক্ষণ করে দেখলাম সমস্ত শুভলক্ষণযুক্ত সেই চরণ-চিহ্ন। মনে হল যেন দৃঢ়তা আর কোমলতায় মেশানো, আনন্দ আর প্রেম দিয়ে গড়া দুখানি পবিত্র কমল-বিনিন্দিত চরণের আভাস স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে তাতে। আবেগ-কম্পিত হাতে স্পর্শ করতে গেলাম সে পদচিহ্ন আর চঞ্চল স্পর্শে ধূলিরাশি বিক্ষিপ্ত হয়ে সে চিহ্ন মিলিয়ে গেল ধূলিরই বুকে। সেই ধূলি আমি ললাটে বক্ষে মেখে নিলাম। আর সঙ্গে সঙ্গেই এক অসীম তৃপ্তিতে পূর্ণ হল মন-প্রাণ। সব ব্যাকুলতা লীন হয়ে গেল শান্তির পারাবারে। আমার চেতনা যেন স্পষ্ট বুঝতে পারল, এতদিন যে-কৃপা প্রার্থনা করে তীর্থে তীর্থে বৃথা ঘুরে মরেছি, সে-কৃপারই সূচনা হল বৃন্দাবনে এই পদচিহ্নের মধ্য দিয়ে।

বড়িমা নীরব হলেন।

কিন্তু এ কি হল শ্রীমতীর। এই পদচিহ্নের কথা শুনে সহসা বিদ্যুৎ-স্পৃষ্টের মত শিহরিত হল কেন শ্রীমতীর অন্তর-বাহির। সে যেন মানস-নয়নে দেখতে পাচ্ছে সেই পদচিহ্ন। যেন স্পর্শ করতে পারছে তা কল্পনার অঙ্গুলিতে। একি মধুর পুলকানুভূতি! এ কি অভাবিত ভাবনা! পদচিহ্নে যদি এত মাধুরী তবে কত মাধুরী আছে তার পদযুগলে? আর যার পদযুগলে এত আকর্ষণ, কেমন মোহময় না-জানি তার দেহঠাম। আত্মহারা হয়ে ভাবতে লাগল শ্রীমতী। কেমন তার বদনমণ্ডল—কেমন সে বদন মণ্ডলে নয়নের শোভা? কি জানি কেমন তার মনোরম বাহু দুটি—সে বাহুর রক্তাভ করাঙ্গুলি। আর তার বক্ষপট—সে কেমন বিস্তৃত? সে কি অনুরাগের অনন্ত আশ্রয়? সীমা নেই এ বিস্ময়ের। একটি চরণ-চিহ্নের কথা শুনেই আজ শ্রীমতীর চেতনা এমন অসংখ্য বর্ণ-সমারোহে রঞ্জিত হচ্ছে কেন? শ্রীমতীর বক্ষ কেন কেঁপে কেঁপে ভেঙ্গে পড়তে চাইছে? কি নাম এ অনুভূতির? কি স্বরূপ এ ভাবনার?

একখানি চরণ-চিহ্ন। দর্শন নয়, স্পর্শ নয়—শুধু তার শ্রবণ-স্মরণ। শ্রীমতীর হৃদয়ের গভীরে তা কেমন করে সাড়া জাগাল? জাগালই বা কেন? যেন সে চিহ্নখানি ধূলিশয্যা ছেড়ে শ্রীমতীর সুকোমল বক্ষে এসেই চিরলগ্ন হল।

আত্মদমন করতে চেষ্টা করল শ্রীমতী। আবেগকে সংযত করল অতি সাবধানে। মনে মনে বলল—শ্রীমতী, তুমি স্থির হও। একখানি অদেখা অজানা পদচিহ্নের কাছে কি আত্মবিক্রয় করবে?

কিন্তু শিরা-উপশিরায় ছড়িয়ে পড়তে লাগল কি এক বিদ্যুৎশিহরণ। প্রাণকেন্দ্র যেন রোমাঞ্চিত হতে লাগল নব-বর্ষার কদম্ব-কুসুমের মত।

রাত্রির অর্ধযাম সমাপ্ত হল। প্রধান তোরণে বেজে উঠল সময়-জ্ঞাপক বিষাণ।

আমার নামজপের সময় হয়ে গেছে। বলে সকলের কাছে সস্নেহে বিদায় নিয়ে বড়িমা উঠে পড়লেন।

কিন্তু থেকে গেল এক অপূর্ব সংবাদ।

যেন শেষ-রজনীর বিলীয়মান চাঁদের আলো কুসুম-সভায় এসে জানিয়ে গেল অরুণোদয়ের শুভবারতা।

'মুকুন্দ-মুরলী-রব-শ্রবণ-ফুল্লহৃদ্‌বল্লরী
কদম্বক-করম্বিত-প্রতিকদম্ব-কুঞ্জান্তরা।
কলিন্দ-গিরি-নন্দিনী-কমল-কন্দলান্দোলিনা
সুগন্ধিরনিলেন মে শরণমস্তু বৃন্দাটবী ॥'

—শ্রীরূপ গোস্বামী ॥

দুই

মুকুন্দ-মুরলী-রব শুনে ফুল্ল হল হৃদয়বল্লরী
কুঞ্জে কুঞ্জে কদম্বের দল ফুটে ওঠে প্রতিশাখা ভরি
কালিন্দী-সলিলে বিকশিত কমলের স্পর্শে সমীরণ
সুরভিত যেই বৃন্দাবনে সে আমার নিয়ত শরণ ॥

শ্রীমতী ঘুমচ্ছে।

স্বর্ণে আর গজদন্তে শিল্পশোভামণ্ডিত নিদ্রাপালঙ্ক। তার উপর বিন্যস্ত কুসুম-কোমল সুরভিত শয্যায় গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন শ্রীমতী। শিয়রের কাছে স্বর্ণদণ্ডে স্থাপিত রত্নপ্রদীপ স্তিমিত শিখায় জ্বলছে। রাত্রি গভীর। নিস্তব্ধ জীবনের সমস্ত কোলাহল।

শ্রীমতী ঘুমচ্ছে। ঘুমচ্ছে তার আভিজাত্যের চেতনা, মর্যাদার অভিমান। ঘুমিয়ে আছে ঐশ্বর্যের গরিমা।

স্বপ্ন দেখছে শ্রীমতী। ছবি হয়ে ফুটে উঠতে চাইছে মগ্ন-কামনা। মনোলোকের অতল থেকে জেগে উঠতে চাইছে চিত্তলোক। কিন্তু তার আগে আরও গভীরতা থেকে—আত্মার অতলতা থেকে ফুটে উঠল কি এক অভাবিত স্নিগ্ধ ছবি। একটি আলোকপুঞ্জময় আবির্ভাব। রূপময়, তবু রূপাতীত। দেহ-সীমায়িত, তবু যেন বিদেহী। স্বপ্নপটে শুধু স্পষ্ট হয়ে উঠল একখানি বাঁশরী আর তার ছিদ্রে ছিদ্রে সঞ্চরমান বিদ্যুৎচপল অঙ্গুলিরাজ।

STATE CENTRAL LIBRARY AGARTALA, TRIPURA 70420 21/4/80

দুর্নিরীক্ষ্য তাদের গতি। শুধু মনে হল এক নীলাভ রক্তিমা বাঁশরীর ঊর্ধ্ব-দেশে একটি জ্যোতির্ময় পরিমণ্ডল রচনা করেছে।

সহসা বেজে উঠল বাঁশী। শ্রীমতীর সুখস্বপ্ন ঘিরে ছড়িয়ে পড়ল অপূর্ব সুরলহরী। সেই অজানার মায়াবাঁশী আশা-নিরাশা-আনন্দ-বেদনা-বিজড়িত মোহময় রাগিণীতে বেজে চলল। শ্রীমতীর আচ্ছন্ন চেতনার উপর যেন অতি লঘুছন্দে ঝরে পড়তে লাগল শিউলি-বকুল-যূথী-মালতী।

কে বাঁশী বাজায়? কি নাম এই প্রাণ-কেড়ে-নেওয়া রাগিণীর? শ্রীমতীর ভাবনা শিহরিত হল স্বপ্নঘোরে। আমি যে রাজ-নন্দিনী। লুণ্ঠনের ধন নয় আমার হৃদয়। অনেকবার অনেক রাগিণী বেজেছে আমার জীবনে। কিন্তু নিজে কখনো বেজে উঠিনি এমন করে। কে তুমি বাজালে এমন বাঁশী আর আমাকে বাজালে সাথে সাথে?

ঘুম ভেঙ্গে উঠে বসল শ্রীমতী। অঙ্গের উষ্ণ কোমল আবরণীর মত স্বপ্ন-ঘোর যেন তখনো জড়িয়ে আছে তাকে। একি অভিনব মনোরম স্বপ্ন। অনাস্বাদিতপূর্ব একি মাধুরী।

কিন্তু এতো স্বপ্ন নয়। বাঁশী যে এখনো বাজছে। তারায় তারায় শিহরিত গুঞ্জরিত হয়ে, নক্ষত্রলোক পার হয়ে, চন্দ্র-সূর্য-গ্রহমণ্ডলী অতিক্রম করে একাকিনী রজনীর প্রতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে যেন সে বেজে উঠছে।

কান পেতে শুনল শ্রীমতী। কিন্তু কই, কানে তো এসে লাগছে না সে সুরের ছোঁয়া। তবে কি বাঁশী তার মনে বাজছে?

সমস্ত মন-প্রাণ কেন্দ্রীভূত করে শুনতে চেষ্টা করল শ্রীমতী। অতি মৃদু—অতি দূরাগত যেন সে বংশীধ্বনি। যেন সে কত যুগ-যুগান্ত—কত জন্ম-মৃত্যু-কত অশ্রু-হাসির পরপার থেকে অস্পষ্ট স্মৃতির মত ভেসে আসছে কি এক আহ্বানবাণী বহন করে। কি যেন বলতে চাইছে বাঁশী। যেন কোন্ এক বিস্মৃত প্রিয় নামে কাকে ডেকে ডেকে যাচ্ছে। শ্রীমতী যেন বুঝেও বুঝতে পারছে না সে ভাষা। ধরি ধরি করেও যেন ধরতে পারছে না সে অধরা বাঁশী।

পালংক থেকে নেমে পড়ল শ্রীমতী। অলক্ত-রঞ্জিত পায়ে স্বর্ণ নূপুর মৃদু-মধুর গুঞ্জন করে উঠল। পার্শ্ববর্তী প্রকোষ্ঠে নিদ্রা যাচ্ছে ললিতা

বিশাখা ইন্দুলেখা রূপমঞ্জরী আদি সখিগণ। শ্রীমতীর ব্যাকুল করস্পর্শে জেগে উঠল তারা। সদ্য ঘুমভাঙ্গা চোখের বিস্ময় আর কৌতূহল নিয়ে তাকাল শ্রীমতীর পানে।

শ্রীমতীর মধ্যে একি ভাবান্তর। নয়নে বদনে একি বিচলিত ভঙ্গিমা। তার অন্তরালে এ কোন তন্ময়তা। তবে কি কমলিনী ফুটে উঠছে ধীরে ধীরে। একটি একটি করে কি খুলে যাচ্ছে শতদল।

কাছে এসে শ্রীমতীর হাত ধরল বিশাখা। বলল—সখি, তোমায় আমরা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন দেখে এসেছিলাম। তবে কে তোমাকে এমন করে জাগালো!

লুণ্ঠিত অঞ্চল সংবরণ করে শ্রীমতী বলল—কোথায় যেন এক অপূর্ব বাঁশী বেজে উঠেছে। তার মোহময় সুরে আমার ঘুমের ব্যাঘাত ঘটছে।

সখিগণ উৎকর্ণ হয়ে শোনার চেষ্টা করল। শুনতে পেল শুধু দূরাগত ঝিল্লিরব। রাত্রির পেচক কোথায় কর্কশকণ্ঠে ডেকে উঠল।

ললিতা হেসে বলল—কই সখি, কিসের সুর। কোথায়ই বা তার ধ্বনি।

শ্রীমতী বিস্মিত কণ্ঠে বলল—আশ্চর্য! তোরা কি সত্যই ওই দূর থেকে ভেসে-আসা বাঁশীর সুর শুনতে পাচ্ছিস না। ওই তো সমস্ত রাত্রির আকাশকে আচ্ছন্ন করে তার মধুস্বর জেগে উঠছে, ঝরে পড়ছে তার সুধাধারা।

আর একবার কান পেতে সতর্ক হয়ে শুনতে চেষ্টা করল সখিরা। বাইরে শোনা গেল শিশিরপাতের ধ্বনি আর ভিতরে নিজেদেরই বক্ষস্পন্দন।

সখিদের সকলের দিকে একবার তাকিয়ে স্মিতহাস্যে বিশাখা বলল—সখি, বাঁশী তো কানে বাজছে না, বাজছে তোমার প্রাণে।

শ্রীমতীর মনে হল শুধু প্রাণে বাজছে না, চিত্তের গভীরে এসে যেন বেদনার মত অনুরণিত হচ্ছে। তার সমস্ত পুরাতন চিন্তা-ভাবনা-অনুভূতি-চেতনাকে ওলট-পালট করে যেন কি সন্ধান করছে তার পরতে পরতে। তার হৃদয়খানিকে নিংড়ে নিংড়ে যেন কি মধু সঞ্চয় করতে চাইছে।

বিশাখাকে বলল শ্রীমতী—সখি, কানেই বাজুক আর প্রাণেই বাজুক, আমি সইতে পারছিনে ওই বাঁশীর কুহকী রাগিণী। কি তীক্ষ্ণ তার তানের স্পর্শ। তার মূর্ছনার সূক্ষ্মতা হৃদয়কে বিদ্ধ করছে। গমকের মাধুরী যেন আঘাত করছে এসে আমার জীবনকে।

সঙ্গীত-নিপুণা তুঙ্গদেবীকে আহ্বান করে শ্রীমতী বলল—সখি, নিয়ে এসো তোমার মহতী বীণা। উদাত্ত সুরের ঝংকার জাগাও তার তারে তারে। ঢেকে দাও ওই অজানা বাঁশীর সুর। নইলে ঘুম আমার কিছুতেই আসবে না।

সঙ্গীতগৃহে প্রবেশ করে তুঙ্গদেবী নিয়ে এলো তার বীণা। যন্ত্র, গুরু আর দেবতাকে প্রণাম করে গভীর রাত্রির সুরে সুর মিলিয়ে বাগেশ্রী রাগিণীতে আলাপ সুরু করল। কিছুক্ষণের জন্য বাঁশীর মৃদু সুর আর শুনতে পেল না শ্রীমতী। বীণার সুতীব্র ঝংকারে তা আচ্ছন্ন হয়ে গেল। কিন্তু একি। পরক্ষণেই বীণার ঝংকার-ধ্বনি ছাপিয়ে জেগে উঠল সেই বাঁশরীর গুঞ্জন-ধ্বনি। এবার এক অজানা আশ্চর্য রাগিণীতে বাজল বাঁশী। পৃথিবীর পরিচিত প্রচলিত কোনো রাগ-রাগিণীর সঙ্গেই মেলানো যাচ্ছে না একে। অথচ সমস্ত রাগ আর রাগিনীর যত কিছু সৌন্দর্য মাধুর্য আর শক্তি সব যেন সম্মিলিত সমন্বিত একীভূত হচ্ছে এর সুরে সুরে। মল্লার রাগ নয়, তবু হৃদয়কে গলিয়ে ঝরিয়ে দিচ্ছে। দীপক নয়, তবু যেন প্রেমের অগ্নিশিখা জ্বালাতে চাইছে জীবনে। গান্ধার নয়, তবু যেন চেতনাকে আকর্ষণ করছে সবলে। ভৈরবী নয়, তবু অনুভূতিকে ভরিয়ে দিচ্ছে করুণ বেদনায়। টোড়ী নয়, তবু যেন সম্মোহিত করে ফেলেছে চিত্তহরিণীকে।

কে এই আশ্চর্য শিল্পী! এমন নিপুণতা কি মানুষে সম্ভব!

নিঃশ্বাস ফেলে শ্রীমতী তুঙ্গদেবীকে বলল—সখি, তোমার অসামান্য গীতনৈপুণ্যও আজ পরাভূত হল। কিছুতেই আচ্ছন্ন হল না সেই বাঁশীর সুর। কি এক অসম্ভব, বিস্ময়কর, অভাবিত রাগিণীতে সে বেজে চলেছে অবিরত।

বীণা বন্ধ করে তুঙ্গদেবী হতাশার হাসি হাসল। বলল—তোমার ওই স্বপ্নবাঁশরীর সুরকে ডুবাতে পারে এমন ক্ষমতা নেই আমার বীণার।

বিশাখা শান্ত সুরে বলল—যাও সখী ঘুমাও গে। রাত্রি জাগরণে ক্লান্ত হবে তোমার দেহ—মলিনতা জাগবে লাবণ্যে।

আপন কক্ষে আপন শয্যায় ফিরে এল শ্রীমতী। কিন্তু সে কেমন করে ঘুমোবে। ওই কুহকী বাঁশী যে হরণ করেছে তার রাত্রির আরাম আর অন্তরের প্রশান্তি। হরণ করেছে তার নয়নের নিদ্রা। বার বার একই প্রশ্ন-

ঘুরে-ফিরে আসে মনে। কে এই যাদুকর শিল্পী, যার বাঁশী জানে এমন মোহিনী মায়া। আর কি আশ্চর্য! এই বাঁশীর সুর শুনে কেন সহসা মনে পড়ে যায় সেই অদেখা পদচিহ্নের কথা।

না, সে আত্মবিস্মৃত হবে না। বৃষভানুনন্দিনী রূপময়ী শ্রীমতী কিছুতেই ধরা দেবে না ওই সুরের মায়াফাঁদে।

কোমল শয্যায় দেহ এলিয়ে দিয়ে জোর করে দুটো চোখ বন্ধ করল শ্রীমতী। দুই হাতে চেপে ধরল দুটি কান। আশ্চর্য! তবু বাজতে লাগল সেই মায়া বাঁশরী—বাজতে লাগল শ্রীমতীর অন্তরে বাইরে।

আত্মগত সুরে শ্রীমতী বলল—বাঁশী, তুই আমার বিরাম নিয়েছিস্, নিদ্রা নিয়েছিস্, নিয়েছিস্ স্বপ্নের মাধুরী। আরো কি নিতে চাস্—আরো কি চাস্ তুই আমার কাছে।

বাঁশী যেন বলল—আমি তোমাকে চাই। শ্রীমতী, আমি তোমাকেই চাই।

'চক্ষুঃ পশ্যতি রূপানি মনসা ন তু চক্ষুষা।'

—মহাভারত। শান্তিপর্ব।

তিন

চক্ষে যে-রূপ জাগে,
মন-ই দেখে তা নয়ন দেখার আগে।

যমুনাস্নানে চলেছে রাজনন্দিনী শ্রীমতী। গত রজনীর স্বপন-মাধুরী আবেশ হয়ে জড়িয়ে আছে এখনও তার নয়নে। দীর্ঘ পক্ষ্মছায়ায় এখনো জেগে আছে সে স্মৃতি। এ তো স্নান-যাত্রা নয়, যেন কোন্ উৎসব-যাত্রা। সখিগণ চলেছে সার বেঁধে। পরিধানে তাদের নানা রঙের বসন। মনে হচ্ছে যেন বিচিত্র বর্ণের ফুল দিয়ে গাঁথা একটি চঞ্চল মালিকা। কক্ষে নিয়েছে তারা শূন্য গাগরী। যমুনাবারিতে তা পূর্ণ করে নিয়ে আসবে। রূপ-মঞ্জরী আর ইন্দুলেখা রৌপ্য পাত্রে তৈলহরিদ্রা নিয়ে চলেছে। চম্পকলতিকার হাতে পত্রপুটে রক্ষিত পিণ্ট আমলক। তালে তালে পা ফেলে চলেছে—ছন্দে ছন্দে বাজছে মণিমঞ্জীর—গ্রীবার গজমোতিহার দুলে দুলে উঠছে। কলসে কঙ্কনে স্পর্শ হয়ে জেগে উঠছে রিনিঝিনি শব্দ।

পদস্পর্শে ধূলিরেণু উড়িয়ে সখিগণ চলেছে যমুনাস্নানে আর যেতে যেতে দুচোখ ভরে পান করে নিচ্ছে প্রকৃতির সৌন্দর্যধারা। আনন্দের এক অপূর্ব অনুভূতি জেগেছে শ্রীমতীর মনে। কেন তা সে নিজেই জানে না।

যেন কোন্ অপ্রত্যাশিতকে আজ লাভ করবে তার অন্তর। পরিচয় হবে যেন কোন্ অভাবিতের সঙ্গে। আরো কতবার তো শ্রীমতী এসেছে যমুনা-স্নানে। এমন আশ্চর্য অনুভূতি তো জাগেনি কখনো প্রাণে। আজ প্রভাতের বিহগ-কূজনে এ কোন্ আমন্ত্রণ। কোন্ আনন্দলিপি পাঠালো আজ চম্পা-চামেলির সুরভি। বিলীয়মান শুকতারায় তখনো জড়িয়ে আছে গত রজনীর সুখস্মৃতি। তখনো হয়নি অরুণোদয়, শুধু পূর্ব গগনে রক্তিম বর্ণসমারোহে তার আয়োজন। এ যেন শ্রীমতীর অন্তরের প্রতিচ্ছবি। হৃদয়াকাশের পূর্বরাগ।

ললিতা বিশাখার কণ্ঠে জেগে উঠল সুরলহরী। সেই সুরে সুর মিলিয়ে গান গেয়ে চলল সখিগণ ঃ

> গাগরী আমার, তোকে শূন্য নিয়ে যাচ্ছি। নিয়ে আসব পূর্ণ করে। অনন্ত যমুনাবারি, অজস্র তার দাক্ষিণ্য। তাতে কোনো কৃপণতা নেই। সেই চিরন্তন স্রোতধারা তোকে বুকে তুলে নেবে, দোলাবে তার ঢেউয়ের দোলায়। তারপর নিমজ্জিত করব তোকে। ভয় নেই, সেই মুহূর্তেই পূর্ণ হবি তুই। প্রিয় গাগরী আমার, যতবার শূন্য হবি তুই, ততবার পূর্ণতা আসবে যমুনা-বারির অতল গভীরতা হতে। নিবিড় শীতলতায় তৃপ্ত হবে তোর পরমতৃষা। ধন্য হবি তুই।

দূরে কোথায় বেজে উঠল গোষ্ঠের বাঁশী। এ যেন সেই মায়া-বাঁশরী। কি অপরূপ সুর। যেতে যেতে শ্রীমতী থমকে দাঁড়াল। কেঁপে উঠল তার দীর্ঘ বেণী। ঝলমল করে উঠল মণিময় বেণীবন্ধন।

পাশে ছিল চিত্রা। সেও থেমে গেল শ্রীমতীর সাথে সাথে। মৃদুকণ্ঠে বলল—থামলে কেন সখি? ব্যথা পেলে কি কঠিন কংকরে? কোমল পদতলে তোমার কণ্টক বিদ্ধ হল কি?

শ্রীমতী বলল—সখি চিত্রা, ভেবেছিলাম বৃন্দাবনের সকল মানুষ এখনও নিদ্রিত। কেউ জেগে ওঠার আগেই আমরা গিয়ে পেঁছাব যমুনায়। কিন্তু তা তো নয়। কোন্ রাখাল যেন বাজাচ্ছে প্রভাত-গোষ্ঠের বাঁশী। তবে তো আমাদেরই প্রথম ঘুম ভাঙ্গে নি।

অনঙ্গমঞ্জরী পিছন থেকে বলল—রাজনন্দিনী, আমরা যখন পুরী থেকে বেরিয়েছিলাম তখনও নীরবতা ছিল গগনে পবনে। একে একে জেগেছে

পাখীরা—রঙীন হয়েছে পূর্বাকাশ। ক্রমে ক্রমে ঘুম ভাঙ্গছে একটি দুটি মানুষের। পথে আর বিলম্ব না করে এগিয়ে যেতে হবে সখি।

কিছু দূর এগিয়ে গিয়ে আবার থমকে দাঁড়ালো শ্রীমতী। ঝরা শেফালিতে ছেয়ে আছে পথপ্রান্ত। তাই দেখে ভাবনা জাগল শ্রীমতীর মনে। এখানে পথের বুকে ঝরা শেফালি পূজার অর্ঘ্য রচনা করেছে কেন? তবে কি এই ধূলিতে জেগে আছে সেই পদচিহ্ন? একি তারই পূজা? আহা! এদের পায়ে দলে যাব কেমন করে! এরা যে বুকের মালায় স্থান পাবার যোগ্য। শ্রীমতী আবেগভরে তাকালো তাদের পানে।

বিশাখা বলল—দ্বিধা কিসের সখি, এগিয়ে চল। বেলা যে বয়ে যায়।

সহচরী-পরিবৃতা শ্রীমতী যখন যমুনাকূলে এসে পেঁছালো তখন পূর্বাকাশে তরুণ রবি সবে দেখা দিয়েছে। গাগরী ভূমিতে স্থাপন করে যুক্ত করে প্রভাতসবিতাকে বন্দনা করল সখিগণ—হে হিরণ্যদ্যুতি সূর্য-দেবতা, আমাদের চিত্তকমলকে বিকশিত কর—সুরভিমধু সঞ্চার কর তার মাঝে।

তারপর ব্রজকুমারীগণ দেহ থেকে একে একে খুলে ফেলল সব অলংকার—নূপুর, কংকন, কেয়ূর, কুণ্ডল। খুলে ফেলল রত্নমেখলা, সিঁথিবন্ধ, কর্ণভূষা, কণ্ঠাভরণ। তারপর যমুনাবারি মস্তকে স্পর্শ করে বলল—দেবী যমুনে, তোমার পবিত্র বারিতে চরণস্পর্শের অপরাধ মার্জনা কর।

প্রথমেই জলে নামল ললিতা আর বিশাখা। তারপর লীলাছলে অঞ্জলি অঞ্জলি যমুনাবারি নিয়ে ছিটিয়ে দিতে লাগল সখিদের গায়ে। কেউ কেউ কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করল। কৌতুকে হেসে উঠল কোন কোন সখি। কেউ কেউ বা আবার ঝাঁপিয়ে পড়ল গিয়ে তাদেরই পাশে। তাদের চঞ্চলতায় যমুনাবারিও চঞ্চল হয়ে উঠল।

শ্রীমতীর মধ্যে আজ আর তেমন চঞ্চলতা নেই। তীরে বসে কিছুক্ষণ সে সখিদের হাসি উচ্ছ্বাস সকৌতুকে নিরীক্ষণ করল। সখিগণ অবিরত বারি নিক্ষেপ করে তাকে যমুনাসলিলে অবতরণের আহ্বান জানাতে লাগল। শ্রীমতীর বসনখানি যখন প্রায় সিক্ত হয়ে গেল, তখন সে ধীরে-সুস্থে শূন্য গাগরী কাছে টেনে নিয়ে শিলাসোপানে অবতরণ করল। সখিগণ তৈল-হরিদ্রা দিয়ে তার গাত্রমার্জনা করে দিল, মস্তকে দিল পিষ্ট আমলক। তারপর নিজেরা নিরত হল গাত্রমার্জনে।

এই অবসরে শ্রীমতী সখিদের চঞ্চল কোলাহল থেকে একটু সরে গিয়ে অবগাহন করল প্রাণভরে। দেহমন তার স্নিগ্ধ হয়ে গেল। যমুনার জলে এত শীতলতা আছে, আগে বুঝি জানা ছিল না শ্রীমতীর। শুধু শীতলতা নয়, পবিত্রতাও। পবিত্র হল তার অন্তর বাহির। শূন্য গাগরীকে পরিষ্কার জলে পূর্ণ করবার জন্যে শ্রীমতী এগিয়ে গেল আর একটু গভীরে। ওদিকে সখিদের আনন্দ কলরব তখন আকাশকে আকুল করে তুলেছে।

সহসা গভীর বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠল শ্রীমতী—একি দেখলাম সখি, আমি একি দেখলাম !

ললিতা ও বিশাখা তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল শ্রীমতীর কাছে। শ্রীমতী তখন শূন্য গাগরী নিয়ে জলের বুকে অপলক দৃষ্টি মেলে মুগ্ধার মত দাঁড়িয়ে আছে।

অস্ফুটকণ্ঠে শ্রীমতী বলল—যমুনা জলে আমি কার ছায়া দেখলাম সখি। কি অপরূপ নীলাভ তার কান্তি। কেঁপে উঠল আমার সর্বাঙ্গ—কেঁপে গেল হাত। আর অতর্কিতে হাতের গাগরী যমুনা জল স্পর্শ করতেই কম্পিত ঢেউয়ে ঢেউয়ে মিলিয়ে গেল সে অপূর্ব প্রতিচ্ছবি।

ললিতা বলল—যমুনাপুলিনে জনপ্রাণীর চিহ্নও দেখা যাচ্ছে না। এখানে আবার কার ছায়া পড়বে। শ্রীমতী, তুমি জলে আকাশের ছায়া দেখেছ।

কাতর চোখে সখিদের পানে তাকালো শ্রীমতী। বলল—কিন্তু আকাশের কি নয়ন আছে সখি? সে নয়নের দৃষ্টি কি এক মুহূর্তে হৃদয়ের গভীর অতলতাকে স্পর্শ করতে পারে?

ঃ হয়ত উড়ে যাওয়া খঞ্জনযুগলের ছায়া পড়েছিল জলে। বলল বিশাখা।

ঃ কিন্তু সখি,—শ্রীমতী বলল—তার মস্তকে যে কুঞ্চিত কৃষ্ণ কেশ-কলাপ, তাতে জড়ানো শ্বেত কুসুমের মালা।

বিশাখা বলল—হয়তো কালো মেঘের কোলে বলাকা শ্রেণী উড়ে যাচ্ছিল, তারই ছায়া দেখেছ জলে।

ঃ তাও না হয় হল, কিন্তু আমার পানে তাকিয়ে সে যে হাসল ভুবনমোহন হাসি। আকাশ কি হাসতে জানে সখি?

ঃ আকাশ থেকে ঝরে-পড়া প্রভাতের আলো তোমার কাছে হাসি হয়ে দেখা দিয়েছে। শ্রীমতী, আলোই তো আকাশের হাসি।

নিরুপায় হয়ে শ্রীমতী বলল—হায় সখি, তোদের আমি কেমন করে বোঝাব। একবার যদি দেখাতে পারতাম সে রূপ, তবেই শুধু বোঝাতে পারতাম।

ততক্ষণে অন্যান্য সখিরাও সমবেত হয়েছে শ্রীমতীর চারপাশে।

চিত্রা বলল—শ্রীমতী, বেলা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। এবার গাগরী পূর্ণ করে তীরে ওঠো। গৃহে চলো।

মৃদু একটি নিঃশ্বাস ফেলে শ্রীমতী বলল—সখি, তোরা তীরে ওঠ। যমুনাবারি স্থির হোক। ওই মোহন রূপের ছায়া আর একবার না দেখে আমি গৃহে ফিরব না।

: হায় রাজনন্দিনী, একি তোমার উন্মত্ততা। জলের ছায়া জলেই মিলিয়ে গেছে। তাকে আর বৃথাই খোঁজা। দেখছ না, দক্ষিণ দিক থেকে কেমন একটা হাওয়া দিয়েছে। তাতে ঢেউ জেগেছে যমুনাজলে। এ আর আজ স্থির হবে না। চল সখি, আমরা তোমায় তীরে নিয়ে যাচ্ছি।

শ্রীমতীর মধ্যে জেগে উঠেছে যেন কেমন এক ঔদাস্য, কেমন এক নিস্পৃহা। অভিনয়-পুত্তলিকার মত নিষ্প্রাণভাবে তীরে উঠে সিক্ত বসন পরিবর্তিত করে নীলাম্বরী পরিধান করল শ্রীমতী। তারপর পরিত্যক্ত অলংকারগুলি তুলে একে একে পরে যেতে লাগল যন্ত্রচালিতের মত। সর্বশেষে বহুমূল্য মণিহার কণ্ঠে ধারণ করেই অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল শ্রীমতী।

কি হল। কি হল আবার। সখিরা তাড়াতাড়ি এসে ঘিরে দাঁড়াল শ্রীমতীকে।

আমার মণিহার থেকে বক্ষমণি কোথায় হারিয়ে গেছে। করুণ কণ্ঠে বলল শ্রীমতী!

সে কি কথা। একি অভূতপূর্ব ঘটনা। এমন তো কখনো ঘটে না! সব সখিরা মিলে আঁতিপাঁতি করে খুঁজলে চারদিকে, কিন্তু কোন সন্ধানই মিলল না সে মহামূল্য বক্ষমণির। তবে কি চুরি হল! তাই বা কি করে সম্ভব। এতসব মূল্যবান অলংকারের রাশি ফেলে শুধু শ্রীমতীর বক্ষমণিটি নিয়ে গেল—এ আবার কেমন চোর। বৃন্দাবনে এ কোন্ অভিনব চোরের আবির্ভাব হল। বিস্মিত মনে দুশ্চিন্তাভার বহন করে গৃহে ফিরে চলল সখিগণ।

বক্ষমণির জন্যে কিন্তু শ্রীমতীর মনে কোন শোক নেই। সে যে হারিয়েছে

তার চেয়ে বড় মণি। সে তার মন-মণি।

যে পথে তারা বহুবার যমুনাস্নানে এসেছে সেই পরিচিত পুরাতন পথেই গৃহে ফিরে যাচ্ছে ব্রজবালাগণ। কিন্তু শ্রীমতীর কাছে যেন সব কিছুই নূতন বলে মনে হচ্ছে। চির-চেনার কেন্দ্রস্থলে যেন কোন্ এক অজানা নবীন এসে দাঁড়িয়েছে—তার অজ্ঞাত স্পর্শ অতি পরিচিত পরিবেশকেও কেমন এক মধুর রহস্যে পূর্ণ করে দিয়েছে। যে রূপের ছায়া শ্রীমতী দেখে এসেছে যমুনাজলে, সেই রূপই যেন আত্মগোপন করে আছে অতি কাছে কাছে—চলেছে শ্রীমতীর সাথে সাথে। নিজেকে যেন সে ঢেকে রেখেছে অতি সূক্ষ্ম এক আবরণে। যে কোন মুহূর্তেই আবরণ সরে গিয়ে প্রকাশিত হতে পারে তার আশ্চর্য রূপ। হয়তো এই মুহূর্তেই, কিংবা তার পরবর্তী মুহূর্তে। হৃদয় যেন মুহূর্তে মুহূর্তে সচকিত হয়ে উঠছে মধুর প্রত্যাশায়।

কি বিচিত্র অনুভূতিতে অভিষিক্ত হয়ে আছে শ্রীমতীর দেহ মন-প্রাণ। অসীম শূন্যতার মাঝেও যেন কি এক পরম পরিপূর্ণতা। বেদনার তীব্রতার মধ্যেও কি এক আনন্দের শিহরণ। শ্রীমতী হারিয়েছে মন, হারিয়েছে মণি, তথাপি কি এক অমূল্য সম্পদ যেন বহন করে চলেছে তার অন্তরাত্মা।

এ এক আশ্চর্য পাওয়া। হারানোর মধ্য দিয়ে পাওয়া। সেই অচিন্ত্য প্রাপ্তিই আজ ঘটেছে শ্রীমতীর।

'তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং
যদ্ গৃহ্যমানৈঃ হরিনামধেয়ৈঃ।
ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো
নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু হর্ষ ।।'

—শ্রীমদ্ভাগবত ।। ২।৩।২৪ ।।

চার

সে-হৃদয় পাষাণ-কঠিন
যে-হৃদয় হরিনামে বিভোর না হয়।
বিভোরতা অশ্রু যদি না আনে নয়নে,
হর্ষ যদি রোমাঞ্চ না আনে দেহময় ।।

যমুনার জলে আমি একি ছায়া দেখলাম? এ কোন অপরূপ রূপছবি? নিজের কাছেই নিজে প্রশ্ন করে শ্রীমতী। এ কিছুতেই ভ্রান্তি হতে পারে না—হতে পারে না ছলনা। সে-স্মৃতি যে এখনও আমার প্রদীপে শিখা হয়ে জ্বলছে। ঐ রূপমাধুরী আর একবার দর্শনের জন্য নয়ন আমার তৃষিত। অন্তরে আমার আকুলতার শেষ নেই। আবার যাব আমি যমুনাস্নানে।

প্রতিদিন যমুনাস্নানে গিয়েও ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে শ্রীমতী। দেখা মেলে না আর সেই আকাঙ্ক্ষিত দুর্লভের।

মাঝে মাঝে পরিতাপ করে সে, হায়! কেন আমি যমুনাস্নানে গিয়েছিলাম। কেনই বা তাকিয়েছিলাম সে মায়াময় ছায়ার পানে। মনের মশালে জ্বালিয়ে নিয়ে এসেছি সে রূপের দীপ্ত অনল। আমার দুটি চোখের অজস্র অশ্রুধারায়ও সে আগুন আর নিভবে না।

শ্রীমতীর ভাবান্তর দেখে সখীরা বিচলিত। সকলেই চিন্তিত তার জন্যে। দিন দিন অস্থিরতা বেড়ে যাচ্ছে শ্রীমতীর। প্রত্যেকের কাছেই মিনতি

জানাচ্ছে ঐ রূপ আর একবার দেখাবার জন্যে।

অবশেষে চিত্রনিপুণা বিশাখা বলল—সখি, ধৈর্য ধর, ও রূপ আমি তোমায় দেখাবো চিত্রপটে এঁকে। যে রূপ তুমি দেখেছিলে যমুনা সলিলে সে রূপই দেখতে পাবে রঙের মিছিলে।

মনে মনে ভাবল বিশাখা, সে আঁকবে সেই নীল আকাশের ছবি—উড়ে যাওয়া সেই দুটি খঞ্জন পাখী, আকাশের ঊর্ধ্বে কুঞ্চিত মেঘমালা আর তার বুকে শুভ্রবর্ণ বলাকাশ্রেণী।

কিন্তু একি আশ্চর্য! বারবার আঁকতে গিয়েও বারবার বিস্ময়ে আনন্দে অভিভূত হল বিশাখা। শিথিল করাঙ্গুলিতে নিশ্চল হতে লাগলো অংকন-তুলিকা। চিত্রপটের পানে বিস্ফারিত নয়ন মেলে স্তব্ধ হয়ে বসে রইল সে।

গজগামিনী শ্রীমতী ব্যাকুল পদপাতে কাছে এসে দাঁড়ালো। বিশাখা ত্বরিতে ঢেকে ফেলল চিত্রপট। মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে শ্রীমতী বলল--সখি বিশাখা, চিত্র কি সমাপ্ত হয়েছে? আবরণ সরিয়ে নাও। আমায় দেখতে দাও একটিবার।

আবরণ সরালো না বিশাখা। নতমস্তকে কিছুক্ষণ নীরব থেকে ধীরে ধীরে বলল—এ চিত্র দেখে তোমার কাজ নেই সখি।

অসহিষ্ণু শ্রীমতী তার কোমল দক্ষিণ হাতে সহসা সরিয়ে দিল চিত্রের আবরণ, আর সেদিকে তাকিয়ে গভীর আবেগে নিস্পন্দ হয়ে গেল তার বিচলিত বক্ষ।

: সখি এই তো সেই রূপ, যে রূপের ছায়া দেখেছিলাম আমি যমুনা-জলে। আনন্দ ও বেদনায় রুদ্ধ হয়ে এল শ্রীমতীর কণ্ঠ—বিশাখা, এ রূপ তবে তুইও দেখেছিস্, শুধু ছলনা করেছিস্ এতদিন আমার সঙ্গে।

গভীর কণ্ঠে বিশাখা বলল—শ্রীমতী, তোমার সঙ্গে আমি ছলনা করিনি। এ রূপের ছায়ামাত্র আমি দেখি নি কোনদিন। বুঝতে পারছি না এ কি রহস্য। কেমন করে আমার তুলিতে ফুটে উঠল এ ছবি। আমি আঁকতে গিয়েছিলাম নীল আকাশের ছবি, তুলিতে আমার জেগে উঠলো আকাশের মত নীলকান্ত একখানি বদন-চন্দ্রিমা। আঁকতে চেয়েছিলাম খঞ্জন পাখি, তুলিতে ফুটে উঠল চঞ্চল দুটি খঞ্জন-আঁখি। আকাশে পুঞ্জিত মেঘরাশি যেন কি করে হয়ে গেল তার কুঞ্চিত কেশকলাপ। শুভ্র বলাকাশ্রেণী হল সে-কেশে

জড়ানো শ্বেত কুসুমের মালা। সখি, এ অপরূপ মূর্তি যে আমার স্বপ্নেরও অগোচর।

অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়তে লাগল শ্রীমতীর দুটি আঁখি বেয়ে। যে-রূপ দেখেছিলাম যমুনাজলে, সে রূপই দেখছি এই চিত্রপটে। প্রিয় সখি, তুই না জেনে সেই শ্যামলকিশোর মূর্তিকেই যে রূপ দিয়েছিস্।

অদূরে আনন্দ-কোলাহল জেগে উঠল।

বড়িমার হাত ধরে টানতে টানতে সখিরা এসে ঘিরে দাঁড়ালো বিশাখা আর শ্রীমতীকে।

সকলেরই দৃষ্টি নিবদ্ধ হল সেই চিত্রপটে। মুহূর্তেই স্তব্ধ হয়ে গেল চঞ্চল কলরব। ললিতা ত্বরিত পদে এগিয়ে এসে চিত্রপট হাতে তুলে নিল।

ঃ অপরূপ! এ যে অপরূপ! ললিতার কণ্ঠ যেন গান গেয়ে উঠল—সখি বিশাখা, একি স্বপ্নচিত্র, না কল্পনাচিত্র?

কথা বললেন বড়িমা। মৃদু হাসি হেসে তিনি বললেন—ললিতা, এ স্বপ্ন নয়, কল্পনাও নয়। আমি যে নিজের চোখে এ রূপ দেখে এসেছি। কিন্তু বিশাখা, চিত্র তোমার অসম্পূর্ণ। মস্তকে এঁকে দাও মোহনচূড়া আর তার শীর্ষে বিচিত্র ময়ূরের পাখা। ললাটে এঁকে দাও চন্দন-তিলক—গলায় দুলিয়ে দাও বনফুলের মালা। তবেই নিখুঁত হবে তার ছবি, যাকে আমি দেখে এসেছি।

কম্পিত কণ্ঠে শ্রীমতী প্রশ্ন করল—কে সে? কোন্ তীর্থে তাকে দেখে এলে বড়িমা? সে কতদূরে?

ঃ দূরে নয় কন্যা, কাছে—অতি কাছে। আমাদেরই এই বৃন্দাবনে। হয়তো জীবনেরও খুব কাছে—একেবারে হৃদয়ের কাছাকাছি।

হাসির জ্যোৎস্না ছড়িয়ে বিরজা বলল—এবারে তুমি হাসালে বড়িমা। এই বৃন্দাবনের হাটে মাঠে বাটে আমাদের নিত্য গতাগতি। কিন্তু কই, এ রূপ তো কখনো চোখে দেখিনি!

বড়িমা বললেন—বিরজা, যা পরম দর্শনীয়, যা সব দেখার চেয়ে বড় দেখা, তাকে যে আমরা দেখেও দেখিনে। সে যে আমাদের কাছে থেকেও বহুদূরে! নয়নের সামনে থেকেও নয়নাতীত। তাই দূর দূরান্তের তীর্থে তাকে খুঁজতে গিয়েছিলাম আমি। আজ বুঝেছি তাকে তো শুধু চোখ দিয়ে দেখা যায় না, মন দিয়েও যে দেখতে হয়।

কিছুক্ষণ নীরবতা। তারপর শ্রীমতী বললে—এই অনুপম রূপ যার ছায়া, তাকে একবার দেখবার জন্য আমার নয়ন দুটি ব্যাকুল হয়ে উঠেছে—যেন সে আকর্ষণ করছে আমার আঁখিতারাকে।

শ্রীমতীর পিঠে সস্নেহে হাত রেখে বড়িমা বললেন—রাজনন্দিনী, সে যে আকর্ষণ করে। যুগে যুগে পলে পলে দিনে-রাতে সে যে শুধু আকর্ষণ করে। কেবল নয়ন নয়—শ্রবণ, মন, দেহ, প্রাণ, আত্মা সবকিছু সে আকর্ষণ করে। সে যে কৃষ্ণ।

সহস্রতন্ত্রী বীণার মত অকস্মাৎ একটি অঙ্গুলিঘাতে যেন শিহরিত হয়ে উঠল শ্রীমতী। ব্যগ্র স্বরে বলল—কি বললে বড়িমা, কি বললে! ঐ শব্দটি—ওই নামটি আর একবার উচ্চারণ কর। আর একবার আমার কর্ণযুগল ঐ অপূর্ব নামের ধ্বনি শ্রবণ করুক।

শ্রীমতীর মনে হতে লাগল যেন কত যুগ-যুগান্ত ধরে তার তৃষিত অন্তরাত্মা ঐ নামটির জন্য প্রতীক্ষা করেছিল। যেন কোন্ সুদূর অতীতে শোনা ওই অপূর্ব নামের স্মৃতি এক অজানা সুরভিতে তার জীবনাকাশকে মণ্ডিত করে রেখেছিল। যেন তারই মাধুরী এতকাল গোপনে গোপনে শ্রীমতীর মর্মকোষে সঞ্চিত হয়েছিল। কতকাল—কতযুগ পরে যেন তার ঘুম ভাঙ্গল।

শ্রীমতীর মনের মধ্যেও যে আর একটা মন আছে, তা কি সে জানত। সেই মনেরই নাম বুঝি অন্তর। পদ্মের মাঝখানে যেমন মধুকোষ। শ্রীমতীর অন্তর নীরবে উচ্চারণ করতে লাগল—কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ। আত্মগরিমার কোন্ এক কঠিন প্রস্তর যেন সে নামের স্পর্শে গলে গলে মধুমন্দাকিনী-ধারায় পরিণত হতে লাগল।

'কাঁদালে তুমি মোরে ভালবাসারি ঘায়ে,
নিবিড় বেদনাতে পুলক লাগে গায়ে।
তোমারি অভিসারে যাবো অগমপারে
চলিতে পথে পথে বাজুক ব্যথা পায়ে।'
—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পাঁচ

পটে আঁকা একখানি অপরূপ ছবি—একটি অপূর্ব নামের ঝংকার—একটি বাঁশীর সুরলহরী থেকে থেকে কেবলি মনে পড়ে শ্রীমতীর। সাথে সাথে মনে পড়ে যায় অদেখা একটি পদচিহ্নের কথা, লুপ্ত হয়ে যেতে চায় সমস্ত চেতনা। বিলীন হয়ে যেতে চায় দেহসত্তা।

তাই অবিরাম গৃহকর্মের মাঝে রাজনন্দিনী আজ ডুবিয়ে দিল নিজেকে। নিজ হাতে তাই তুলে নিল রন্ধনের ভার। কত ব্যঞ্জন কত মিষ্টান্নের আয়োজন। রৌপ্যপাত্রে সুগন্ধি ঘৃতাদি-নিষিক্ত পলান্ন প্রস্তুত করবার উপক্রম করছে শ্রীমতী, এমনি সময় সহসা বেজে উঠল রহস্যময় বাঁশী।

চমকে উঠল শ্রীমতী, কেঁপে গেল তার হাত। মনের ভুলে পলান্ন-পাত্রে কানায় কানায় জল ঢেলে ফেলল। বিস্মৃত হল স্তিমিত অগ্নিতে নূতন ইন্ধন যোগাতে। চঞ্চল পদবিন্যাসে ব্যঞ্জন-পাত্র স্থানভ্রষ্ট হয়ে ব্যঞ্জন ছড়িয়ে পড়ল পরমান্নে।

হায় হায়! এ কি হল আমার? এ কি হল!

জল এসে গেল শ্রীমতীর দুটি লজ্জিত নয়নে। স্পন্দিত বক্ষ দুই হাতে চেপে ধরে নিশ্চল মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল সে।

বাঁশী আজ বলল—ওগো কমলিনী, আমি আলোকের দূত হয়ে এসেছি। যে তোমার চিরচেনা তাকে নূতন করে চেনাতে এসেছি। এসেছি সুদূরের

সঙ্গে সন্নিকটের সেতু বেঁধে দিতে। ওগো বিনোদিনী, শোনো তোমার প্রিয়তমের বাণী। জীবনে-মরণে সে তোমায় কোনদিন ভোলেনি। সে তোমারি—সে তোমারি।

শ্রীমতী মনে মনে বলল—বাঁশী, আমি তো তোর কমলিনী নই। কমলিনীর মত আমি তো চোখ মেলিনি মুক্ত আকাশে। আমার যে চারিদিকে বন্ধন। ঐশ্বর্যের বন্ধন, সম্ভ্রমের বন্ধন, বন্ধন কুলশীল অভিমানের। আমার কাছে তুই কি চাস্?

বাঁশী বলল—আলো কমলিনীকে দিতে চায় সুরভি আর সুষমা। শুধু নিজেকে মেলে ধর—খুলে ধর আলোর দিকে, আকাশের দিকে।

ললিতা এসে দেখতে পেল নিজের সঙ্গেই কথা বলছে শ্রীমতী। রন্ধনশালা বিপর্যস্ত—নিভে গেছে ইন্ধন-বিহীন অগ্নি। শ্রীমতীর দু'চোখে অশ্রুধারা।

পেছন থেকে এগিয়ে এসে ললিতা হাত রাখল শ্রীমতীর কাঁধে। কণ্ঠস্বরে কৌতুক মিশিয়ে বলল—একা বসে কার সাথে কথা হচ্ছে সখি? রন্ধনশালার সঙ্গে বিবাদ হচ্ছে, নাকি প্রেমালাপ হচ্ছে নিজের সঙ্গে?

ললিতার দিকে চোখ তুলে শ্রীমতী ম্লান হাসি হেসে বলল—বাঁশীর সঙ্গে ঝগড়া করছি সখি। তাকে বলছি, তুমি অজানা অপরিচিত। কোন্ সাহসে শ্রীমতীর অন্তঃপুরে প্রবেশ করেছ।

ললিতা বলল—সখি, শুধু তোমার অন্তঃপুরে নয়, শুনেছি এ বাঁশী নাকি আজকাল বহু গোপরমণীর অন্তঃপুরে প্রবেশ করতে শুরু করেছে—ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে তাদের গৃহকর্মে।

সহসা উৎফুল্ল হয়ে শ্রীমতী বলল—তাই বল্ সখি, তাই বল্। তবে এ আমার ভ্রম নয়, তবে সত্যই বাজছে ঐ মনোমোহন বাঁশী।

গভীর কণ্ঠে ললিতা বলল—সখি, আমার যেন আজ মনে হচ্ছে অনন্তকাল ধরেই বেজে চলেছে এ বাঁশী। আমরা এতদিন কান পেতে শুনিনি, তাই আমাদের জীবনে ধরা দেয়নি তার সুর। আকাশ-বাতাস, আলো-অন্ধকার বুঝি ঐ সুরেই সুরময়। জলে-স্থলে অরণ্যে-পল্লবে সে-ই বুঝি দেয় নতুন সৌন্দর্য, ফুলে ফুলে সঞ্চার করে নতুন সরসতা।

ঃ ললিতা, তোরা কি জানিস্ কার এ অপূর্ব বাঁশী? শ্রীমতীর সুরে অসীম আগ্রহ ঝরে পড়ল।

: জানা কি সহজ! ললিতা বলল—তবে মনে হয় এ কোনো রাখালিয়া বাঁশী। তুমি যদি বলো তবে অনুসন্ধান করি।

শ্রীমতী সংশয়িত কণ্ঠে বলল—রাখালিয়া বাঁশী তো অনেক শুনেছি সখি। সে বাঁশী তো এমন করে গোচারণ ভূমি ছাপিয়ে চিত্তভূমিতে প্রবেশ করে না। এ রাখালের সন্ধান করবি তুই কেমন করে?

কী উত্তর দেবে ভাবতে লাগল ললিতা। বেশীক্ষণ ভাবতে হল না, পেছন থেকে কে বলে উঠল—আমি বলতে পারি রাজনন্দিনী, আমি বলতে পারি।

ওমা, এ যে বড়িমা। পেছনে তাকিয়ে দুজনেই উৎফুল্ল হয়ে উঠল।

: সন্ধান যদি করতে চাও তার, তবে সুরের ধারা ধরে উৎসের দিকে এগিয়ে চলো। বেরিয়ে পড় নিরুদ্দেশের অভিসারে।

হাসতে লাগলেন বড়িমা।

ললিতাও হেসে বলল—যাব বড়িমা, যাব অভিসারে, যদি তুমি নিয়ে যাও পথ দেখিয়ে।

বার বার মাথা নেড়ে বৃদ্ধা বললেন—না পুত্রী, না। একাই যেতে হয় এ অভিসারের পথে। নইলে অভীষ্টের দেখা মেলে না।

শ্রীমতী বিষণ্ণ নয়নে তাকিয়ে বলল—তবে আমায় বৃথা বলা। আমি কেমন করে যাবো অভিসারে। বড়িমা, আমার যে মর্যাদা আছে—আছে আত্মসম্ভ্রম। আমার সখিরা যাক, তাদের কাছেই পাব আমি সন্ধান।

: কি ভুল তোমার বৃষভানুনন্দিনী! যে বাঁশী তুমি-ই শুনেছ, তার পরিচয় কেমন করে পাবে অপরের কাছে! এ বাঁশী তো একতানে বাজে না। গগনে যা আলো হয়ে বাজে, তাই ভুবনে বাজে সুর হয়ে, আর প্রেম হয়ে বাজে জীবনে। তারও চেয়ে গভীরে যা বাজে সে প্রকাশের অতীত। শ্রীমতী, সে তোমায় টেনে নেবেই।

বড়িমা চলে গেলে ললিতাকে রন্ধন কার্যের যথাযথ ব্যবস্থা করতে বলে শ্রীমতী চলে এল নিজের মহলে। কক্ষ-সংলগ্ন অলিন্দে এসে দাঁড়াল। গৃহ-পারাবতগুলি উড়ে এল চারিধার থেকে। কেউ কেউ শ্রীমতীর কাঁধে এসে বসল। পোষা শারিকা শ্রীমতীকে অভিবাদন জানাল। দিগন্ত-রেখার পানে তাকিয়ে শ্রীমতী মনে মনে ভাবল—যত খুশি বাঁশী বাজুক, আমি কান পাতবো না—প্রাণ পাতবো না ওর পানে।

সঙ্গে সঙ্গেই থেমে গেল বাঁশীর সুর। নীরবতায় ছেয়ে গেল দিগন্ত। আর শ্রীমতীর মনে হল কি এক মহিমা—কি এক মাধুরী যেন হারিয়ে গেল আকাশ আলোক থেকে। সমীরণে নেই যেন বিহ্বলতা—কুসুমে নেই উতলা সুরভি—বিশ্বভুবন যেন তার প্রাণ-সত্তা হারিয়ে ফেলেছে। শ্রীমতীর চারিদিকে যেন শুধু রাশি রাশি বস্তুভার—প্রস্তরস্তূপ।

বাঁশীর সুর আমার সবকিছু সাথে করে নিয়ে গেছে—নিয়ে গেছে সব ভাললাগা। মনে মনে ভাবল শ্রীমতী। বাঁশী তার জীবনে বেদনা নিয়ে এসেছিল, কিন্তু সেই বেদনার গভীরে ছিল কত আনন্দ কত আশা কত শোভা তা কি সে আগে জানত। বেদনায় ফোটে ফুল—বেদনায় গান গায় পাখী—জীবনকে তা সাজিয়ে দেয় অশ্রুর মুক্তাহারে।

শ্রীমতী এই প্রথম বুঝল বাঁশীর সুর চলে গিয়ে তার সব কিছু শূন্য করে দিয়ে গেছে। মনে মনে মিনতি করে বলল—বাঁশী, তুই বাজ। আমার জীবনকে দীর্ণ-বিদীর্ণ করে—আমার অন্তরাত্মাকে শত শত ছিদ্র করে তার প্রতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে তুই বেজে ওঠ। তুই বাজ আর আমাকেও বাজিয়ে তোল, বাঁশী।

বাঁশী আর বাজে না। রাতের তিমির আর কেঁপে ওঠে না থর থর করে। ফুল হয়ে ফুটে ওঠে না আকাশের তারা। শ্রীমতী শুধু কান পেতে রাখে—থাকে আশায় আশায়—থাকে গভীর প্রতীক্ষায়। দিবসে নিশীথে প্রভাতে সন্ধ্যায় শ্রীমতীর মন-প্রাণ উন্মুখ হয়ে থাকে কখন বাজবে বাঁশী। তবু বাঁশী বাজে না।

থেকে থেকে চমকে ওঠে শ্রীমতী। নিজের পায়ের নূপুরের শব্দকে বাঁশীর সুর বলে ভুল করে। দক্ষিণের উতলা পবন এসে যখন শ্রীমতীর বাতায়ন-লগ্ন মাধবীলতায় মর্মরধ্বনি তোলে, তখন শ্রীমতী ভাবে ঐ বুঝি বাঁশী বাজলো। পরক্ষণেই বুঝতে পারে নিজের ভুল। পুষ্প-শোভিত কেতকীবনে যখন মধুলোভী ভ্রমরের গুঞ্জন-তান শোনা যায়, শ্রীমতী তাকে বাঁশীর সুর ভেবে আশান্বিত হয়ে ওঠে। আবার ভুল বুঝতে পেরে লজ্জিত হয়। নিরাশ হয়ে মনে মনে বলে—বাঁশী, তোর কাছে আমি কি অপরাধ করেছি। আর তোকে নিয়ে যে শিল্পী সুরের খেলা খেলে, আমায় নিয়ে তার একি নিষ্ঠুর খেলা। সুরে যার এত মাধুরী, প্রাণে কি তার এতটুকু মাধুরী নেই। তবে তুই নীরব কেন?

তুই বাজ। বাঁশী, তুই বাজ।

'ত্বং ভক্তিযোগপরিভাবিতহৃৎসরোজ
আস্সে শ্রুতেক্ষিতপথো ননু নাথ পুংসাম্।
যদ্‌যদ্ধিয়া তে উরুগায় বিভাবয়ন্তি
তত্তদ্বপুঃ প্রণয়সে সদনুগ্রহায় ।।'

—শ্রীমদ্‌ভাগবত ।। ৩।৯।১১ ।।

ছয়

শ্রুতির সেবায় দেখা যায় তব পথের দিশা,
ভক্তিভাবিত হৃদয়-সরোজে আসন তব।
হে প্রভু, তোমার যে রূপই ভক্ত ধেয়ানে আনে,
সেই সেই রূপে দেখা দাও তুমি করুণাদ্রব ।।

সরস্বতী-নদীতীরে অম্বিকাবন। দেবযাত্রা উপলক্ষে বৃন্দাবনের বহু নরনারী সেখানে পশুপতি-অম্বিকার পূজা করতে এসেছে। এসেছেন বড়িমা। শ্রীমতী এসেছে তার প্রধানা সখিদের নিয়ে।

প্রাতঃস্নান সমাপন করে পূজারিণী বেশে সজ্জিত হয়েছে শ্রীমতী। মন্দিরে যাবে সে দেবদর্শনে। সঙ্গে আছে সখি ললিতা। নীরবে পূজা-প্রার্থনা সমাপন করে চলে আসবে—এই শ্রীমতীর মনের অভিপ্রায়।

ললিতার হাতে অর্ঘ্যথালা তুলে দিয়ে নিজে পুষ্পপাত্র বহন করে মন্দির-প্রাঙ্গণে এসে পৌঁছল শ্রীমতী। অলিন্দের এক প্রান্তে বসে আছেন বড়িমা। কোন্ ভোরে উঠেই ভগবানের ধ্যানজপে নিরত হয়েছেন। এ তার প্রাত্যহিক কর্তব্য। আত্মসমাহিত বড়িমার ধ্যানভঙ্গ না করে শ্রীমতী মন্দিরের অভ্যন্তরে এগিয়ে গেল। দেবতার চরণে অর্ঘ্য নিবেদন করে যুক্তকরে অন্তরের প্রার্থনা জানাল শ্রীমতী—হে মাতা অম্বিকা, আমার দুর্বল চিত্তে তোমার স্বর্গীয় আশীর্বাদ প্রেরণ কর। হৃদয় আমার বিচলিত—তাকে স্থিরতা দাও। এক

আশ্চর্য রূপের ছায়া আমার নয়নকে আকর্ষণ করেছে, পৃথিবীর অপূর্ব এক সুর মুগ্ধ করেছে আমার শ্রবণযুগলকে। জানিনে কেন আমার রসনা আজ একটি নামের মাধুরী আস্বাদন করবার জন্য লোলুপ। তুমি তো সবই জান মাতা অম্বিকা। আমার যে চারদিকে কতশত বন্ধন। হে কাত্যায়নী, তোমার সেবিকাকে পথ বলে দাও।

পেছনে অস্ফুট বিস্ময়োক্তি শুনে ফিরে তাকাল শ্রীমতী। বড়িমা দাঁড়িয়ে আছেন বিস্ময়-বিস্ফারিত দুটি চোখ মেলে। তার বিহ্বল দৃষ্টি পশুপতি-মূর্তির পানে নিবন্ধ।

ঃ কি করে এ সম্ভব হল। মৃদুকণ্ঠে বললেন বড়িমা। যে মালা আমি পথে গোপ-বালকের গলায় দিয়ে এলাম, তা কি করে এলো এই মন্দিরের শ্রীমূর্তির গলায়। শ্রীমতী, ভাল করে তাকিয়ে দেখ তো, প্রভু পশুপতির গলায় যে মালা রয়েছে তাতে কোন বৈশিষ্ট্য দেখতে পাচ্ছ কি না?

শ্রীমতী মালার উপর সতর্ক দৃষ্টি নিবন্ধ করে বলল—বড়িমা, লাল, সাদা আর নীলফুলে গাঁথা তিনটি মালা বেণীর মত পরস্পর জড়িয়ে রচিত হয়েছে এ বৈজয়ন্তী হার। মালার মধ্যভাগে রয়েছে একটি রক্তাভ শ্বেতপদ্ম। তার প্রতিটি দলে চন্দন দিয়ে ওঁ লেখা আছে। কিন্তু বড়িমা, এতে এত বিচলিত হবার কি আছে?

ঃ তবে শোন শ্রীমতী। বড়িমা পাশে বসলেন। দেবাদিদেবকে নিবেদন করবার জন্য আজ খুব ভোরে উঠে নিজ হাতে আমি ওই মালাটি রচনা করেছি। কিন্তু মন্দিরে আসবার পথে ঊষার অস্পষ্ট আলোকে হঠাৎ এক গোপ-বেশধারী কিশোর আমার সামনে এসে দাঁড়াল। তাকে আগে আমি দেখেছি দূর থেকে, আজ দেখলাম একেবারে মুখোমুখি। তার শ্যামল রূপে অপূর্ব মাধুরী। মুখের হাসি দেখে মনে হচ্ছিল যেন সে আমার কত কালের পরিচিত অতি আপনার।

মৃদুমধুর হেসে সে বলল—আজ ভোরে সাজাবার বেলা মা আমায় মালা পরিয়ে দিতে ভুলে গেছে। তোমার মালাটি আমায় দাও।

হৃদয় বলল—এই তো সেই। পরিয়ে দাও মালা। ধন্য হও। তবু সংশয় বাধা দিল। আমি বললাম—এ মালা যে আমি দেব শংকরকে নিবেদন করবার মানস করেছি। তোমায় দেব কেমন করে।

শুনে সে হাসতে লাগল, বলল—আমায় দিলেই তাকে দেওয়া হবে।

বলে এক রকম জোর করেই মালাটি গলায় পরে নিল। কিন্তু শ্রীমতী, কি আশ্চর্য! এখানে পশুপতির গলায় যে সে মালাই দেখতে পাচ্ছি।

শ্রীমতী বলল—বড়িমা, এতে এত বিস্মিত হবার কি আছে। হয়তো কোন ফাঁকে সেই গোপ-কিশোরই মন্দিরে এসে বিগ্রহকে পরিয়ে দিয়ে গেছে তার গলার মালা।

মাথা নেড়ে অস্বীকৃতি জানিয়ে বড়িমা বললেন—তা হতে পারে না শ্রীমতী। ভোরে মন্দিরের দুয়ার যখন সবে মুক্ত হয়েছে, তখন আমিই প্রথম এসে পেঁাচেছি এখানে। তারপর এলে তুমি। এর মধ্যে আর কেউ এলে আমার দৃষ্টি এড়িয়ে যেত না। যদি কেউ এসেও থাকে—না শ্রীমতী, আমার মনে আর কোনো সংশয় নেই। আমি চিনেছি তাকে—চিনেছি সেই গোপ-কিশোরকে। সে আর কেউ নয়—এ সেই, যার ইঙ্গিত পেয়েছিলাম শচীতীর্থে মহর্ষি গর্গাচার্যের বাণীতে—যার পদচিহ্ন দেখেছিলাম বৃন্দাবনের পথ-ধূলিতে।

সেই পদচিহ্নের কথা শুনে কেঁপে উঠল শ্রীমতীর হৃদয়। তবুও অবিশ্বাসের বিষণ্ণ হাস্যরেখা ওষ্ঠে ফুটিয়ে সে বলল—হায় বড়িমা, কোথায় তোমার আরাধনার ধন, আর কোথায় সে সাধারণ গোপ-কিশোর।

বড়িমা বললেন—ওগো শ্রীমতী, সে সাধারণ নয়—সাধারণ নয়। তবে শোনো কন্যা, এ সেই, যার রূপের ছায়া তুমি দেখেছিলে যমুনাজলে, বিশাখার চিত্রপটে ফুটে উঠেছিল যার অপূর্ব রূপ।

শ্রীমতী চমকে উঠল বড়িমার কথা শুনে। বলল—এ অসম্ভব। আমি যে-ছায়া দেখেছিলাম যমুনাজলে সে যে অপার্থিব রূপ। মানুষী কায়া তো ছিল না তার। সে কেমন করে হতে পারে বৃন্দাবনের এই গোপ-কিশোর।

শ্রীমতীর কথা শেষ হতে না হতেই মন্দির-প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়ালো এক বালযোগী। খঞ্জনি বাজিয়ে সে গান ধরল। কণ্ঠস্বর থেকে যেন মধু ঝরে পড়তে লাগল। বালযোগী গাইল :

সাধনার ধন যদি সাধারণ সেজে আসে তাকে কেমন করে চেনা যায়? চেনা যায় জ্ঞানে। অন্তর্যামী যদি আসে নয়নগামী হয়ে, তাকে কেমন করে বোঝা যায়? বোঝা যায় ধ্যানে। পরম-স্বামী যদি আসে জীবন-স্বামী হয়ে, কেমন করে ধরা যায় তাকে? ধরা যায় প্রেমে। জ্ঞান হল

রত্নহার, তার আছে ভার। ধ্যান হল স্বর্ণহার, তার আছে ধার। কিন্তু প্রেম ফুলহার, স্পর্শ তার মৃদু আর কোমল। ভেবে দেখ, কোন্ মালা পরাবে তার কমনীয় কণ্ঠে।

গান শেষ হল। গান তো নয়, যেন বড়িমার অন্তরের অনুভূতির প্রকাশ। যেন শ্রীমতীর জীবনের প্রশ্নের উত্তর।

সকলে ভিক্ষা দিতে গেল বালযোগীকে। যোগী কারু ভিক্ষাই গ্রহণ করলে না। নিরাশ হয়ে একে একে ফিরে গেল তারা। বড়িমা বললেন—বালযোগী, তবে কি তুমি দেবমন্দির থেকে শূন্য হাতে ফিরে যাবে?

যোগী নির্লিপ্তকণ্ঠে বলল—শুধুমাত্র একজনার ভিক্ষা আমি গ্রহণ করতে পারি। বলে ইশারায় দেখিয়ে দিল শ্রীমতীকে।

কি সৌভাগ্য শ্রীমতীর! বড়িমা আনন্দিত হলেন মনে মনে। ইঙ্গিতে আহ্বান করলেন শ্রীমতীকে। শ্রীমতী এগিয়ে এলো। সঙ্গে এলো সখি ললিতা।

যোগীবরকে উদ্দেশ্য করে ললিতা বলল—বল যোগী, কি তোমার প্রার্থনা। সঙ্গত হলে আমাদের রাজকুমারী অবশ্য তা পূর্ণ করবেন।

যোগী বলল—আমার প্রার্থনা আমি একান্তে রাজকুমারীর কাছে নিবেদন করতে চাই। বলে তাকালো কৌতূহলী দর্শকদের দিকে। তারা সকলেই সরে গেল যোগীর অভিপ্রায় বুঝে। ললিতা আর বড়িমা চলে যাবার উপক্রম করতেই বাধা দিল শ্রীমতী। মর্যাদা-ব্যঞ্জক কণ্ঠে বলল—এদের কাছে আমার কিছুই গোপন নেই যোগী। এরা থাকতে পারে।

স্মিতহাস্যে যোগীবর বলল—বেশ, তবে রাজনন্দিনী, শুনুন আমার প্রার্থনা। যে আমার সখা—আমার প্রভু, আজ তার হয়ে আপনার কাছে ভিক্ষা চাইতে এসেছি। বলুন, ভিক্ষা দিতে আপনি প্রস্তুত কিনা?

গম্ভীরকণ্ঠে শ্রীমতী বলল—তার আগে আমি জানতে চাই কে তোমার প্রভু ও সখা, আর তার প্রার্থনাই বা কি।

: এই আমার সখার অভিজ্ঞান। বলে ঝুলি থেকে কিছু বের করে যোগী তুলে দিল শ্রীমতীর হাতে।

শ্রীমতী চমকে উঠল। বিস্ময়ে আনন্দে যেন শিহরিত হয়ে উঠল তার অন্তরাত্মা। সে ভাব গোপন করে বলল—কি আশ্চর্য! এ যে সেই বক্ষ-মণি

যা আমি হারিয়েছিলাম যমুনার ঘাটে। এতদিনে বোঝা গেল এ মণি চুরি গিয়েছিল, আর যোগীবর, তোমার সখাই সেই চোর।

যোগী মিষ্টি করে হাসল, বলল—সে বড় চতুর চোর। মূল্যহীন জিনিস চুরি করে তাকে সে অমূল্য করে তোলে, আর অমূল্য করে নিয়ে তা আবার ফিরিয়ে দেয় মালিককে। আপনার বক্ষ-মণিতে ছিল না বক্ষমধু—যার নাম প্রেম। তাই এই বক্ষ-মণি চুরি করে একে প্রেমে অভিষিক্ত করে আবার তা ফিরিয়ে দিয়েছে আপনার হাতে। এই মণির সঙ্গে সঙ্গে গ্রহণ করুন আমার সখার অসীম প্রেম—স্বীকার করুন তাকে। আর সখাকে ভিক্ষা দিন আপনার হৃদয়-সুধার একটি অতি ছোট বিন্দু—যা বক্ষ-মণির চেয়েও অনেক ছোট।

ললিতা একটু কুটিল হাসি হেসে বলল—এতক্ষণে সবই বোঝা গেল। আমি তোমায় চিনেছি সুবল-সখা। তবে যোগী বেশে তোমাকে যে বেশ মানিয়েছে একথা স্বীকার করতেই হবে। তোমার সখা হচ্ছেন নন্দ-নন্দন শ্যাম-কানাই এবং সহজ কথায় তিনি আমাদের সখিকে প্রেম নিবেদন করেছেন। তার রুচির নিন্দা আমি করতে পারছিনে, তবে সখি শ্রীমতীকে বিরূপ বলে মনে হচ্ছে।

যোগীবেশধারী সুবল করজোড়ে নিবেদন করল—রাজনন্দিনী শ্রীমতী, আমার সখা আপনাকে এই কথা বলে পাঠিয়েছেন—হে কমলিনী, সেদিন প্রভাতে যমুনা-স্নানকালে তোমাকে দেখেই আমি চিনেছি। তুমি আমারি। আমিও তোমারি, আমায় তুমি গ্রহণ কর।

শুনতে শুনতে রক্তাভ হয়ে উঠল শ্রীমতীর কপোল। বিন্দু বিন্দু স্বেদ জমে উঠল ললাটে। ঈষৎ স্ফুরিত হল নাসারন্ধ্র। হাত থেকে বক্ষ-মণি খসে পড়ে গেল মাটিতে। মৃদু অথচ দৃঢ়কণ্ঠে বলল—তোমার সখাকে বোলো তার সাহসের সীমা নেই। কিন্তু আমি রাজনন্দিনী শ্রীমতী। আমার বংশমর্যাদা আছে—আছে কুলগৌরব। স্বতন্ত্রা আমি নই। তোমার সখা যেন আর কোনদিন আমার পথে না আসে।

বড়িমা সস্নেহে শ্রীমতীর বাহু স্পর্শ করে বললেন—পুত্রী, স্থির হও। নন্দ-নন্দনকে প্রত্যাখ্যান করে তুমি যে নিজের হৃদয়কেই প্রত্যাখ্যান করছ।

চলে যেতে যেতে সুবল বলল—ভয় নেই, আমার প্রভু প্রত্যাখ্যান জানে না। বার বার উপেক্ষিত হয়েও বার বার ভিক্ষা চাইবে দুয়ারে এসে।

রাজা হয়েও হাত পাতবে কাঙালের মত। তারপর তাকে স্বীকার করতেই হবে—ডেকে নিতে হবে অন্তঃপুরে। রাজনন্দিনী শ্রীমতী, এই আমার শেষ কথা।

সুবল চলে গেলে কয়েক মুহূর্ত পাষাণ-প্রতিমার মত দাঁড়িয়ে রইল শ্রীমতী। হায়! হৃদয় যা চাইছে তারই বিরুদ্ধাচরণ করতে গিয়ে মন ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছে। চোখের আগুন তার ধীরে ধীরে নিভে এল। তারপর এক সময় নত হল আঁখি-পল্লব, দুটি সূক্ষ্ম জলধারা নেমে এল কপোল-সীমানা পার হয়ে। নিজেই বিস্মিত হল শ্রীমতী। কেন এ অশ্রু! পরাজয়ে না অভিমানে, না বেদনায়? কিসের বেদনা? বাইরে দাঁড়িয়ে কে যেন করাঘাত করছে লজ্জা আর ভীতির দুয়ারে, বলছে—দ্বার খোলো, দ্বার খোলো। কিন্তু খোলা যাচ্ছে না সম্ভ্রমের দরজা। ভারি দরজা পাথরের মত চেপে বসেছে।

অতর্কিতে শ্রীমতীর বুক থেকে একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস খসে পড়ল। সে যেন মিনতি করে বলল—হায় শ্রীমতী, শাসনের দ্বার যদি খুলতে নাই পার, খুলে দাও গোপন-অভিসারের বাতায়ন। সে পথে আসুক অনন্ত আকাশ। আসুক তার রাজীবলোচনের আলোকিত দৃষ্টি।

'মাধব তুয়া অভিসারক লাগি।
দূরতর পন্থ গমন ধনী সাধয়ে
মন্দিরে যামিনী জাগি।।'
—গোবিন্দদাস।।

সাত

সেই সন্ধ্যায় উন্মুক্ত বাতায়নে বসে আছে বৃষভানুনন্দিনী শ্রীমতী। বসে বসে শুধু ভাবছে আর ভাবছে। প্রত্যাখ্যাত যে হয় আঘাতের বেদনা তো তারই, কিন্তু যে প্রত্যাখ্যান করে বেদনা কি বাজে তারও বুকে? নইলে শ্রীমতীর হৃদয় আজ কেন দোলে এমন দোলায়—সংশয় হতে প্রত্যয়ে, প্রত্যয় হতে সংশয়ে। কাকে প্রত্যাখ্যান করল শ্রীমতী? যার নাম প্রতি পলে তার হৃদয়ের গভীরে উচ্চারিত হচ্ছে? অথবা কি তাকেই, যার বাঁশীর সুর শ্রীমতীর মনকে কোন্ এক অনাস্বাদিত মাধুরী-ধারায় অভিসিঞ্চিত করেছে? কিংবা এ কি সেই তনুমনোহর, যার ছায়া সে দেখেছে যমুনাজলে আর হারিয়ে ফেলেছে আপনাকে? সেই আকুলতা যে এখনও তার জীবনের স্থিরতাকে কম্পিত তরঙ্গিত করছে। অথবা এ তিনই কি এক? আর এই একেরই কি স্বাক্ষর সেই অপূর্ব অদৃষ্ট পদচিহ্ন?

হায়! সত্যই বলেছ তুমি বড়িমা। বাঞ্ছিতকে প্রত্যাখ্যান করে বুঝি অস্বীকার করেছি আমি নিজেকেই। তবু প্রশ্ন জাগে মনে। এই যদি আমার হৃদয়-হরণ, তবে সে এমন ভিক্ষুকের মত এল কেন আমার দ্বারে? কেন বীরের মত আপন মহিমায় ছিনিয়ে নিয়ে গেল না তার মনোগতাকে—কেন শ্রীমতীর মস্তক লুটিয়ে দিল না তার চরণের ধূলায়।

কান্না গুমরে উঠল শ্রীমতীর বুকের মধ্যে। বাতায়ন-পীঠে ললাট রেখে মনে মনে প্রার্থনা জানাল—হে প্রিয়, আমি সামান্যা নারী, বুঝিনে তোমার রহস্যলীলা। যদি সত্যই তুমি ধরা দিতে চাও আমার প্রেমবন্ধনে তবে কৃপা করে চিনিয়ে দাও নিজেকে—জানতে দাও তুমি কে।

আর তখনই সেই মুহূর্তে শ্রীমতীর অন্তরের আকুল কান্নার সুরে সুর মিলিয়ে এতদিন পরে আবার বেজে উঠল সেই মোহনবাঁশী, অতি মৃদু অতি কোমল স্বপ্ন-সুষমার মত। উদাস হেমন্তমধ্যাহ্নে হারানো দিনের সুখ-স্মৃতি যেমন করে ভেসে আসে প্রাণের বাতায়নে, তেমনি করে ভেসে এল সেই সুর-লহরী—বিরহের অশ্রুধারার মত, নামহারা কুসুমের দৃষ্টিহারা সুরভির মত। মনে হল যেন কোন্ কুলহারা তরী ভেসে চলেছে দিশাহারা অসীম সাগরে।

সন্ধ্যার করুণতাখানিকে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত করে বেজে চলেছে বাঁশী। কোমল গান্ধার আর ধৈবতের স্বরগ্রামকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে কার মোহন অঙ্গুলির স্পর্শে স্পর্শে সে শিহরিত গুঞ্জরিত হয়ে উঠছে। দিগ্-দিগন্তব্যাপী সেই সুর যেন ধীরে ধীরে একীভূত হল ঘনীভূত হল পরম গভীরতায়। তারপর শ্রীমতীর মনে হল যেন সেই ঘনীভূত সুরে জেগে উঠল কি এক অস্পষ্ট ভাষা। কি যেন বলতে চাইছে বাঁশী, বুঝতে পারছে না শ্রীমতী। সমস্ত মন-প্রাণ কেন্দ্রীভূত করে কান পেতে রাখল সে, আর তখনি স্পষ্ট হতে স্পষ্টতর হয়ে ফুটে উঠল বাঁশীর ভাষা। শ্রীমতীর কানে গুঞ্জরিত হল তার বাণী।

বাঁশী বলল—ওগো শ্রীমতী, ওগো আত্মবিস্মৃতা, অনন্তকাল ধরে আমার আরাধিতা তুমি, আবার তুমিই আমার আরাধিকা। তাই তুমি রাধা। আমায় যদি জানতে চাও—যদি বুঝতে চাও আমার অনুরাগ, তবে এসো এসো শ্রীমতী—এসো আমার রাধা।

হায়! রাধা রাধা বলে বাঁশী যে আমাকেই ডাকছে। কান্না জেগে উঠতে চাইল শ্রীমতীর কণ্ঠ ঠেলে। প্রেমের দূতকে অস্বীকার করেছি আমি, কিন্তু বাঁশীর এই আহ্বানকে কেমন করে প্রত্যাখ্যান করব। সত্যই বুঝি প্রত্যাখ্যান মানে না সে পরম-প্রেমিক। রূপ হয়ে সে ফুটে ওঠে নয়নের সম্মুখে। নয়ন যদি প্রত্যাখ্যান করে—যদি না দেখে সে রূপ, তবে সুর হয়ে বাজে সে শ্রবণে। শ্রবণ প্রত্যাখ্যান করলে নাম হয়ে জাগে রসনায়। অথবা সে গন্ধ হয়ে বাসা বাঁধে নাসিকায়—স্পর্শ হয়ে জড়িয়ে থাকে প্রতিটি অঙ্গ। তবু

যদি প্রত্যাখ্যান কর তাকে, তবে সে প্রেম হয়ে রোদন করবে তোমার হৃদয়ে। সকল ইন্দ্রিয়ের দুয়ার রুদ্ধ করলেও হৃদয়ের দ্বার কেমন করে রুদ্ধ করতে পারবে তুমি শ্রীমতী?

কিন্তু তার আগে আমি জানতে চাই, কে এই বাঁশরিয়া! যমুনাজলে কি জেগেছিল এরই সুমোহন প্রতিচ্ছবি আর সেই কি নন্দ-নন্দন কৃষ্ণ-কিশোর? কিন্তু কেমন করে হবে এ জিজ্ঞাসার সমাধান? সহসা বিদ্যুতের দীপ্তির মত উজ্জ্বল সংকল্প-রেখা স্ফুরিত হল শ্রীমতীর মনে। আমি যাব অভিসারে। নিজের চোখে দেখে আসব তাকে—জেনে আসব, সে কে।

এ কথা মনে হতেই শ্রীমতী সচকিত হল—যেন জেগে উঠল এক নিদ্রাবেশ থেকে। সখিদের ডেকে বলল—ওলো কোথায় তোরা ললিতা, বিশাখা, চিত্রা—কোথায় সখি ভদ্রা, ইন্দুলেখা, রূপমঞ্জরী।

ললিতা উত্তর দিল—আমরা তোমার পাশে পাশেই রয়েছি সখি, রয়েছি তোমার কাছে কাছে। শুধু তোমার ভাবান্তর দেখে নীরব হয়ে আছি এতক্ষণ। প্রস্তুত রয়েছে আমাদের মুরজ মুরলী বীণা। বল কোন্ রাগিণী বাজাতে হবে। অনঙ্গমঞ্জরী বসে আছে পায়ে স্বর্ণ-নূপুর বেঁধে তোমার আদেশের প্রত্যাশায়, বল কোন্ ছন্দে নৃত্য সুরু হবে। চিত্রা আর পদ্মা অপেক্ষা করছে তোমার প্রসাধন-সম্ভার নিয়ে, বল কোন্ সাজে আজ সাজিয়ে দেবে তোমায়।

কোনো প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে শ্রীমতী বলল শুধু একটি কথা—আমি আজ অভিসারে যাব।

কৌতুক আর শংকা চোখে নিয়ে সখিরা নিঃশব্দে তাকালো পরস্পরের পানে। তারপর ললিতা উঠে ধীর পায়ে এগিয়ে এল। শ্রীমতীর বাহু স্পর্শ করে গভীর কণ্ঠে বলল—অভিসার শুধু কথার কথা নয় সখি। এ যে ক্ষুরধার পথে দুস্তর যাত্রা। কেউ জানে না এ পথের শেষ কোথায়। সুদীর্ঘ পথে চলতে তো অভ্যস্ত নয় তোমার চরণ। পথে আছে কত আঁকাবাঁকা জটিলতা। তার গোলকধাঁধা তোমায় জড়িয়ে ফেলবে। যেতে যেতে রাত্রি যদি গভীর হয়, যদি গৃহ-বাতায়নে সব আলো নিভে যায়, চাঁদ যদি ডুবে যায় মেঘের আড়ালে, তখন অন্ধকারে অনুভবে পথ চলতে পারবে কি শ্রীমতী? ঋতু-চক্রের আবর্তনে যখন বর্ষা আসবে—মেঘধারায় সিক্ত হবে তোমার অভিসার-পথ, তখন সেই পিছল পথে পারবে কি এগিয়ে যেতে? পথ যদি প্রসারিত

হয় কণ্টকময় অরণ্যের মধ্য দিয়ে, তবে তোমার কমল-চরণে পারবে কি সে পথের তীক্ষ্ণ কাঁটা দলে যেতে ?

: তবু আমাকে যেতেই হবে—যেতে হবে ওই বাঁশীর সুরধারা অনুসরণ করে। বলল শ্রীমতী।

রহস্যময়ী পদ্মা বলল—যেতে তোমায় হবেই সখি, কিন্তু কি লাভ ব্যর্থ অভিসারে গিয়ে, যদি না পেঁছাতে পার অভীষ্টের কাছে—খুঁজে না মেলে যদি অন্বিষ্টকে। তাই নিজেকে আগে প্রস্তুত কর শ্রীমতী, কর অভিসারের সাধনা।

একটু কাল ভাবল শ্রীমতী। অবশেষে বলল—তাই হবে সখি, তাই হবে। নিজেকে প্রস্তুত করব আমি, তারপর যেতেই হবে অভিসারে। নইলে মিটবে না আমার মনের জিজ্ঞাসা, ঘুচবে না অন্তরের সংশয়।

রাত জাগে শ্রীমতী। সাথে জাগে তার ধৈর্য আর স্থিরতা। সকলে যখন নিদ্রার ঘোরে আবেশ-শয্যায় এলিয়ে পড়ে, তখন শয্যার আরাম ত্যাগ করে জেগে ওঠে শ্রীমতীর অন্তর। দিবসের কর্ম সমাপণ করে পরিশ্রান্ত দেহে যখন সকলে নিশ্চেষ্ট হয়ে পড়ে, তখন সুরু হয় শ্রীমতীর চেষ্টা। চলে তার অভিসার-সাধনা। আঙ্গিনায় কাঁটা বিছিয়ে তার ওপরে কোমল চরণ-কমল ফেলে ফেলে হেঁটে যায় শ্রীমতী।

কণ্টকের আঘাতে রক্তাক্ত হয় অরুণাভ পদতল আর সে রক্ত ঝরে পড়ে বিন্দু বিন্দু—যেন কাঁটার ললাটে পরায় জয়-টীকা। নুপুরের ধ্বনি গোপন করার জন্যে তাকে চীরখণ্ড দিয়ে আবৃত করে নেয়। তারপর গাগরীর জল ঢেলে প্রশস্ত আঙ্গিনা পিছল করে আঙ্গুল চেপে চেপে চলে লঘু পদ-সঞ্চারে। দীর্ঘ পথ-যাত্রায় অভ্যস্ত হবার জন্যে সমস্ত রাত ধরে বার বার করে আঙ্গিনা-পরিক্রমা। তিমির-রজনীতে অন্ধকার পথে চলতে হবে, তাই দুই করতলে দুটি আঁখি আচ্ছাদন করে অনুমানে পদচারণা করে শ্রীমতী।

রজনীর শেষ যামে শিথিল পদযুগল বার বার স্খলিত হয়—জড়িয়ে জড়িয়ে আসে শ্রান্ত আঁখি। তবুও ক্ষান্ত হয় না বৃষভানুনন্দিনী। সখিগণ মিনতি করে—চেষ্টা করে তাকে নিবৃত্ত করার জন্য। কিন্তু বিরতি মানে না তার একান্ত সাধনা।

পূর্ব গগনে ঊষার প্রথম আভাস দেখা দিলে তবেই সাঙ্গ হয় শ্রীমতীর রাত্রির তপস্যা। রাজনন্দিনী হয়েও শ্রীমতী আজ ব্রতচারিনী।

'একে পদ-পংকজ   পংকে বিভূষিত
কণ্টকে জরজর ভেল।
তুয়া দরশন আশে   কছু নাহি জানলুঁ
চিরদুখ সব দূরে গেল ।।'
—গোবিন্দদাস ।।

আট

কৃষ্ণাতিথির গভীর রজনী। গাঢ় ছায়া নেমেছে দিকে দিকে। নেমেছে নীরবতা। আকাশ যেন মুঠো মুঠো অঞ্জন ছড়াচ্ছে। ঝরাচ্ছে নিদ্রার প্রশান্তি।

নীরবতা নামেনি শ্রীমতীর মনে। নেই নিদ্রা, নেই শান্তি। শুধু এক অধীর বিহ্বলতা। এক শূন্যতার বেদনা। এক অন্তহীন জাগরণ।

এতক্ষণ বেজেছিল বাঁশী। 'রাধা-রাধা' বলে ডেকে ডেকে কেঁদে কেঁদে চলেছিল। বলেছিল—আমি গৃহে গৃহে প্রাণে প্রাণে তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। খুঁজে বেড়াচ্ছি দিবসে নিশীথে যুগযুগান্তে। কোথা তুমি রাধা, তুমি কোথা। অনন্তকাল ধরে আমি তোমার অভিসারে যাচ্ছি। যাচ্ছি রূপ হয়ে, সুর হয়ে, প্রেম হয়ে। আমার অভিসারে আসার সময় কি তোমার আজও হলো না।

সখীদের মাঝখানে শ্রীমতী বসেছিল। দেখেও দেখছিল না কিছু। শুনেও শুনছিল না তাদের আলাপ। সহসা সে উঠে দাঁড়াল। বেজে উঠল

চরণের মঞ্জীর। বেজে উঠল কঙ্কণ। বেণী দুলে উঠল ভুজঙ্গিনীর মত। প্রথমে পদ্মার দিকে তাকাল শ্রীমতী। তারপর ললিতার দিকে। তারপর বিশাখার দিকে। অবশেষে ধনিষ্ঠার দিকে তাকিয়ে বলল—আমি অভিসারে যাব। কোনো বাধা মানব না।

নীরব হয়ে রইল সখীরা। কি বলবে ভেবে পেল না। শুধু ললিতা বলল—একান্তই যদি যাবে, আসুক শুক্লা তিথি। এই কৃষ্ণা যামিনীতে কেন যাবে তিমিরাভিসারে।

ঃ নইলে আমার মনের সংশয়-তিমির কিছুতেই ঘুচবে না। বলেই শ্রীমতী বিনা দ্বিধায় যাবার জন্য পা বাড়াল।

বাধা দিল পদ্মা। বলল—শোনো শোনো শ্রীমতী, আত্মহারা হয়েছ তুমি। অঙ্গে তোমার শুভ্র দুকুল বসন। কণ্ঠের মুক্তাহার শুভ্রতর। তারও চেয়ে শুভ্র বেণীতে জড়ানো মল্লিকাদাম। এই শুভ্র বেশে যদি যাও তিমিরাভিসারে, তবে আত্মগোপন করবে কেমন করে?

সুমুখের সুবর্ণদর্পণে নিজের প্রতিচ্ছবির পানে তাকাল শ্রীমতী। হতাশকণ্ঠে বলল—সখি, তবে আমায় তোরা সাজিয়ে দে তিমিরাভিসারে।

অল্প হাসল ললিতা। বলল—তাই হবে, সখি। রাত্রির কালোর মাঝে মিলিয়ে দিতে হবে তোমার সবটুকু আলো। গাঢ় নীলাম্বরীর আবরণে ঢেকে দিতে হবে তোমার তনুজ্যোতি। মুক্তাহার খুলে ফেল। কণ্ঠে পর নীল মণিহার। হীরক-বলয় খসিয়ে ফেল হাত থেকে। মুছে ফেল ললাটের শ্বেতচন্দন লেখা। মল্লিকামালার বেষ্টন হতে বেণীবন্ধন মুক্ত করে মুখের দুপাশে এলিয়ে দাও কেশকলাপ। কুন্তলমেঘে আচ্ছাদিত হোক তোমার মুখচন্দ্রিমা। সখি চিত্রা আর পদ্মা, শ্রীমতীকে সজ্জিত করার ভার তোমাদের।

সজ্জাশিল্পে নিপুণা চিত্রা আর পদ্মা। কিছুক্ষণের মধ্যেই শ্রীমতীকে সাজিয়ে দিল যথোচিত সাজে। ভদ্রা সব সখীদের সম্বোধন করে বলল—সখি, শ্রীমতীর সঙ্গে যাবার জন্যে তোমরাও সেজে নাও যথাযোগ্য সাজে।

বাধা দিল শ্রীমতী। বলল—না ভদ্রা, না, বড়িমা বলেছিলেন একাই যেতে হয় সুন্দরের অভিসারে। নইলে তার দেখা মেলে না।

বিশাখা বলল—সখি, তুমি যে আমাদের প্রিয় হতে প্রিয়তর। প্রতিক্ষণ চোখে চোখে রেখেও তোমার জন্যে আমাদের কত আশংকা। এই দুর্গম পথে

অজানা অভিসারে কেমন করে তোমাকে একাকিনী যেতে দেব।

পদ্মা বলল—এই তিমির রজনীতে প্রথম অভিসারে তোমায় একা যেতে দিতে পারব না শ্রীমতী। যাত্রাপথের অপর প্রান্তে কোন্ অচেনা তোমার জন্যে অপেক্ষা করে আছে, সে তো এখনও তোমার অজানা। এ প্রান্তের সঙ্গে সমস্ত বন্ধন আগেই ছিন্ন করে দিও না শ্রীমতী। সকলকে সঙ্গে নাই যদি নাও, অন্তত ললিতা আর বিশাখা হোক্ তোমার অভিসার-সঙ্গিনী।

আগ্রহে অধীর শ্রীমতীর অন্তর। বিলম্ব আর তার সয় না। তাই সম্মত হল পদ্মার কথায়। সঙ্গে যেতে প্রস্তুত হল ললিতা আর বিশাখা। প্রথমেই নিভিয়ে দিল কক্ষদীপ, দ্বার খুললে দীপালোক যেন না দৃষ্টিগোচর হয় বাইরে থেকে। তারপর অতি সাবধানে নিঃশব্দে খুলে ফেলল প্রকোষ্ঠদ্বার। সুদীর্ঘ অলিন্দপথ বেয়ে এগিয়ে চলল তিনটি কম্পিত দেহ আর শঙ্কিত প্রাণ। সোপানশ্রেণী বেয়ে ঐশ্বর্য-মন্দির হতে অবতরণ করল তিনটি গুণ্ঠিত আনন। শূন্য প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়াল তিনটি উন্মুক্ত আত্মা।

কতদূরে কোনদিকে তুমি অভিসার-দুর্লভ হে আমার পরাণ-বল্লভ! তিনটি মৌন রোদন একীভূত হল একটি আকুলতায়।

বহুদূরের স্বনিত পবনে বয়ে এল বাঁশরীর ধ্বনি—এই আমি, এই আমি। আমি অতি কাছে, আমি অতি দূরে। জীবনে আমি, মরণে আমি। এগিয়ে চল শ্রীমতী, এগিয়ে চল আমার রাধা।

উৎফুল্ল কণ্ঠে শ্রীমতী বললে—আর আমাদের দিশাহারা হতে হবে না। ওই যে বেজেছে তার বাঁশী। ওই সুরই আমাদের পথের দিশারী হবে।

ললিতা মৃদুকণ্ঠে বললে—তবে আর ভয় নেই। চল সখি, ওই সুরের অনুসরণ করেই এগিয়ে চলি আমরা।

শ্রীমতী দ্রুত পায়ে এগিয়ে যাচ্ছিল। বিশাখা তাকে বাধা দিল। বলল—প্রাণসখি, যতক্ষণ পথ বন্ধুর, বিপদ-সংকুল, ততক্ষণ আগে যাব আমরা, তুমি থাকবে পেছনে। যখন পথ হবে অনায়াসগম্য—অভীষ্টকে যখন দেখা যাবে অদূরে, তখন আগে যেও তুমি, আমরা থাকব পেছনে। প্রিয় সখি, আপত্তি করো না। প্রকৃত বন্ধুর ধর্মই এই, বিপদে সে সম্মুখে থাকে—সম্পদে থাকে পেছনে।

বিশাল গভীর সুরে বেজে চলেছে বাঁশী। তার আকর্ষণে এগিয়ে চলেছে তিনটি অস্পষ্ট শরীরী ছায়া। প্রথমে ললিতা বিশাখা। তারপর শ্রীমতী।

যেন ত্রিবেণীর ধারা। এগিয়ে চলেছে মহাসমুদ্রের পানে।

যেতে যেতে ভাবছে শ্রীমতী। এই কি অভিসার। অজ্ঞাতের অভিমুখে জ্ঞানের প্রসার। চেতনার অভিমুখে চিত্তের প্রসার। আনন্দের অভিমুখে বেদনার প্রসার। রহস্যের অভিমুখে জিজ্ঞাসার প্রসার। হৃদয়ে দ্বিধা, তবু সংকল্প। দেহে শ্রমের ক্লান্তি, তবু চলবার প্রেরণা। নয়নে নিদ্রাবেশ, তবু জাগ্রত দৃষ্টি। এরই নাম কি অভিসার। এমন অপূর্ব অনুভূতি তো কখনো জাগেনি প্রাণে। নিরাশার সঙ্গে মেশানো অপরিসীম আশা। ভয়ের সঙ্গে মেশানো অনন্ত অভয়। উদ্বেগ চাঞ্চল্যের সঙ্গে জড়িত সুনিবিড় প্রশান্তি। এমন বেদনামাধুরী আছে অভিসারে! আছে এমন আনন্দ-অভিঘাত!

যেতে যেতে থমকে দাঁড়াল শ্রীমতী। রুদ্ধ হল গতিবেগ। অন্ধকারে পথ-পার্শ্বের কণ্টকগুল্মে জড়িয়ে গেছে শ্রীমতীর উত্তরীয়-অঞ্চল। কিছুতেই মুক্ত করা যাচ্ছে না। সখীরা তাকে ছাড়িয়ে না জানি কতদূরে এগিয়ে গেল। অন্ধকারে কিছুই বোঝার উপায় নেই। যতই ছাড়াবার চেষ্টা করছে শ্রীমতী ততই জড়িয়ে যাচ্ছে অঞ্চলপ্রান্ত। সংকেতে বিপদ জানাবার জন্যে কঙ্কণের ধ্বনি করল শ্রীমতী। বাজাল পায়ের নূপুর। প্রত্যুত্তরে শোনা গেল সখীদের কঙ্কণ-ধ্বনি। একটু পরেই কাছে এসে দাঁড়াল তারা।

: এত পিছিয়ে পড়লে কেন শ্রীমতী? কুসুমকোমল চরণ দুটি আর বুঝি চলছে না? আমরা তো আগেই নিষেধ করেছিলাম, যেও না অভিসারের দুর্গম পথে।

: তা নয়, সখি। মৃদুকণ্ঠে বলল শ্রীমতী—আমার উত্তরীয় জড়িয়ে গেছে কণ্টক-গুল্মে, কিছুতেই মুক্ত করা যাচ্ছে না।

ললিতা বলল—তবে সখি, ত্যাগ করে এস তোমার উত্তরীয়। বহুর জন্যে অল্পকে তো ত্যাগ করতেই হবে।

একটু দ্বিধা করল শ্রীমতী। কিন্তু বাঁশী যে বেজে চলেছে আকুল আহ্বানে। কি কঠিন তার আকর্ষণ। না এগিয়ে তো উপায় নেই। তাই উত্তরীয় ফেলে রেখেই অন্ধের মত চলতে লাগল শ্রীমতী। সম্মুখে কি পশ্চাতে, দক্ষিণে কি বামে—জানে না সে। পথে কি বিপথে তাও জানে না।

খানিক গিয়েই পা বেধে গেল শ্রীমতীর। নূপুর জড়িয়ে গেছে

লতাজালে। ত্বরিত হাতে খুলে ফেলল পায়ের নূপুর। নূপুর ফেলেই দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলল বাঁশীর সুরের উৎস পানে।

বাঁশীর স্বর স্পষ্টতর হয়ে উঠছে। নিবিড়তর হয়ে উঠছে তার আকর্ষণ। আর শ্রীমতীর গতিও দ্রুত থেকে দ্রুততর হয়ে উঠছে।

আরো কাছে—আরো কাছে বাজছে বাঁশী। তীব্রতর হল শ্রীমতীর হৃদ্‌স্পন্দন। দিশাহারা হয়ে অন্ধকারে ছুটে চলল দুবাহু বাড়িয়ে।

দ্রুত গমনে হাতের কংকণ রিনিঝিনি কিনিকিনি বাজছে। মাঝে মাঝে ঢেকে ফেলছে বাঁশীর স্বর। নীলমণিহার আন্দোলিত হয়ে বক্ষে এসে আঘাত করছে। শ্রীমতী হাত থেকে খুলে ফেলে দিল কংকন। গলার হার খুলে ফেলে দিল পথে।

আর কতদূর! পথ আর কত বাকি! কোথায় কোন্‌দিকে রয়েছে সখীরা। শ্রীমতী তাদের আর সাড়া পেল না।

বাঁশী বেজে উঠল আরও কাছে। মধুর স্বরে বলল—এস শ্রীমতী, এস আমার রাধা। আভরণহীন হয়ে এস, এস সাথীহীন হয়ে। মোহহীন হয়ে এস, এস ভয়হীন হয়ে। তুমি যত দ্রুতগতিতে আমার পানে এগিয়ে আসবে, আমি তোমার পানে এগিয়ে যাব তার চেয়েও অনেক দ্রুততর বেগে।

বংশীধ্বনিতে মনপ্রাণ কেন্দ্রীভূত করে কণ্টকবিক্ষত পদে ছুটে চলল শ্রীমতী। বেশী দূরে যাওয়া হল না। কিছু পথ এগিয়েই গভীর পংকে নিপতিত হলো নব অভিসারিণী শ্রীমতী।

ঃ হায়! পংকে বিভূষিত হল আমার পদযুগল। পংকের স্পর্শ লাগল আমার বসনে ভূষণে। এ বেশে কেমন করে কার কাছে যাব? তবে কি ফিরে যাব? ফিরে যাব অসমাপ্ত অভিসার হতে?

না, সংকোচ কিসের। কিসেরই বা লজ্জা। অন্ধকারের অন্তরালে দাঁড়িয়ে আমি একবার শুধু দেখে নেব, কে এই মোহনবাঁশিরিয়া। সে তো আমায় দেখতে পাবে না। তবে আর কুণ্ঠা কেন?

পংকবিভূষিত কণ্টকজর্জর পদেই ধেয়ে চলল শ্রীমতী। গুণ্ঠনহীন তার আনন, ভূষণহীন দেহ, এলায়িত কুন্তল বিস্রস্ত। স্বেদবিন্দু জেগেছে ললাটে, পথশ্রমে বক্ষ দ্রুতবেগে স্পন্দিত। নিঃশ্বাস ঘনতর।

সমুখের নিবিড় অন্ধকারে যেন অস্পষ্ট আলোর আভাস। শীতল পবনে

যেন কদম্বকুসুমের ঘ্রাণ ভেসে আসছে। সুরের কম্পন যেন তরঙ্গের মত এসে স্পর্শ করছে শ্রীমতীকে।

ঃএস এস শ্রীমতী। সমস্ত পঙ্ক থেকে মুক্ত করে তোমায় আমি পঙ্কজিনীরূপে ফুটিয়ে তুলব। তোমার আর আমার সমস্ত আরাধনাকে সঞ্চিত একীভূত করে গড়ে তুলব শ্রীরাধার ভাবপ্রতিমা।

আমি অভিসারযাত্রার শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেছি। ভাবল শ্রীমতী। এসে গেছি আমার অভিষ্টের একেবারে মুখোমুখি।

চোখ তুলে সামনের দিকে তাকাল শ্রীমতী। আর, একবার তাকিয়ে অনিমেষ লোচনে তাকিয়ে রইল। অদূরে নীপতরুতলে এক আশ্চর্য নীলাভ দ্যুতি। জ্যোতিরশ্মি তার শত ধারায় বিচ্ছুরিত। সে ভেসে আসছে—ছুটে আসছে মহাসমুদ্রের মত। এগিয়ে আসছে ত্রিভুবন প্লাবিত করতে। দেখতে দেখতে সেই জ্যোতিচ্ছটা এসে শ্রীমতীকে স্পর্শ করল। তাকে বেষ্টিত করল, আচ্ছন্ন করল। সেই আলোকস্পর্শে দৃষ্টি ধাঁধিয়ে গেল শ্রীমতীর—লুপ্ত হয়ে গেল সকল অনুভূতি। চেতনা হারিয়ে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

কিন্তু গভীর নিদ্রার অতলে নিমজ্জিত হবার আগে শ্রীমতীর মনে হল তার পতনশীল দেহ যেন মৃত্তিকাস্পর্শ করল না। তার আগে একটি কোমল করুণা যেন দুটি বাহু হয়ে তাকে বেষ্টন করে নিল। অনন্ত প্রেম যেন একটি বিস্তৃত বক্ষ হয়ে তাকে দিল আশ্রয়। এক অনাস্বাদিত আনন্দ যেন অমৃতঅধর হয়ে স্পর্শ করল তার অশ্রুসিক্ত আঁখি-পল্লব।

এতদিনের সমস্ত সংশয়ডোর খসে গেল শ্রীমতীর। সে আজ মর্মে মর্মে অনুভব করল—প্রতি অঙ্গে অঙ্গে প্রতি অণু পরমাণুতে সে রাধা।

'স্মরন্ত স্মারয়ন্তশ্চ মিথোঽঘৌঘহরং হরিম্‌।
ভক্ত্যা সংজায়তা ভক্ত্যা বিভ্রত্যুৎপুলকাং তনুম্‌ ।।'

—শ্রীমদ্‌ভাগবত ।। ১১।৩।৩১

নয়

আপনি স্মরণ করে পরস্পর করায়ে স্মরণ।
সর্বপাপ-অপহারী শ্রীহরির লীলা-বিবরণ ।।
সাধনের ভক্তি হতে হবে প্রেমভক্তির উদয়।
অপার আনন্দে তার পুলক-প্রকাশ দেহময় ।।

ধীরে ধীরে চেতনা ফিরে এল শ্রীমতী রাধার। শয়ন-প্রকোষ্ঠের বাতায়ন-পথে প্রভাতের আলো প্রবেশ করেছে, কিন্তু শিয়রের মণিদীপ জ্বলছে তখনো—যেন অনুরাগের অনির্বাণ শিখা। পরিচিত শয্যায় শুয়ে আছে শ্রীমতী রাধা আর তাকে ঘিরে রয়েছে সখীরা সকলে। কেউ কেউ দাঁড়িয়ে—কেউ বা বসে। বক্ষে তাদের আশঙ্কা। মুখে দুশ্চিন্তার চিহ্ন। নয়নে উদ্বেগ।

শ্রীমতী রাধার ললাটে চন্দনবারি সেচন করে চামর ব্যজন করছে চিত্রা—যেন দেবমন্দিরের প্রভাত আরতি। ব্যাকুল হৃদয়ে ললিতা ও বিশাখা তার অচেতন মুখের উপর ঝুঁকে পড়েছে।

এমনি সময়ে চোখ খুলল শ্রীমতী রাধা। চারিদিকে একবার তাকিয়ে—সখীদের দিকে তাকিয়ে অতি মৃদু একটি নিঃশ্বাস ফেলল। এ আমি কোথায়? ভাবল শ্রীমতী রাধা। কোথায় সেই নীপতরু? কোথায় সেই আলোকিত রূপ—সেই মধুময় স্পর্শ? হায়! কেন এরা আমায় এই

পরিচিত প্রাত্যহিক জীবনে ফিরিয়ে নিয়ে এল। এই পুরাতন জীবনকে আর কি আমি গ্রহণ করতে পারব? জীবনের যে জীবন, তাকে যে আমি চিনেছি। প্রাণহীন নীরস কর্তব্যভার আর কি আমি পারব বহন করতে? মধুর চেয়ে মধুরতর যে পরম মধুময়, তার অমিয় স্পর্শ যে পেয়েছি আমি।

সেই আনন্দ-অনুভূতির কথা স্মরণ করে আবেগ স্পন্দনে কম্পিত হতে লাগল শ্রীমতী রাধার তনুলতা। অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল দুচোখ বেয়ে। হায়! সেই চির-আকাঙ্ক্ষিত মিলন-লগ্ন যদি এল এ জীবনে, তবে আবার কেন এ বিচ্ছেদ! আমার প্রাণের আকাশ ছিল সংশয়ের ঘন মেঘে ঢাকা। সেই মিথ্যা শূন্যতার বুকে সত্যের বিদ্যুৎ-দীপ্তি একবার মাত্র দেখা দিয়ে কোথায় মিলিয়ে গেল। আমাকে একবার গ্রহণ করে আবার কেন সে ত্যাগ করে গেল এ জঞ্জালস্তূপের মাঝে—উদাসীনকণ্ঠ যেমন অনায়াসে বিপথে ফেলে যায় মালতীমালা।

শয্যার উপরে উঠে বসতে গেল শ্রীমতী রাধা। সখীরা বাধা দিল। পদ্মা বলল—তোমাকে চোখ মেলে তাকাতে দেখে আমাদের দেহে প্রাণ ফিরে এল সখী। এতক্ষণ আমরা আশঙ্কায় মৃতপ্রায় ছিলাম। ইন্দুলেখাকে পাঠানো হয়েছে বড়িমাকে গোপনে ডেকে আনবার জন্যে। তারাও এল বলে। এখন একটু সুস্থ বোধ করছ তো শ্রীমতী?

কোন কথা না বলে অশ্রুসজল নয়নে চারপাশে তাকাতে লাগল শ্রীমতী। আনন্দনিকেতন এই বিলাসগৃহ তার কাছে আজ কারাগার বলে মনে হচ্ছে কেন? এই কুসুমকোমল শয্যার চেয়ে গত রজনীর সেই কণ্টকাকীর্ণ পঙ্কিল বনভূমি তার কাছে প্রিয়তর—বাঞ্ছিততর মনে হচ্ছে কেন? সখীদের সঙ্গে রহস্যালাপেও কেন তার রসনা আজ কুণ্ঠিত? সখীদের প্রশ্নের উত্তর দিতেও যেন চায় না তার অন্তর, শুধু চায় কি এক ধ্যানে নিমগ্ন হয়ে থাকতে।

বিচলিত কণ্ঠে ললিতা বলল—সখি শ্রীমতী, এমন অপরিচিতের মত চারদিকে তাকিয়ে কি দেখছ? তোমার কক্ষ, তোমার শয্যা, তোমার প্রিয় সখীদের তুমি চিনতে পারছ না! গত রজনীর অভিসারযাত্রার কথা কি তোমার স্মরণ নেই?

বিশাখা বলল—কাল গভীর অন্ধকারে বনপথে চলতে চলতে হঠাৎ তোমাকে আমরা হারিয়ে ফেললাম। অনেক খুঁজেও সন্ধান পেলাম না, অনেক ডেকেও

সাড়া মিলল না। সমস্ত রাত খুঁজে খুঁজে অবশেষে যমুনাতীরে এসে ঊষার অস্পষ্ট আলোকে দেখলাম নীপতরুতলে লুটিয়ে আছে তোমার অচেতন দেহ।

দুটি নয়নের অশ্রুসরোবরে ডুবে গেল শ্রীমতী রাধিকার দৃষ্টিতারা। খিন্ন কম্পিতস্বরে সে বলল—হায় সখি, কেন কুড়িয়ে নিয়ে এলে আমায়। কেন তুলে নিয়ে এলে তার পদতল থেকে।

বিস্মিত ললিতা বলল—সখি, আমরা তো আশেপাশে আর জনপ্রাণীকেও দেখতে পাইনি, শুধু তোমার পাশে পড়েছিল তোমার সেই বক্ষমণি। জানিনে সখি, তুমি কি দেখেছ—কাকে দেখেছ—পেয়েছ এমন কোন স্পর্শমণি, যা একরাতে তোমার এমন পরিবর্তন ঘটিয়েছে।

মায়া শ্রীমতীর দিকে বিস্মিত দৃষ্টি মেলে ধরে মনে মনে বলল—আমরা ভেবে পাচ্ছিনে কেমন করে ঘটল তোমার সমস্ত সত্তার এমন রূপান্তর। কোথায় রাজনন্দিনী শ্রীমতীর সেই সগর্ব বঙ্কিম ভ্রূভঙ্গিমা—এ যে পূজারিণীর সজল আনতদৃষ্টি। কোথায় সেই স্মিতহাস্য-স্ফুরিত অধর-প্রান্ত—তোমার ওষ্ঠে যে আজ আত্মনিবেদনের কোমল করুণা। দেহবল্লরী তোমার বিদ্যুৎ-দীপ্তিহীন—শুধু বার বার কম্পিত রোমাঞ্চিত হচ্ছে। এ কিসের লক্ষণ?

প্রকাশ্যে বলল—বল শ্রীমতী, কি দেখেছ তুমি অভিসার পথের শেষে!

উঠে বসল শ্রীমতী অধীর আবেগে। কিছু বলবার চেষ্টা করল। কম্পিত হল ওষ্ঠাধর। কিন্তু ভাষা ফুটল না কণ্ঠে, কপোল ভেসে গেল উচ্ছ্বসিত অশ্রু-প্লাবনে। তারপর যেন কি এক স্মৃতির ধ্যানে স্থির হয়ে গেল আঁখি-পল্লব। স্পন্দনহীন হল বক্ষ।

সখীরা বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে রইল তার দিকে। মনে হল শ্রীমতী তাদের মাঝখানে থেকেও তাদের থেকে অনেক অনেক দূরে। এক মহা ভাব-সমুদ্রের পরপারে।

কতক্ষণ কেটে গেছে জানে না শ্রীমতী রাধা। তার মন যেন চলে গিয়েছিল দেহসীমা ছেড়ে সুদূর নভসীমায়। ডানা মেলে পার হয়ে গিয়েছিল মেঘলোক একক বিহঙ্গের মত। দীর্ঘযাত্রা সাঙ্গ করে যেন ফিরে এল দেহনীড়ে।

পরিচিত এক কণ্ঠ শুনে সহসা আত্মস্থ হল শ্রীমতী রাধা। সামনে তাকিয়ে দেখতে পেল বড়িমাকে। কখন তিনি এসেছেন, কতক্ষণ বসে আছেন,

কি বলছেন, কিছুই জানতে পারে নি সে। এ কোন্ জাগ্রত নিদ্রা। এ তার কী হল।

সস্নেহে শ্রীমতীর একখানি হাত নিজের দুটি হাতের মধ্যে তুলে নিয়ে বড়িমা বললেন—পুত্রী, তোমার নীরবতা সখীদের বিচলিত করেছে, তুমি কথা বল। বল, কাল অভিসারে গিয়ে কি দেখেছ—কাকে দেখেছ তুমি। বল ঘুচেছে কিনা তোমার মনের সংশয়—মিটেছে কিনা প্রাণের জিজ্ঞাসা।

এতক্ষণ পরে কম্পিত মৃদুকণ্ঠে শ্রীমতী বলল—আমি দেখেছি—চিনেছি তাকে। ঘুচে গেছে আমার সকল সংশয়।

ঃ তবে বল পুত্রী, সে কে—কেমন দেখলে তাকে।

কয়েক মুহূর্ত নীরব রইল শ্রীমতী রাধা। নয়ন মুদ্রিত করে একবার অবগাহন করল সেই পবিত্র স্মৃতির আনন্দসাগরে। ব্যাকুল কণ্ঠে বলল—বড়িমা, কেমন করে সে-কথা তোমায় বলব। একটি স্নিগ্ধ উজ্জ্বল আলোক-প্রবাহ আমার দুটি ক্ষুদ্র নয়নকে স্পর্শ করে পূর্ণ করে প্লাবিত করে চারদিকে ছাপিয়ে পড়ল। আর কিছুই দেখতে পেলাম না আমি। তবু মনে হয় যেন কিছু না দেখেও আমার সব দেখা হয়ে গেছে। কিছু না পেয়েও যেন হয়ে গেছে সব পাওয়া। কিছু না জেনে না বুঝেও যেন কেমন করে মিটে গেছে আমার সব সন্দেহ—সব জিজ্ঞাসা।

বলতে বলতে বেধে গেল শ্রীমতীর কণ্ঠ। নয়নের প্রবল অশ্রুবন্যায় অবরুদ্ধ হল মৃদুস্বর। শ্রীমতী যার আভাসমাত্র পেয়েছে সে যেন ভাষার অতীত, যার ক্ষণিক প্রকাশমাত্র দেখেছে, সে যেন প্রকাশের অতীত। যে অচেনার রূপ দেখা দিয়েছিল যমুনাজলে—শোনা গিয়েছিল যে রাখালের মোহনবাঁশী—যে অজানার নাম স্পর্শ করেছিল শ্রীমতীর অন্তর আর যার দূত এসেছিল অনুরাগের অর্ঘ্য বহন করে, শ্রীমতীর জীবনে তারা ছিল সংশয়ে বিভক্ত—দ্বিধায় দীর্ণ—জিজ্ঞাসায় বিচ্ছিন্ন। আজ শ্রীরাধার জীবনে তারা সব মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল—হয়ে গেল একক, অদ্বিতীয়, দ্বৈতরহিত। পরম অমৃতরূপে কেন্দ্রীভূত হল খণ্ডিত বিক্ষিপ্ত শত শত দুঃখ বেদনা। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তুচ্ছ প্রার্থনারাশি আজ সম্মিলিত হল এক মহা প্রার্থনায়।

সজল হয়ে এল বড়িমারও দুটি আঁখি। গভীর কণ্ঠে তিনি বললেন—বুঝেছি, যা অনির্বচনীয় তাকে তুমি প্রকাশ করবে কেমন করে? যে অনুভব-স্বরূপ তাকে তুমি কেমন করে বোঝাবে? শ্রীমতী, তুমি ধন্য হয়েছ আর

ধন্য করেছ আমাদের।

: কিন্তু বড়িমা, মিলনের সাথে সাথেই হারানো, পূর্ণতার সাথে সাথেই শূন্যতা—এর বেদনা আমি কেমন করে সইব। আমার অন্তর যে প্রতিমুহূর্তে তাকেই ফিরে পেতে চাইছে। কিন্তু হায়! আমি যে প্রত্যাখ্যান করে ফিরিয়ে দিয়েছিলাম তাকে।

দুহাতে মুখ ঢেকে আকুল হয়ে কাঁদতে লাগল শ্রীমতী রাধা। সান্ত্বনা দিতে গিয়ে কাঁদতে লাগল ললিতা, বিশাখা। কী এক আকুল আলোড়নে মথিত হতে লাগল চিত্রা, রূপমঞ্জরী, চম্পকলতিকা আর অন্য সখীদেরও অন্তর। মনে হল এক বেদনার অনুভূতি এসে যেন স্পর্শ করতে চাইছে তাদের মর্মলোক। এক আনন্দের প্লাবন এসে যেন ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে দেহ মন প্রাণ। শ্রীমতীর মাথায় হাত রেখে স্থির নেত্রে বসে আছেন বড়িমা। যেন এক ধ্যানমগ্না যোগিনীর প্রস্তরপ্রতিমা।

: শুধু একবার—আর একবার তাকে ফিরিয়ে আনো। আমার সব কিছুর বিনিময়ে ফিরিয়ে নিয়ে এস তাকে। বড়িমার হাত দুটি জড়িয়ে ধরল শ্রীমতী রাধা—ধরতে গেল তার পদযুগল।

: স্থির হও শ্রীমতী, শান্ত হও। তার দেখা তুমি পাবে। নিশ্চয়ই সে আসবে তোমার জীবনে। তোমার এ অশ্রুধারা কখনো ব্যর্থ হতে পারে না—প্রাণের এ আকুলতা যেতে পারে না শূন্যে মিলিয়ে। তোমার এ বেদনার আহ্বানে সাড়া মিলবেই, পুত্রী।

শ্রীমতীর দুটি হতাশা মলিন আঁখিতারা আশার আলোকে আকাশের তারা হয়ে ফুটে উঠল। ভদ্রার হাত ধরে কাতর কণ্ঠে সে বলল—তবে যা সখী, একবার তোরা তার কাছে যা। গিয়ে মিনতি করে বলু, শ্রীমতী তোমার চরণে কৃপাভিখারিণী। তাকে মার্জনা করে নাও—করে নাও আবর্জনা-মুক্ত, কিন্তু বর্জন কোরো না। আরো বেদনা, আরো আঘাত যদি দিতে চাও, তাও দাও, তবু উপেক্ষা কোরো না তাকে। হে সুন্দর, হে দয়িত, আর দূরে থেকো না। নয়নপথগোচর হও—হও শ্রীমতীর জীবনপথগামী।

ভদ্রা বলল—আশ্বস্ত হও শ্রীমতী, ধৈর্য ধারণ কর। তোমাকে বিচলিত দেখে সখীরাও সকলে বিচলিত। ললিতা আর বিশাখাকে দূতী করে এখুনি ছদ্মবেশে তার কাছে পাঠাচ্ছি। কিন্তু তার আগে আমার একটি অনুরোধ রাখ। এমন উদাসিনীবেশে তুমি আর থেকো না। ওঠ, বেশবাসের

সংস্কার কর। কাল রাতে বনপথে তুমি হারিয়ে এসেছ তোমার সমস্ত আভরণ—দেহ তোমার শূন্য। চিত্রা আর মায়া নিয়ে আসুক নূতন অলংকার, নূতন বসন।

শ্রীমতী রাধা বলল—ভদ্রা, সাজসজ্জায় আভরণে আর আমার মন লাগছে না। যতদিন তাকে আবার না দেখব ততদিন বাঁধব না এ এলায়িত কেশ। পরব না সূক্ষ্ম দুকূল বসন, ময়ূরকণ্ঠী, মেঘাম্বর, নীলাম্বরী। যে অলংকার আমি একে একে ত্যাগ করে এসেছি অভিসারপথে, আর দেহে তুলব না সে অলংকার।

বড়িমা বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে দেখছেন শ্রীমতীকে আর ভাবছেন মনে মনে—সত্য বলেছ তুমি শ্রীমতী। কি লাভ সুন্দর হয়ে যদি না পাওয়া যায় সেই চিরসুন্দরকে। কি সার্থকতা আভরণআবরণের যদি না বরণ করে নেয় সেই জগৎবরেণ্য। কিসের এ আকুলতা—এ ত্যাগ—এ আত্মনিবেদন।

এরই নাম কি অনুরাগ? এই কি তবে প্রেম? সেকি এমনি করে পাগলিনী করে--করে এমনি আত্মহারা। যে স্বর্গীয় সুধার একবিন্দু পাবার জন্যে আমি সুকঠিন যোগিনীজীবন যাপন করছি, রাজনন্দিনী শ্রীমতী কেমন করে অবগাহন করল সেই সুধাসমুদ্রে। অথবা শ্রীমতী বুঝি আর শ্রীমতী নেই। তার দেহে আমি সাত্ত্বিক লক্ষণসমূহ দেখতে পাচ্ছি। এ যে যোগিজনদুর্লভ। তবে কি কোটিকল্প তপস্যায় যে বস্তু লাভ করা যায় না, তাই অধিগম্য একান্ত প্রেমের।

এমনি সময়ে শ্রীমতী রাধার কাছে এসে দাঁড়াল দুটি কিশোরী মালিনী। হাতে তাদের পুষ্পসম্ভার, দেহে পুষ্পসজ্জা। ভাল করে লক্ষ্য করতেই বড়িমা চিনতে পারলেন ললিতা আর বিশাখাকে। তারা মালিনীর ছদ্মবেশে সেজে এসেছে।

ললিতা বলল—সখি শ্রীমতী, আমরা এখনি যাচ্ছি দূতী হয়ে তোমার প্রিয়তমের সন্ধানে। বল, কি উপহার পাঠাতে চাও তুমি তার কাছে?

সজল চোখে তাকিয়ে শ্রীমতী বলল—সখি, আমার হৃদয়ের আকুলতাকে একটি কুসুম-স্তবকে সাজিয়ে নিয়ে যেতে পারবি তার কাছে? আমার নয়নের অশ্রুবিন্দু দিয়ে মালা গেঁথে কি পরাতে পারবি তার গলায়? আমার দীর্ঘ নিঃশ্বাসকে চামর করে কি ব্যজন করতে পারবি তার সর্বাঙ্গে?

নির্বাক হয়ে রইল সখীগণ।

কোমলকণ্ঠে ধীরে ধীরে বড়িমা বললেন—ওগো শ্রীমতী, তা কেমন করে হবে। তোমার আকুলতা যে বাঁধন মানে না—তাকে কেমন করে বাঁধা যাবে স্তবকের বন্ধনে? তোমার অশ্রুবিন্দু যে ছেদহীন, তা দিয়ে মালা গাঁথা যাবে কেমন করে। আর তোমার দীর্ঘ নিঃশ্বাস যে উত্তপ্ত, সে নিঃশ্বাসের চামর ব্যজনে তো শীতল হবে না তার দেহ।

ঃ আর আমার দেবার কি আছে। তবে সখি, আমাকেই নিয়ে যা—ফেলে রেখে আয় তার চরণে এই অনাদৃত উপহার। হাহাকার করতে লাগল শ্রীমতীর অন্তর।

ঃ পুত্রী, নিজেকে তো তুমি আগেই দিয়ে ফেলেছ। একই উপহার দেওয়া চলে কি বার বার। তার চেয়ে এক কাজ কর। তোমার এই অসহ্য বেদনাই উপহার দাও তাকে, উৎসর্গ কর তার চরণে। আর তো তোমার কিছুই নেই।

ভদ্রা বলল—তবে যাও ললিতা বিশাখা, আমাদের প্রিয় সখির অন্তরের অপরিসীম বেদনারাশি বহন করেই নিয়ে যাও তার কাছে। দেখি তার গ্রহণ করার শক্তি আছে কি না।

'পততি পতত্রে বিচলিত পত্রে শঙ্কিত ভবদুপযানম্।
রচয়তি শয়নং সচকিত নয়নং পশ্যতি তব পন্থানম্ ।।'

গীতগোবিন্দ।

দশ

বিহগ পাখায় লেগে পত্রের ধ্বনি জাগে মনে ভাবে তুমি বুঝি এলে।
শয়ন রচনা করে চেয়ে থাকে পথ পরে চকিত নয়ন দুটি মেলে ।।

সে আসবে—সে আসবে। আকাশে বাতাসে স্থলে জলে যেন এই একটি বাণীই ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। অনুরণিত হচ্ছে শ্রীমতী রাধার প্রাণে—প্রতি চিন্তায়, প্রতি কাজে, প্রতিটি নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে। সে আসবে—সে আসবে। দূতীর মুখে সংবাদ এসেছে, সে আসবে আজ গভীর রজনীর অভিসারে—আসবে শ্রীমতীর সংকেত-গৃহে। স্বস্তি নেই শ্রীমতীর মনে—নেই বিরাম। কেমন করে সাজাবে আজ গৃহ, কোথায় বসাবে তার হৃদয়ের ধনকে। কোন্ সজ্জায় ভূষিত করবে নিজেকে—কোন্ প্রিয়বাক্যে তুষ্ট করবে প্রিয়বরকে।

এ এক আশ্চর্য প্রতীক্ষা। ধৈর্য আর তিতিক্ষা নিয়ে প্রতিক্ষণ পথ চেয়ে থাকা। দিন শেষ হয়ে সন্ধ্যা ঘনাতে অনেক বাকি। আরো বাকি রাত্রি গভীর হতে। তবু মন মানে না শ্রীমতীর। যদি সে এসে পড়ে অসময়ে—অতর্কিতভাবে। যদি ফিরে যায় সাড়া না পেয়ে—পথ খুঁজে না পেয়ে।

এক একবার সন্দেহ জাগে মনে—সত্যিই কি সে আসবে। আসবে

আমার ভবন সীমানায়—আসবে আমার আঙ্গিনায়—আসবে আমার অন্তঃপুর-দ্বারে। সন্দেহের সাথে সাথে জাগে শংকা। শংকার সাথে সাথে ঘনতর হয় হৃদ্‌স্পন্দন—বক্ষ হয় কম্পিত। বেদনায় মথিত হয় অন্তর।

কিন্তু দক্ষিণের সমীরণ মর্মরধ্বনি তুলে বলে—সে আসবে। অঙ্গনের সোপানপার্শ্বে রোপিত মধুমালতীর সুরভি এসে বলে—সে আসবে। বাতায়ন-পাশে মাধবীকুঞ্জে কোন পাখী গান গেয়ে ওঠে। যেন বলে—সে আসবে। সেই আশা বুকে নিয়ে শ্রীমতী রাধা কতবার করে কত ছন্দে গৃহ সাজায়। মনোমত না হলে আবার নূতন করে সাজায়। কুসুমে পল্লবে রচনা করতে চায় শুভতোরণ, মঙ্গলকলস স্থাপন করতে চায় দ্বারে দ্বারে। সখীরা বাধা দিয়ে বলে—শ্রীমতী তুমি কি ভুলে গেলে, সে আসবে গোপন অভিসারে। তাকে যে বরণ করে নিতে হবে গোপন অভিনন্দনে।

নিজেকে সাজাতে বসে শ্রীমতী। নয়নে কাজলরেখা আর ললাটে চন্দন-বিন্দু আঁকতে গিয়ে সহসা থেমে যায়। হায়, কি হবে এ বাইরের প্রসাধনে। সে যে অন্তরের সুগভীরে তাকাতে পারে—দেখতে পায় সজ্জাহীন মন প্রাণ। প্রকৃত সাধনা না হলে কি অন্তরের প্রসাধন। বিচিত্র ছাঁদে কবরী রচনা করতে গিয়ে প্রতিনিবৃত্ত হয় শ্রীমতী। কেশদাম যে তাকে মুক্ত রাখতে হবে—মুছিয়ে দিতে হবে তার শ্রান্ত মলিন পদযুগল। দুহাতে কংকণ পরতে গিয়ে শ্রীমতী থমকে যায়। রিক্ত হাতেই তো ভিক্ষা চাইতে হবে তার কাছে। অঞ্জলি শূন্য না হলে পূর্ণ হবে কি করে। কিছুই সাজা হয় না শ্রীমতীর—শুধু সে ভাবে আর কাঁদে। অশ্রুধারায় ভেসে যায় কাজল-কুমকুম-কস্তুরী-চন্দন।

সে এলে কোথায় কোন আসনে বসাবে তাকে, ভেবে পায় না রাজনন্দিনী। স্বর্ণপীঠিকার ওপরে কোমল পুরু গালিচার আসন বিছিয়েও মনে হয় ব্যথা লাগবে তার চারু অঙ্গে। সে আসন সরিয়ে রেখে অতি যত্নে আলপনা-লেখা আঁকতে বসে শ্রীমতী রাধা। তার উপরে বিবিধ বর্ণের রাশি রাশি কুসুম সাজিয়ে রচনা করে এক অপূর্ব আসন। মনে মনে বলে—এই আমার অন্তরকে বিছিয়ে দিলাম এখানে—এরই বুকে বসবে তুমি, হে আমার অন্তরতম।

চঞ্চল পবনে এক একবার ছড়িয়ে পড়ে কুসুমরাশি। ভেঙ্গে যায় পুষ্পাসন—মুছে যায় আলপনা-লেখা। আবার নূতন করে সাজাতে বসে।

বার বার বাইরে তাকায় শ্রীমতী। কাননের ছায়ার পানে তাকিয়ে সময় নিরূপণ করে। এত দীর্ঘ কেন দিনের এই প্রহরগুলি—এত মন্থর কেন তার গতি।

সহসা কি মনে হতেই ত্বরিতে উঠে দাঁড়াল শ্রীমতী রাধা। আবার গিয়ে প্রবেশ করল স্নানাগারে—আবার স্নান করল নির্মল জলে। পরিধান করল ক্ষৌম বসন। আলুলায়িত কুন্তল অবহেলাভরে সংবন্ধ করল একটি ফুলের মালা জড়িয়ে। তারপর রন্ধনশালার প্রাঙ্গণে গিয়ে হাতে তুলে নিল মন্থনদণ্ড। চারদিক থেকে দাসীরা ছুটে এল, ছুটে এল সখীরা। শ্রীমতীর কার্যভার নিজ হাতে তুলে নিতে চাইল। হাতের ইশারায় তাদের নিবৃত্ত করল শ্রীমতী। ঘুরে ফিরে পরীক্ষা করে সর্বোৎকৃষ্ট দধি-পাত্রটি নির্বাচিত করল। তারপর তাতে মন্থনদণ্ড স্থাপন করে দধিমন্থনে নিযুক্ত হল রাজনন্দিনী। কিছুক্ষণের মধ্যেই স্বেদবিন্দু জমে উঠল অনুপম ললাটে। শ্বাস-প্রশ্বাস ঘনতর হয়ে এল।

কিন্তু দেহ শ্রান্ত হলেও শ্রান্তি নেই মনে। শ্রীমতীর মনে হয় মন্থন চলছে তার অন্তরেও—বেদনার মন্থন—আকুলতার মন্থন। এ মন্থনে যে নবনী উঠবে, তা কি যোগ্য হবে প্রিয়তমের সেবার—পরিতৃপ্তির ছবি ফুটে উঠবে কি তার আয়ত নয়নে ?

মনে মনে এই চিন্তা করছে আর মুখে গুনগুন করে গান গাইছে শ্রীমতী—যে-গান শুনেছিল মন্দির প্রাঙ্গণে যোগীবেশধারী সুবলের কণ্ঠে। গান শেষ হলে প্রার্থনা জানাল শ্রীমতী—হে ভুবনমঙ্গল মুরলী-মনোহর, হে আনন্দকন্দ কৃষ্ণকিশোর, আমার সেবা যদি গ্রহণ কর তবেই গৃহীত হব আমি। হব অনুগৃহীত—হব ধন্য। স্বয়ংসিদ্ধা হয়েও কি আশ্চর্য সাধনা শ্রীমতীর। কায়া দিয়ে সে প্রস্তুত করছে যার সেবা-সামগ্রী, মন দিয়ে করছে তারই অনুধ্যান আর বাক্য দিয়ে তারই কীর্তন। কায়মনোবাক্যে কৃষ্ণময় শ্রীমতী।

কেশে জড়ানো মালাটি ছিঁড়ে গেছে—একটি দুটি করে তা থেকে খসে পড়ছে ফুল। কৃষ্ণনাম শুনে শ্রীমতীর কৃষ্ণময় কুন্তল বুঝি আনন্দাশ্রু বর্ষণ করছে।

নিজ হাতে ক্ষীর নবনী প্রস্তুত করতে করতেই বেলাটুকু সাঙ্গ হল। কাননে—ভবনে ঘনিয়ে এল গোধূলির ছায়া। সেদিকে তাকিয়ে শ্রীমতীর

মনে হল, গোধূলির আকাশে যে রঙ সেই রঙই তার হৃদয়াকাশে। ওই রঙেই সে রাঙাবে তার বসন।

অভিলাষ জেনে সখীরা তাকে সাজিয়ে দিল গোধূলি-রঙ্গীন বসনে। বৃন্দা বলল—কৃষ্ণদরশনে সখী আজ যোগিনীর বেশে সেজেছে।

ললিতা মুগ্ধ নয়নে তাকিয়ে বলল—যোগিনী তো নয়, যেন সর্বত্যাগিনী। অনুরাগের প্রমাণই এই—এই তার প্রকৃতি।

সখীদের নিয়ে সংকেতগৃহে প্রবেশ করল শ্রীমতী। সময় যত কাটতে লাগল ততই বেড়ে যেতে লাগল তার মনের উৎকণ্ঠা। পতঙ্গের বিচলনে বৃক্ষপত্র কম্পিত হলে সেই শব্দকে তার পদশব্দ বলে ভুল করতে লাগল শ্রীমতী। বহির্দ্বারে বাতাসের আঘাতকে তার করাঘাত মনে করে চমকে উঠতে লাগল।

কিন্তু কই, সে তো এল না—এখনো তো এল না। তবে কি সে আসবে না—ব্যর্থ হবে এই দীর্ঘ প্রতীক্ষা। ভেঙ্গেচুরে ধূলি হয়ে যাবে বালুকাবেলায় গড়া আশার প্রাসাদ।

কেনই বা সে আসবে, সেই প্রত্যাখ্যাত সুন্দর—সেই উপেক্ষিত সাধনা। যাকে ফিরিয়ে দিয়েছে বাহির-প্রাঙ্গণ থেকে, কেন সে আসবে অন্তর-মন্দিরে।

সহসা বেজে উঠল মোহনবাঁশী। শ্রীমতীর সকল হতাশাকে ছিন্নভিন্ন করে বয়ে এল তার আশার বাণী। সে আসবে। ওগো আরাধিকা—ওগো রাধা, রাত্রি গভীর হলেই সে আসবে। নিভিয়ে দিও তোমার ঘরের সব আলো, শুধু বাতায়নে জেবলে রেখো তোমার অনির্বাণ সংকেত-প্রদীপ। সেই আলোকের শিখা দেখে সে পথ চিনতে পারবে। নীরবতায় ডুবিয়ে দিও সব কোলাহল, শুধু করুণ মূর্ছনা জাগিও বীণার তারে তারে। সেই সুর শুনে সে পথ জানতে পারবে। দিবসের সব ফুল ঝরে গেলে ফোটে যেন তোমার রজনীগন্ধা, তারি সুরভি আঘ্রাণ করে সে পথ খুঁজে পাবে। খুলে রেখ তোমার সকল দ্বারের সকল অর্গল। কোন্ পথে সে আসবে কে জানে। নয়নে যেন না নামে নিদ্রার মোহ, তা হলে তো সে পাশে এসে বসলেও জানতে পারবে না শ্রীমতী।

সন্ধ্যার অন্ধকারে গোপনে গোপনে মেঘ জমল আকাশে, ডুবে গেল সব তারা। রাত্রি যত গভীর হতে লাগল ততই ঘনিয়ে এল দুর্যোগ। বাইরে বাতাসের মাতামাতি—যেন হতাশাভরা আকুল ক্রন্দন। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ

ঝলসে উঠছে আকাশের বক্ষ বিদীর্ণ করে—গুরু গুরু ডাকছে দেয়া। শ্রীমতী দুহাতে বক্ষ চেপে ধরল। সখীদের পানে তাকিয়ে কান্নার মত সুরে বলল—আর বুঝি তার আসা হল না, এই দুর্যোগে সে কেমন করে আসতে পারবে।

বাতায়নের সংকেত-প্রদীপ অঞ্চলে আড়াল করে দাঁড়িয়েছিল বিরজা। সে বলল—ভয় কি সখি। সে যদি তোমার অনুরাগী হয়, তবে এ দুর্যোগ পার হয়েই সে আসবে। বজ্র বিদ্যুৎ মাথায় নিয়েই সে অগ্রসর হবে তোমার সংকেত-আলোক লক্ষ্য করে। দুঃখের দুস্তর সাগরের মধ্য দিয়ে, বেদনার দুর্গম কান্তারের মধ্য দিয়েও সে পথ করে নেবে।

মেঘাবৃত আকাশের দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে বসে রইল শ্রীমতী রাধা। বসে রইল সমব্যথিনী সখীরা। প্রতীক্ষা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়ল। কম্পিত হতে লাগল সংকেত-প্রদীপের শ্রান্ত শিখা। বীণার তারে চম্পক-অঙ্গুলি শিথিল হয়ে এল। ম্লান হয়ে এল রজনীগন্ধার সুরভি।

সহসা অধীর আনন্দে কেঁপে উঠল শ্রীমতী রাধা। উৎফুল্ল কণ্ঠে বলল—সখি, সে আসছে। আমি দেখতে পাচ্ছি, নির্জন বনপথ ধরে অন্ধকারে সে এগিয়ে আসছে। এইবার সে এসে দাঁড়াল সেই নীপতরুতলে—সংকেত-আলোকের পানে একবার তাকিয়ে সে পথ ঠিক করে নিল।

ব্যস্ত শংকিত হয়ে উঠল ললিতা বিশাখা আর সব সখীরা—শ্রীমতী, তুমি কি উন্মাদিনী হলে? এ কি তোমার আশ্চর্য প্রলাপ।

ঃ সখি, এ প্রলাপ নয়। আমি সত্যই দেখতে পাচ্ছি তাকে। সবকিছু দেখতে পাচ্ছি অন্তরের মধ্যে তাকিয়ে। ওই যে সে এগিয়ে আসছে দুর্গম পথের প্রস্তর-কংকর পায়ে দলে—পায়ে দলে বনপথের গুল্ম-কণ্টক।

আহা, কত কণ্ট হচ্ছে তার। আমার জন্যে কত দুঃখ বরণ করছে সেই প্রাণ-বল্লভ। ঝিরি ঝিরি বৃষ্টিকণায় সিক্ত হচ্ছে তার দেহ—সিক্ত হচ্ছে মোহনবাঁশরী। না না সখি, ওকে ফিরে যেতে বল, কাজ নেই এত দুঃখ সয়ে। কাজ নেই আমাকে দেখা দিয়ে।

মৃদুকণ্ঠে ললিতা বলল—শ্রীমতী, দুঃখ তো তুমিও সয়েছিলে, যখন গিয়েছিলে তার অভিসারে। এ তারই বিনিময়। এমনি করেই তোমার প্রেমের ঋণ শোধ করছে সে।

: এইবার সে এসে দাঁড়িয়েছে আমাদের কাননপ্রান্তে। পুষ্পবীথি অতিক্রম করে—লতামণ্ডপ পার হয়ে এসে দাঁড়িয়েছে বাইরের আঙ্গিনায়। হায় হায়! এবার যে বৃষ্টি নামল গভীর ধারায়। আঙ্গিনায় দাঁড়িয়ে ভিজছে আমার হৃদয়বন্ধু। ভিজে যাচ্ছে মোহনচূড়া, তিলকরেখা, বনমালা। ভিজে যাচ্ছে সর্বাঙ্গ। হায়, হতভাগিনী আমি! কেন তাকে ডেকে পাঠালাম—কেন এত দুঃখ দিলাম সংকেত জানিয়ে। অনুতাপে আমার হৃদয় দগ্ধ হচ্ছে—বিদীর্ণ হচ্ছে বক্ষ।

অন্ধকারে বাতায়নপথে বার বার বাইরে তাকাল সখীরা—দেখতে চেষ্টা করল প্রাঙ্গণে তাকিয়ে। কিছুই দেখতে পেল না। বিশাখা বলল—সখি, আমরা তো তাকে দেখতে পাচ্ছি না—কিছুই দেখা যাচ্ছে না গভীর অন্ধকারে।

শ্রীমতী বলল—বিশাখা, অন্ধকার তাকে লুকাবে কেমন করে। বৃষ্টিপাতের শব্দ ছাপিয়ে শুনতে পাচ্ছিস না কি তার পায়ের নূপুর-ধ্বনি। সজল পবনে ভেসে-আসা যূথী-মালতীর গন্ধ ছাপিয়ে যে ভেসে আসছে তার দেহ-সুরভি। সখি, এইবার সে অতিক্রম করেছে সোপান-শ্রেণী—এসে দাঁড়িয়েছে গৃহের দ্বারপ্রান্তে। তবু কি তাকে তোরা দেখতে পাচ্ছিস নে সখি। ওই দেখ, সব দুয়ার আপনা হতে খুলে গেল—আপনি জ্বলে উঠল সব প্রদীপ। সব বীণা-বেণু আপনি বেজে উঠল অমৃত ঝংকারে।

এই যে সে এসে দাঁড়িয়েছে আমার সামনে—সেই ভুবনসুন্দর ত্রিলোক-মনোহর প্রেম-প্রতিচ্ছবি। গগন পবন আজ মধুময় হল—মধুময় হল আমার অন্তর বাহির। হে স্বামী, কৃতকৃতার্থ হলাম আমি। তোমার শ্রীমতী আজ মধুমতী হল।

'রাতি কৈনু দিবস, দিবস কৈনু রাতি।
বুঝিতে নারিনু বঁধু তোমার পিরীতি ॥
ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর।
পর কৈনু আপন, আপন কৈনু পর।'
—চণ্ডীদাস।

এগার

ঋতুচক্র আবর্তিত হল বারে বারে। এল গ্রীষ্মের পর বর্ষা, বর্ষার পর শরৎ হেমন্ত। তারপর এল শীত—এল বসন্ত।

কতবার সাজল শ্রীরাধা কত সাজে। কতবার যাত্রা করল অভিসারের দুর্গম পথে। প্রিয়তমের সন্নিধানে বহুবার পেঁছাল—পেল তাকে হৃদয়ের মাঝে।

তবু হৃদয় ভরল না।

শ্রাবণ-রজনীতে আকাশ ছেয়ে থাকে ঘন কালো মেঘে। বারি ঝরে অবিরাম। চপল বিদ্যুৎ-দীপ্তির অনুসরণ করে বজ্র। সন্ধান না পেয়ে ক্রোধে গর্জন করে ওঠে। উন্মত্ত দাদুরী কলরব করে। ডাহুকীর ডাক শোনা যায়।

এই দুর্যোগের মধ্যেই বেরিয়ে পড়তে চায় শ্রীরাধা, পাছে তার বিলম্ব হলে শ্যামলকিশোর অভিসার করে এই দুর্যোগে, কষ্ট পায় তার জন্যে। নিজে দুঃখ না পেয়ে প্রিয়তমকে দেবে পথের কষ্ট—এ চিন্তা অসহ্য শ্রীরাধার

কাছে। সে-ই গিয়ে পৌঁছাবে শ্যামের চরণতীর্থে, শ্যামকে টেনে আনবে না আপনার জীবন-ধূলিতে।

সখীরা বাধা দেয়। এই অবিশ্রাম বর্ষণ—তার উপর উতলা পবনের মাতামাতি। গৃহে গৃহে দ্বার রুদ্ধ, পথ আলোক-চিহ্নহীন। সখি, এর মধ্যে কেমন করে তুমি অভিসার করবে। তোমার এই নীল নিচোলে বাধা মানবে না বর্ষার বারি। শ্রীমতী, প্রেমের জন্য কি দেহকে উপেক্ষা করবে—বিপন্ন করবে কি প্রাণ ?

ললিতা বলে—আজ অভিসারে গিয়ে কাজ নেই সখি। কৃষ্ণের বাঁশী আজ বাজছে বহুদূর থেকে। সে আছে সুদূর মানস-গঙ্গার পারে। এত দূরের পথে কেমন করে যাবে শ্রীমতী।

কিন্তু রাধা কোন অনুনয় মানে না। বর্ষাভিসারে যেতে যেতে বর্ষা ঋতুর সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায় সে। তার কাছ থেকে পায় অনন্য প্রেমের শিক্ষা। বর্ষাঋতুর আকাশ যেমন নিরন্তর ছেয়ে থাকে ঘনকৃষ্ণ মেঘে তেমনি নিরন্তর কৃষ্ণরূপছবি জাগিয়ে রাখতে হবে তার অন্তরাকাশে। বৃষ্টিধারার অবিরল বর্ষণের মতই কৃষ্ণচিন্তাকে করতে হবে অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার মত। বারিপাতের ধ্বনি যেমন বিরামহীন, তেমনি বিরতিহীন কৃষ্ণগুণগানে মুখরিত করতে হবে জীবন। বর্ষার জলরাশি যেমন অবাধ গতিতে ছুটে চলে মহাসাগরের পানে, তেমনি অবারিত বেগে যেতে হবে শ্যামসুন্দরের অভিমুখে।

মনে মনে বর্ষাঋতুকে প্রণাম জানায় শ্রীরাধা—তুমি আমার প্রেমের গুরু।

আবার শারদাভিসারে যেতে যেতে তাকেও প্রণতি জানায়। তারই মত স্নিগ্ধতা আর শুভ্রতায় পূর্ণ করে নেয় দেহ মন। জীবনের সব প্রেম আর অনুভূতি সোনালী ফসলে ফলিয়ে নিবেদন করতে চায় প্রিয়তমের চরণে।

প্রণাম জানায় হেমন্তের মৌনতা আর বৈরাগ্যের শিক্ষাকে—শীতঋতুর ত্যাগ আর ধ্যানসাধনাকে—বসন্তের আনন্দ আর মাধুর্যকে। অভিসারপথে চলতে চলতে সব শিক্ষাকেই সে নিজের জীবনে শ্রদ্ধায় বরণ করে নেয়।

আসে প্রখর গ্রীষ্মঋতু। মাথার উপরে উত্তপ্ত তপন—পদতলে তপ্ত বালুকারাশি। যমুনাস্নানের ছলনা করে তারই মধ্যে বেরিয়ে পড়ে শ্রীরাধা।

খর মধ্যাহ্নের দারুণ অগ্নিবাণ উপেক্ষা করেও প্রিয়তমের কাছে চলে দিবা-অভিসারে। সখীদের বারণ মানে না—ভয় করে না গুরুজন-নিন্দার—লোক-কলংকের। গ্রীষ্মঋতুকেও প্রণাম জানায় শ্রীরাধা। তার কাছ থেকে শেখে বিরহের জ্বলন্ত তপস্যা—পঞ্চাগ্নিদহন।

এমনি করে চলে শ্রীরাধার প্রেমাভিসার। কত মিলন, কত আনন্দ, কত কৌতুক-ক্রীড়া। কত অভিমান, অনুতাপ, আক্ষেপ। কত উজ্জ্বল-রস-মাধুরী।

আর এক একটি অভিসারে এক একটি করে খুলে যায় শ্রীরাধার হৃদয়ের বন্ধন-অর্গল। একটু একটু করে ফুটে ওঠে জীবন-শতদল।

তবু বুঝে উঠতে পারে না শ্রীরাধা। কোথায় কি যেন এক রহস্যের সূক্ষ্ম যবনিকা। যেন তোলা যায় না তাকে। বিস্মিত চেতনা বার বার প্রশ্ন করে—হে প্রিয়তম, কি তোমার পরিচয়? কোথায় তোমার মাধুরীর শেষ? আমি যে তোমার অন্ত পেলাম না।

ধন্যেয়মদ্য ধরণী তৃণবীরুধস্তৎ
পাদস্পৃশো দ্রুমলতাঃ করজাভিমৃষ্টাঃ।
নদ্যোঽদ্রয়ঃ খগমৃগাঃ সদয়াবলোকৈঃ
গোপ্যোঽন্তরেণ ভুজয়োরপি যৎস্পৃহা শ্রীঃ ॥

—শ্রীমদ্‌ভাগবত ॥ ১০।১৫।৮॥

বার

ধন্য এ ধরণী আজ, পাদস্পর্শে ধন্য তৃণরাজি,
ধন্য হল তরুলতা তব করনখস্পর্শে আজি।
কৃপাদৃষ্টিপাতে ধন্য নদীগিরি পশুপাখী সনে,
গোপীগণ ধন্য তব শ্রীবাঞ্ছিত বাহুর বন্ধনে ॥

কুঞ্জকাননে বকুল-বেদিকায় বসে আছে শ্রীমতী রাধা। তাকিয়ে আছে দূর আকাশের দিগন্ত-নীলিমায়। দৃষ্টি গভীর—নয়ন পলকহীন। যেন একখানি ধ্যানের প্রতিমা। একটি আরাধনার প্রতিচ্ছবি। একখানি আনন্দঘন বেদনা।

দুটি হাত অঞ্জলিবদ্ধ। শিথিল আবেশে লুটিয়ে আছে কোলের উপর। যেন একটি সঙ্গীতের কোমল মূর্ছনা। এক আত্মহারা হৃদয়ের আত্মনিবেদন। এক স্বর্গীয় আলোকের অতীন্দ্রিয় অনুভব।

এলায়িত কুন্তল ছড়িয়ে আছে মুখের দুপাশে। রহস্যের মত নিবিড়। ছন্দের মত তরঙ্গিত। তমসার মত পরিব্যাপ্ত।

একটি একটি করে খসে পড়ছে ব্যাকুল বকুল। ঝরে পড়ছে শ্রীরাধার সর্বাঙ্গে—তার কেশে বেশে করপুটে। বুঝি খুঁজে বেড়াচ্ছে তার চরণ দুখানি।

নিঃশব্দে বসে দেখছে সখীরা শ্রীমতী রাধার এই অপরূপ রূপখানি।

যেন তপঃক্লিষ্টা দেবী পার্বতী। যেন অশোক-কাননে বন্দিনী রামৈকপ্রাণা মৈথিলী সীতা। যেন এক অলৌকিক আবির্ভাব। এক নিদ্রাহীন স্বপ্ন।

সখীদের একান্ত নিকট—একান্ত আপন শ্রীমতী রাধা। তার হৃদয় সখীদের হৃদয়ের সঙ্গে একই সুরে বাঁধা। একই ছন্দে দোলায়িত সুখ-দুঃখ ভাবনা-অনুভূতি। তবু সেই সখীদের কাছেও যেন দুর্জ্ঞেয় আজ শ্রীমতীর মন। প্রিয়তমের প্রেমে চরিতার্থ হয়েছে সে—হয়েছে আনন্দধন্য। আনন্দের আভাস তার নয়নতারায়—অধরপ্রান্তে। আনন্দের আভাস দেহের রোমাঞ্চে—বাণীহীন পুলকে।

এত যে আনন্দ, তবু যেন কি এক বিষাদের ছায়া তার মাঝে। এত যে দুর্লভ প্রাপ্তি, তবু যেন তাতে কি এক শংকার স্পর্শ। চন্দ্রের লাবণ্যে অস্ফুট কলংকরেখার মত। কুসুমের সুরভিতে সূক্ষ্ম কীটের মত।

বুঝে উঠতে পারছে না সখীরা—কেন এ ভাবান্তর। বৃন্দা এসে শ্রীমতীর পাশে বসে তার হাতে হাত রাখল। যেন আকুল মিনতি এসে স্পর্শ করল বিনীত প্রণতিকে। সেই কোমল স্পর্শের মত কণ্ঠস্বরেই বলল—সখি, আনন্দে আলোকে প্রেমে আজ পূর্ণ তুমি। একান্ত করে পেয়েছ তোমার জীবন-বল্লভকে। তবে কোন্ বিষাদে এক একবার উদাস হয়ে যায় তোমার দৃষ্টি? কোন্ শংকায় তোমার দেহ থেকে থেকে শিহরিত হয়ে ওঠে?

মুহূর্তকাল নীরব থেকে শ্রীমতী বলল—সখি, পাওয়া যে আমার অনেক বড়, তাই হারাবার ভয়ও আমার ততই বেশি। এত সৌভাগ্য আমার! যেন বিশ্বাস হতে চায় না। এই সামান্যা নারীর জন্য এত অনুরাগ তার হৃদয়ে! সখি, চাঁদ কি কখনো চকোরীর কাছে নেমে আসে—বৃষ্টি-ধারা কি খুঁজে বেড়ায় তৃষিতা চাতকীকে। তাই ভয় হয়, কোন মুহূর্তে হারাবো তাকে—হারাবো তার প্রেম।

বৃন্দা সান্ত্বনা জানিয়ে বলল—বৃথা আশংকায় বিষণ্ণ হোয়ো না সখি। তাকে হারাবে কি করে—সে যে তোমারি।

সজল নয়নে শ্রীমতী বলল—সে যদি আমারি হয় তবে তাকে পাই না কেন আমার করে। যখন সে দূরে থাকে তখন মিলনের স্মৃতি হৃদয়কে অধীর করে, আর যখন মিলন হয় তার সাথে, তখন আসন্ন বিচ্ছেদের কথা ভেবে কেঁদে মরি। তবে কি প্রেমে পরিতৃপ্তি নেই—নেই কি শান্তির মাধুর্য।

: আছে সখি, নিশ্চয়ই আছে, একদিন তুমি তারও সন্ধান পাবে।

আনমনে বেদীর উপরে ঝরা বকুল সাজিয়ে কৃষ্ণনাম লিখতে লাগল শ্রীমতী। মুখে বলল—আমি আপন করে তাকে আরো কাছে কাছে পেতে চাই—চাই একান্ত আপনার করে নিতে। সখি, তোরা বল্, সে শুধু আমারি, আর কারু নয়।

ঃ একথা বোলো না পুত্রী। বড়িমা সামনে এসে দাঁড়ালেন। কোন্ ফাঁকে তিনি কুঞ্জে প্রবেশ করেছেন কেউ লক্ষ্য করেনি। প্রণতা শ্রীমতী আর সখীদের আশীর্বাদ করে বললেন—তিনি যে তোমার হয়েও সকলের। শ্রীমতীর জীবনস্বামী হয়েও নিখিলের হৃদয়স্বামী।

চমকে উঠল শ্রীমতী।

ঃ বড়িমা, তবে কি কোনদিনই তাঁকে আমি পরিপূর্ণ রূপে পাব না ?

ঃ পূর্ণ রূপেই তো তাকে তুমি পেয়েছ শ্রীমতী, পেয়েছ একান্ত করেই। কে বুঝবে তার রহস্যলীলা। তিনি যে একনিষ্ঠ প্রেমস্বরূপ হয়েও বিশ্ব-প্রেমাবতার। একবল্লভ হয়েও বহুবল্লভ। অকল্পনীয় তার পরিপূর্ণতা। সেই পূর্ণতা থেকে পূর্ণ গ্রহণ করলেও পূর্ণই আবার বাকী থেকে যায়। যদি তার ইচ্ছা হয়, তিনিই কৃপা করে একদিন একথা তোমায় বুঝিয়ে দেবেন।

বলতে বলতে কি এক উচ্ছ্বাসভরে গদগদ হয়ে এল বড়িমার কণ্ঠ। যুক্তকর বক্ষে সংলগ্ন করে স্তিমিত নেত্রে তাকিয়ে বড়িমা বললেন—শ্রীমতী, এক অপূর্ব আনন্দের বার্তা নিয়ে আজ এসেছি তোমার কাছে। কাল রজনীতে মহর্ষি গর্গদেবের দর্শন পেয়েছিলাম। তিনি কৃপা করে মহারহস্যের যবনিকা উত্তোলন করেছেন। দূর করে দিয়েছেন সমস্ত সমস্যা—সমস্ত সংশয়। শোনো শ্রীমতী, শোনো সখিগণ, তোমাদের পরম প্রেমাস্পদ জীবনস্বরূপ এই নন্দনন্দনই স্বয়ং ভগবান। তিনিই দেবকীগর্ভজাত সেই অপ্রাকৃত শিশু, যাকে বসুদেব সকলের অজ্ঞাতসারে রেখে গিয়েছিলেন নন্দালয়ে। তার কণ্ঠের পুষ্পমালা যেদিন পশুপতির কণ্ঠে দেখেছিলাম, সেদিনই আমার মন চিনেছিল তাকে। আজ আর কোন দ্বিধা—কোন সন্দেহই অবশিষ্ট নেই।

সখীরা নির্বাক বিস্ময়ে শুনল বড়িমার কথা। তারপর সকলেরই দৃষ্টি একযোগে নিবদ্ধ হল শ্রীমতীর পানে। কিন্তু শ্রীমতীর মুখে কোন ভাবান্তর দেখা গেল না। অবিচলিত কণ্ঠে সে বলল—বড়িমা যেদিন থেকে তাকে ভালোবেসেছি, সেদিন থেকেই আর কোন প্রশ্ন নেই মনে, নেই কোন সমস্যা-

সমাধানের কৌতূহল। আজ আমার অন্তর জানতেও চায় না, সে কে। শুধু জানি, সেই শ্যামলকিশোর যেই হোক না কেন, সেই আমার প্রিয়তম। সেই মুরলীমনোহর-ই আমার চিরজীবনের প্রাণবল্লভ।

ললিতা বলল—আর যে আমাদের প্রাণ-সখীর প্রেমাস্পদ, সে আমাদেরও প্রিয়তম।

বিশাখা বলল—শ্রীমতীকে ভালোবেসেই আমরা তাকে ভালোবেসেছি। শ্রীমতীর ভালোবাসাই আমাদের চিত্তকে জাগিয়েছে—শিখিয়েছে আমাদেরও ভালোবাসতে। শ্রীমতীকে পেয়েছি বলেই আমরা তাকেও পেয়েছি, আর শ্রীমতীকে চাই বলেই তাকেও চাই। বড়িমা, তাই নন্দকিশোরের অলৌকিক পরিচয়ে আমাদেরও কোন প্রয়োজন নেই।

বিস্ময়ে নির্বাক হলেন বড়িমা। মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে রইলেন শ্রীমতীর পানে। ধন্য তুমি শ্রীমতী। আশ্চর্য তোমার অনপেক্ষ প্রেম। তুমি যে পেয়েছ তার মাধুর্যের পরিচয়। তাই আর স্পৃহা নেই তার ঐশ্বর্যের সন্ধানে।

আমার অন্তরের বৈধী ভক্তি ওই দুর্লভ রাগময়ী ভক্তির নাগাল পাবে কেমন করে। দেবী, আমাকে তোমার সেবিকা কর। তোমার সখীগণের মধ্যে আমাকেও গণনা কর। রাগময়ী ভক্তিকে সসম্ভ্রমে প্রণাম জানিয়ে বৈধী ভক্তি দূর থেকে বিদায় নিক্—নত মস্তকে পথ ছেড়ে দিক্ তাকে।

শ্রীমতীর পায়ের কাছে বসে পড়ে বড়িমা বললেন—বল পুত্রী, আমায় তোমার প্রিয়তমের কথা বল। তাকে লাভ করে যে আনন্দ তুমি পেয়েছ তার একবিন্দু বিতরণ কর আমায়।

শ্রীমতী বলল—হায় বড়িমা! তোমাকে কেমন করে বোঝাব, তাকে পেয়েও আমি পাইনি। সে যেন অনন্ত আকাশ, আর আমি তার মাঝে একটি ক্ষুদ্র তারকা। অগাধ সমুদ্রের মত তার প্রেম, আর আমার হৃদয় যেন একটি ক্ষুদ্র অঞ্জলি। বসন্ত-শোভার মত অফুরন্ত তার মাধুরী, আর আমি একটি তৃণ-কুসুম হয়ে তার একপ্রান্তে লুটিয়ে থাকি। দানের তার সীমা নেই, সে বলে—আমি আরো দিতে চাই, আরো নাও আরো নাও রাধা। ক্ষুদ্র আমার হৃদয়পাত্র, সে কতটুকু গ্রহণ করতে পারে! শধু হাহাকার করে ব্যর্থ বেদনায়।

বড়িমা বললেন—শ্রীমতী, তিনি যদি ইচ্ছা করেন, অসীম হয়েও সীমার

মাঝে ধরা দিতে পারেন। এক বিন্দু শিশিরের বুকেও প্রতিবিম্বিত হয় সুদূর সূর্যের বিপুল মহিমা। গোষ্পদ-সলিলেও অনন্ত আকাশের ছায়া পড়ে।

কোন উত্তর দেয় না রাজনন্দিনী। সে যেন করে চলেছে এক দ্বৈত ভূমিকার অভিনয়। তার মনের মধ্যে শ্রীমতী বলল—এই তো বেশ। সেই শ্যামলকিশোর আপনা থেকেই ধরা দিয়েছে আমার কাছে। আমি যতটুকু পাই তাই তো প্রত্যাশার অধিক আমার পক্ষে। কিন্তু ব্যাকুল শ্রীরাধা বলে—হে চির রহস্যময়, হে অনন্ত লীলাময়, বল তুমি কে ? আমি তোমার চরম রূপ দেখতে চাই। সব জানার যেখানে অবসান সেইখানে জানতে চাই তোমায়। যেমন করে পেলে অন্তরাত্মার সব তৃষ্ণা মিটে যায়, তেমনি করে তোমায় আমি পেতে চাই।

বাঁশী বেজে উঠল।

আজ সে বাজল আশাবরী রাগিণীতে। গান গেয়ে বলল—ওগো প্রেমময়ী, ওগো রাধা, তুমি আমায় পেতে চাও, রাত্রি গভীর হলেই আমি আসব। তুমি জানতে চাও আমার পরিচয়—ঝঞ্ঝা আর দুর্যোগের দুর্দিনে তোমার কাছে তা উদ্‌ঘাটিত হবে। আমার সাথে তোমার পরম মিলন হবে চরম বিরহে।

শ্রীমতী রাধা বলল—রাত্রি এলেই যদি তোমায় পাওয়া যায় তবে আমার জীবনে জেগে থাক চিরন্তন মহানিশা। প্রভাত আমি চাইনে। ঝঞ্ঝা আর দুর্যোগে যদি তোমায় জানা যায়, তবে আনো তোমার ঝড়ের বাতাস—দুর্যোগের মেঘমালা। তাদের আমি স্বাগত জানাচ্ছি। মিলনে যদি এত বিরহ, তবে দাও সেই চরম বিরহ, যার মাঝে আছে পরম মিলন।

কিন্তু হে চিরসুন্দর, একান্ত পরিপূর্ণ করে—একান্ত আমার করে যদি না পাই তোমায়, তবে এমন খণ্ডিতভাবে ক্ষুদ্ররূপে তোমায় আর আমি পেতে চাইনে। আমার হৃদয়ে যদি না দাও অনন্তপ্রেম—না দাও তোমাকে বুঝবার জানবার গ্রহণ করবার অনন্ত অধিকার, তবে হে চপল, হে নির্মম, ফিরে যাও আমার কুঞ্জদ্বার থেকে—ফিরে যাও অন্তরদ্বার হতে। যে তোমায় ক্ষণকালের জন্য পেয়ে তৃপ্ত করতে চায় ক্ষণিক পিপাসা, তারি কাছে যাও তোমার ছলনা আর কপটতা নিয়ে।

আমি এই দ্বিতীয়বার তোমায় প্রত্যাখ্যান করছি।

বাঁশী মিনতি করে বলল—হে অভিমানিনী, ক্ষান্ত হও। ত্যাগ কর তোমার নিদারুণ অভিমান। যে বারেকমাত্র আমায় পেতে চায়, ক্ষণিকের জন্য আমায় স্মরণ করে, সেও যে আমার প্রিয়। তাকে নিরাশ করতেও যে আমার বুকে বাজে। তবু কি আমি নির্মম ? কিন্তু হে মানিনী রাধা, তুমি যে আমার প্রিয়তর হতে প্রিয়তম। তুমিই যে আমার পরমপ্রেমরূপা। তোমায় অদেয় আমার তো কিছুই নেই। হে শ্রীময়ী, হে মধুময়ী, অভিমান ত্যাগ কর। শোনো, তুমি দেখতে চাও আমার চরম রূপ—জানতে চাও আমার পরম পরিচয় ?

তবে শ্রীমতী, তোমার আত্মার সব আবরণ উন্মুক্ত হোক—দূরে যাক নয়নের মোহ-যবনিকা। দর্শন কর আমার আনন্দলীলার—রাসলীলার বিশ্বরূপ।

বাঁশীর বাণী শুনতে শুনতে ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন হয়ে এল শ্রীমতীর পার্থিব চেতনা—মুদ্রিত হয়ে এল দুটি দেহাশ্রিত নয়ন। তার মধ্যে ফুটে উঠল এক নূতন দৃষ্টি—এক দিব্য নয়ন।

একি দেখছে শ্রীমতী রাধা! সে যে নিজেকেই নিজে দেখতে পাচ্ছে। এক অনন্ত অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে সে একাকিনী। সহসা জেগে উঠল অলৌকিক বংশীধ্বনি। সেই ধ্বনি শুনে ঊর্ধ্বতিমিরে ফুটে উঠল অসংখ্য তারা। জেগে উঠল শারদ-পূর্ণিমার চন্দ্র। সুরের ঝংকারে ঝংকারে ফুটতে লাগল কুসুমরাজি—কুমুদ-কহ্লার, কদম্ব-কেতকী। মধুছন্দ পবন অপূর্ব গন্ধে পূর্ণ হল।

কোথায় চলেছে সে বিহ্বল হয়ে ? বুঝতে পারল শ্রীমতী, তার অন্তরাত্মা চলেছে আজ শ্যামসুন্দরের অভিসারে। চলেছে আত্মহারা রাধা বংশীরবের অনুসরণ করে।

কিন্তু একি করেছে সে! আত্মহারা হয়ে অভিসার-সাজে সাজতে গিয়ে সবকিছু এলোমেলো করে ফেলেছে। এক চোখে পরেছে কাজল—নূপুর বেঁধেছে এক পায়ে। এক হাতে দিয়েছে কংকন—এক কানে কুণ্ডল। ললাটের কুংকুমবিন্দু বয়ানে এঁকেছে। স্খলিত-বসনা শিথিল-কুন্তলা শ্রীরাধা ছুটে চলেছে কম্পিত চরণে।

এ কোথায় এসে পেঁাচেছে সে ? এ যে যমুনা-পুলিন—অপূর্ব রম্য

বালুকা-বেলা। একদিকে ধীরবাহিনী, শান্তসলিলা যমুনা, অন্যদিকে শ্যামল বনরাজি। আর তার মাঝখানে শীতল বালুকারাশি চন্দ্রকিরণে হীরক-বিন্দুর মত জ্বলছে।

প্রতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে স্বরগ্রামের বিভিন্ন তান জাগিয়ে বাজতে লাগল মোহন-বাঁশী। ঋষভ সুরের মূর্ছনায় হরিৎ কিশলয়ে আচ্ছাদিত হল বনান্তের তরুলতা। মধ্যম রাগের ঝংকারে নবীন শ্যামলতা জেগে উঠল ঘাসে ঘাসে। পঞ্চম তানের স্পর্শে তৃণে তৃণে ফুটে উঠল বিচিত্র কুসুম। নিষাদ সুরের ধ্বনিতে অলিগুঞ্জনে বিহগ-কাকলিতে মুখরিত হল বনভূমি। অবশেষে জেগে উঠল সপ্ত সুরের মিলিত ঝংকার। সেই সুরে বেলাভূমির কেন্দ্রস্থলে জেগে উঠল এক উচ্চ বেদিকা আর তার উপর আবির্ভূত হল বংশীবাদনরত আনন্দঘন-বিগ্রহ শ্রীরাধার হৃদয়-বল্লভ শ্যামলকিশোর।

কিন্তু একি! চারদিক থেকে বিভিন্ন পথ ধরে ওই কারা এগিয়ে আসছে? যেন চেনা চেনা মনে হচ্ছে মুখগুলি। এ যে ললিতা বিশাখা বিরজা চিত্রা মায়া। ওই যে আসছে ইন্দুমতী চম্পকলতিকা অনঙ্গমঞ্জরী। আসছে একে একে সখীরা সব—শ্রীরাধার মতই আত্মহারা হয়ে ছুটে আসছে।

শুধু তাই নয়, ছুটে আসছে আরো কত গোপরমণী—বৃন্দাবনের অসংখ্য নারী। পূর্ণ হয়ে গেল সেই বিস্তৃত বালুকাবেলা। তাদের পানে তাকিয়ে স্নিগ্ধ হাসি হাসল নন্দকিশোর। তারপর বাঁশীতে নূতন তান ধরল।

বাঁশী বলল—ফিরে যাও সখি, ফিরে যাও। আমি তো তোমাদের পতি দিয়েছি, পুত্র দিয়েছি, দিয়েছি স্বজন-সুহৃদ বন্ধু-বান্ধব। দিয়েছি গৃহ-সংসার ঐশ্বর্য—সুখভোগের বহু উপকরণ। তারি মাঝে ফিরে যাও হে শোভনে, আমায় চেও না। সবকিছু হারিও না আমায় চেয়ে।

বাঁশরীর মুখে একথা শুনে ক্ষণেকের জন্য স্তব্ধ হয়ে রইল ব্রজনারীগণ। তারপর তারা বলল—হে কৃষ্ণ, পতি-পুত্র স্বজন-বন্ধুর মধ্য দিয়ে তুমিই চিরদিন আমাদের আকর্ষণ করেছ। গৃহ দিয়েও গৃহছাড়া করেছ—কুল দিয়েও করেছ কুলহারা। তাই এসেছি তোমার পাদমূলে। তোমাকে পেলেই সর্বকিছু পাওয়া হবে—তোমাকে না পেলে হারাবো সবই। হে জীবনপ্রভু, হে হৃদয়স্বামী, তুচ্ছ প্রলোভনে আর আমাদের ভুলাতে চেও না। গৃহবন্ধন থেকে যদি ছিন্ন করেই এনেছ কৃপাময়, তবে কৃপা করে আমাদের গ্রহণ কর।

তাদের নিবেদন শুনে শংকায় কেঁপে উঠল শ্রীরাধার অন্তর। শত শত ব্যাকুল প্রাণ যে আজ মিলিত কণ্ঠে প্রার্থনা করছে তারই হৃদয়েশকে—চাইছে তাকে নিজের করে নিতে। শ্রীরাধা কি তবে হারাবে তার কান্তকে? শ্যামমনোহর যে তারই—একান্তই তার। তাকে না পেলে জীবনধারণ করবে কেমন করে?

সব ভুলে ছুটে গিয়ে শ্রীরাধা লুটিয়ে পড়ল তার প্রিয়তমের পদতলে। সবলে আঁকড়ে ধরল ওই চরণ দুখানি নিজের দুটি বক্ষের মাঝে।

নিমেষে বেজে উঠল শত শত বীণা-বেণু। কোথা থেকে যেন ধ্বনিত হল অসংখ্য মুরজ মুরলী মৃদঙ্গ করতাল। গভীর পুলকে নিবিড় আনন্দে পরিপূর্ণ হল শ্রীরাধার অন্তর্লোক।

সম্বিত ফিরে পেয়ে তাকিয়ে দেখল, আনন্দময়ের দুটি বাহু তাকে বেষ্টন করে আছে। কে যেন তার কানে কানে বলল—নাচো শ্রীরাধা, নাচো। আনন্দ-নৃত্যে মগ্ন হও। আমার চরণের তালে তাল মিলিয়ে—আমার নূপুরের ছন্দে ছন্দ মিলিয়ে নৃত্য কর। ছন্দই আনন্দ, ছন্দই মাধুরী—ছন্দ হারালেই অভাব, দুঃখ, আঘাত। ছন্দই জীবন, ছন্দহারা হলেই আসে বিচ্ছেদ—আসে মৃত্যু। আমার নৃত্যের ছন্দ নিয়েই সুন্দর এই বিশ্বপ্রকৃতি। ছন্দেই জাগে সঙ্গীত শিল্প সাহিত্য—এই ছন্দেরই দোলায় হৃদয়ে ফোটে প্রেমের কুসুম।

সেই ছন্দে ছন্দ মিলিয়ে—সেই তালে তাল মিলিয়ে অসীম গর্বে পূর্ণ হল শ্রীমতীর অন্তর। শ্যামলকিশোর নন্দনন্দন একান্ত তারই—আর কারু নয়। তারই সঙ্গে তাই তার রসলীলা—রাসনৃত্য।

সহসা শত শত নূপুরের ঝংকার—কংকনের নিনাদ এসে একযোগে রাধিকার কর্ণে প্রবেশ করল। চারপাশে তাকিয়ে বিস্মিত হল শ্রীমতী। একই ছন্দে সুরে একই গতিতে তার মত সকলেই যে নৃত্য করছে। নৃত্য করছে সখীরা—নৃত্য করছে ব্রজাঙ্গনাগণ। মুহূর্তের জন্য স্থির হয়ে দাঁড়াল শ্রীরাধা। তাকালো সখীদের পানে। ওই তো আনন্দ-চঞ্চল পদক্ষেপে নৃত্য করছে ললিতা। কিন্তু কি আশ্চর্য! এখন যে ললিতার সঙ্গে যুক্ত হয়েই নৃত্য করছে বনমালী।

দুঃখিত মনে নিজের পানে ফিরে তাকাল। কিন্তু না না, তাকে তো

ত্যাগ করেনি তার প্রাণবল্লভ। শ্রীরাধা এখনও রয়েছে তারই বাহুবন্ধনে। তবে ?

বিস্মিত হয়ে আবার তাকালো শ্রীরাধা। তাকালো প্রত্যেক সখীর পানে—প্রত্যেক ব্রজনারীর পানে—সকলের পানে। একি পরম বিস্ময় ! প্রত্যেকের সাথে যুক্ত হয়েই যে নৃত্য করছে ঘনশ্যাম।

বার বার তাকিয়ে দেখল নিজের পানে। সেখানেও তেমনি রয়েছে রাসবিহারী। একই ছন্দে—একই তালে—একই আনন্দে নেচে চলেছে শত শত ঘনশ্যাম। একই দেহ, একই কান্তি, একই বেশভূষা।

অসংখ্য বাদ্যযন্ত্রের গমকে ঝংকারে মূর্ছনায় এক বিচিত্র ঐকতানের সৃষ্টি হচ্ছে, আর সেই মিলিত সুর ঊর্ধ্বাকাশে প্রধাবিত হয়ে কখনো স্বরিত—কখনো উদাত্ত—কখনো অনুদাত্ত হয়ে এক গম্ভীর অলৌকিক নাদে পরিণত হচ্ছে। দেখতে দেখতে সেই সুর সেই নিনাদ ছড়িয়ে পড়ল গগনে গগনে। পরিব্যাপ্ত হল বিশ্বভুবনে।

শ্রীরাধার মনে হতে লাগল, গ্রহ-উপগ্রহ চন্দ্র-সূর্য-তারকা সৌরলোক নীহারিকালোক সব আবর্তিত হচ্ছে এই নৃত্যছন্দে—এই একই তালে তাল মিলিয়ে। এই নৃত্য-দোলায় দুলছে রাত্রি-দিন আলো-অন্ধকার দুঃখ-সুখ। দুলছে জীবন-মরণ মিলন-বিচ্ছেদ, অনন্ত বিশ্বের অনন্ত চেতনা।

মোহনমুরলী শ্রীরাধার কানে কানে বলল—দেখ রাধা, দেখ। এই আমার চিরন্তন আনন্দলীলা। এই লীলারই অঙ্গ প্রতিটি প্রাণের প্রতিটি জীবন-লীলা। জীবন-নৃত্যের প্রতি পদক্ষেপে আমি প্রতিক্ষণ আছি সকলের সাথে সাথে। আছি প্রতিটি অণুপরমাণুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে। আছি জীবনে-মরণে পতনে-উত্থানে। তোমাদের আনন্দ-বেদনায় হাসি-কান্নায় আমিও চলেছি হেসে-কেঁদে।

শ্রীরাধা প্রণাম জানাল এই নিখিল-বিশ্বাত্মাকে। মনে মনে বলল—আজ আমি চিনেছি তোমায় হে জগদীশ্বর। আজ আমি বুঝেছি, তুমি সকলের—তুমি প্রত্যেকের। তুমি তো শ্রীরাধার নও, তুমি বিশ্বভুবনের। কল্পে-কল্পান্তে কত লক্ষ লক্ষ রাধা সাগর-তরঙ্গের মত জাগবে তোমার বুকে, আবার বিলীন হয়ে যাবে তোমাতেই। আমার হৃদয়ের প্রেমবন্ধনে তোমাকে বাঁধবার একি বৃথা আশা ! বৃথা আশা তোমাকে একান্ত করে পাবার। শ্রীরাধার

দুই বিন্দু অশ্রু ঝরে পড়ল শ্যামসুন্দরের চরণে আর সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত সঙ্গীত স্তব্ধ হয়ে গেল—শুধু বাজতে লাগল মোহন-মুরলী। সখীবৃন্দ ব্রজাঙ্গনাগণ সকলে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল এক মুহূর্তে। শ্রীরাধা দেখতে পেলো এক ছায়াময় বৃক্ষতলে বসে আছে শুধু নন্দনন্দন, আর তার কোলে মাথা রেখে অর্ধশয়ানে শ্রীরাধা। তার শ্রান্তি দূর করবার জন্য ঘনশ্যাম উত্তরীয়-প্রান্ত দিয়ে তার দেহে ব্যজন করছে। হাত বুলিয়ে দিচ্ছে ঘর্মাক্ত ললাটে।

অপারিসীম আনন্দে অভিভূত হয়ে উঠে বসল শ্রীরাধা। ভাবল, মিথ্যা শংকায় বৃথা সন্দেহে আমি আমার প্রিয়তমের প্রেমের অসম্মান করেছিলাম। সে আমারি—একান্তভাবেই আমার।

দুটি আয়ত নয়ন হতে প্রেমবর্ষণ করে শ্রীরাধার পানে তাকালো ঘনশ্যাম। সেই নয়ন যেন ভাষা হয়ে বলল—বল রাধা বল, কি তোমার মনের একান্ত অভিলাষ?

শ্রীরাধা বলল—প্রিয়তম, আমি আর চলতে পারিনে। সংসারের দুঃখ-বন্ধুর মোহ-জটিল পথে আমার চরণ ক্লান্ত। তোমার যেখানে ইচ্ছা নিয়ে চল আমায়। হও আমার জীবনরথের সারথি। আমার সমস্ত ভার তোমার কাঁধেই সঁপে দিলাম, হে জীবনস্বামী। তুমি একান্ত আমার হও—আমায় অনুক্ষণ তোমার সঙ্গে যুক্ত রাখো—করো তোমার মোহনচূড়া।

আয়ত নয়নের নীরব হাসি যেন বলল—তথাস্তু শ্রীরাধা, তোমার প্রেমকে করবো আমার মাথার মণি। আর সেজন্যেই আরো বেদনা—আরো অশ্রু প্রয়োজন।

মুহূর্তের জন্য অন্যমনা হয়েছিল শ্রীরাধা। পরমুহূর্তেই পাশে তাকিয়ে কৃষ্ণকে আর দেখতে পেল না। রাধাকে ফেলে অন্তর্হিত হয়েছে শ্রীহরি।

শ্রীমতী দিব্যনয়নে দেখতে পেল অনুতাপে কাঁদছে রাধা। নিজেকে ধিক্কার দিচ্ছে মনে মনে—হায়! কেন আমি স্বার্থপরের মত সকলের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে তাকে একা আমার করে পেতে চেয়েছিলাম। তাই বুঝি সে অদর্শন হল।

উন্মাদিনীর মত বনে-বনান্তরে ছুটে বেড়াতে লাগল শ্রীরাধা। সন্ধান করতে লাগল তার অন্তরতমকে। হাহাকার করে বলল—কোথা তুমি ঘনশ্যাম।

শ্রীরাধার কান্নার সুরে সুর মিলিয়ে চারদিক থেকে প্রতিধ্বনির মত জেগে

উঠল একই হাহাকার—কোথা তুমি, কোথা তুমি ঘনশ্যাম। সকল সখী—সব ব্রজাঙ্গনা শ্যামরায়কে হারিয়ে শ্রীরাধার মতই বিরহ-বিধুর চিত্তে হাহাকার করতে করতে সেখানে এসে সমবেত হল। নির্দয় পবনে অসংখ্য শিউলি-বকুল যেন খসে পড়ল ঝরা মালতীর পাশে।

তাদের রোদনধারা এসে একীভূত হল শ্রীরাধার করুণ রোদনে। শ্রীরাধার হৃদয়-বেদনা মিলিত হল তাদের বেদনার সঙ্গে। আজ তারা সকলেই শ্যামহারা—সমব্যথাতুরা—সমপ্রাণা। সকলের চিত্ত একই বেদনায়, একই প্রার্থনায় সমস্বরে আহ্বান জানাতে লাগল—হে নাথ, হে দয়িত, হে করুণৈক-সিন্ধু, তুমি কোথায়? নিজেদের তোমার লীলাসঙ্গিনী মনে করে আমাদের অন্তরে যদি গর্বের সঞ্চার হয়ে থাকে, হে লীলাময়, সে গর্ব—সে অহমিকা তো তোমারই দান। আমাদের অনুতপ্ত নয়নের জলে সে অহংকার আজ নিঃশেষে ডুবিয়ে দিলাম। কৃপা কর, ক্ষমা কর, দর্শন দাও আমাদের। আমরা তোমার শ্রীচরণে দাসী হতে চাই।

অন্তর্নয়নে তাকিয়ে সবই দেখছে শ্রীমতী। দেখছে সেই করুণ দৃশ্যপট। সহসা আবির্ভূত হল স্মিত-কান্তি নন্দনন্দন। তার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই দৃশ্যপট পরিবর্তিত হল। আবার সেই আনন্দপূর্ণ রাসমণ্ডল। সেই সঙ্গীত—সেই নৃত্য। এক কৃষ্ণ বহু হয়ে ক্রীড়া করছে প্রত্যেকের সঙ্গে। একবল্লভ হয়েও বহুবল্লভ। প্রত্যেকের কাছে পূর্ণরূপে ধরা দিয়ে তবু তার পূর্ণতার শেষ নেই।

শ্রীমতীর আত্মা তার প্রিয়তমের পরম পরিচয় জেনে অন্তরাভিসার শেষে ফিরে এল এক নূতন চেতনার আলোকে মণ্ডিত হয়ে। শ্রীমতী যখন আত্মস্থ হল তখন এক দিব্য জ্যোতিতে তার দেহ জ্যোতির্ময়। প্রাকৃত দেহ অপার্থিব লাবণ্যে রূপান্তরিত। দুনয়ন যেন দুটি আনন্দের প্রদীপ।

সখীগণ নির্বাক বিস্ময়ে চেয়ে রইল তার পানে। বাঁড়মা মনে মনে বললেন—হে কৃষ্ণৈকপ্রাণা মহাভাব-স্বরূপিনী, বল তুমি কে?

'কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বম্ আত্মানম্ অখিলাত্মানাম্ ।
জগদ্ধিতায় সোঽপ্যত্র দেহীবাভাতি মায়য়া ।।'
—শ্রীমদ্ভাগবত ।। ১০।১৪।৫৫ ।।

তের

অখিল আত্মার আত্মা জেনো এই শ্রীকৃষ্ণমুরারি ।
জগৎ-হিতের তরে মায়ায় হয়েছে দেহধারী ।।

যমুনার তীর ধরে একখানি রথ ছুটে আসছে। প্রচণ্ড দুর্ভাগ্যের মত মুখব্যাদান করে সে বৃন্দাবনের দিকে ছুটে আসছে। আসন্ন বিপদের মত কালো ছায়া ফেলে সে এগিয়ে আসছে তড়িৎবেগে। রথের অশ্বদুটি যেন চরম দুর্যোগের দ্বিখণ্ডিত ঘনমেঘ। তাদের খুরের আঘাতে উত্থিত ধূলি-রাশি একটি বিস্তীর্ণ ধূসর পরিমণ্ডল রচনা করে এগিয়ে আসছে। যেন আবৃত করতে আসছে বৃন্দাবনের সব আনন্দ, সব সৌন্দর্য। যেন আচ্ছন্ন করতে আসছে ব্রজের নর-নারীর আশা আর আশ্রয়—মলিন করে দিতে আসছে তাদের দিবসের সূর্য আর রজনীর চন্দ্রতারকা। রথচক্রে গুরু গুরু ধ্বনি জাগছে—আসন্ন বজ্রপাতের পূর্বাভাসের মত, শংকিত হৃদয়ের কম্পন-ধ্বনির মত।

দেখতে দেখতে রথ আরো এগিয়ে এলো। কিঞ্চিৎ মন্দীভূত গতিতে অগ্রসর হল নন্দভবনের পানে।

শ্রীমতী তখন নিজ হাতে গৃহমার্জনা করছিল। দাসীর হাত থেকে কার্যভার সে স্বয়ং গ্রহণ করেছে। সখীদের মানাও শোনেনি। কৃষ্ণধ্যানে মনকে নিমগ্ন রেখেও আজকাল শ্রীমতী তার হাত দুটিকে নিরন্তর গৃহকর্মে ব্যাপৃত রাখে। তাই তার প্রতি কর্মই সেবা হয়ে ওঠে—হয়ে যায় পূজা।

কর্মযোগিনী হয়েও সে কর্মসন্ন্যাসিনী।

অখণ্ড ব্যস্ততার মধ্যেও তার অনন্ত নিভৃতি। সর্বক্ষণ সকলের সঙ্গে সঙ্গে থেকেও সে একান্ত নিঃসঙ্গ। নয়ন সব রূপ দেখেও তা মনে মনে সমর্পণ করছে কৃষ্ণরূপে। শ্রবণ সব ধ্বনি শুনেও মনে মনে তা সমর্পণ করছে মুরলীধারীর মুরলীধ্বনিতে। জিহ্বা সব কথা উচ্চারণ করেও তা মনে মনে অঞ্জলি দিচ্ছে কৃষ্ণনামে। মস্তক সব নিন্দাভার অনায়াসে বহন করেও মনে মনে তা নামিয়ে রাখছে কৃষ্ণপদে।

কৃষ্ণচিন্তার সঙ্গে যুক্ত করে নিলে শ্রীমতীর সব কর্মই যেন অসীম আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। কোথায় বিলীন হয়ে যায় সমস্ত ক্লান্তি—সমস্ত শ্রম।

গৃহমার্জনা করতে করতেও হৃদয় তার কি এক আনন্দে মুকুলিত হয়ে উঠেছিল। যে-গৃহ তার প্রিয়তমের পাদস্পর্শে পবিত্র, সে-গৃহের প্রতিটি অংশকে নির্মল নিষ্কলুষ করতে না পারলে তৃপ্তি হবে কেমন করে। এ গৃহ যে আনন্দ-নিকেতন তীর্থভূমি। এর প্রতিটি ইণ্টক-কণায় বার বার মাথা ঠেকাতে ইচ্ছা করে।

গৃহমার্জনা শেষ হলে শ্রীমতী আরম্ভ করল গৃহসজ্জা। গৃহ সাজাতে সাজাতে সহসা মনে হল, তার এই দেহটিও যে গৃহ। এ গৃহের অন্তঃপুরেও তো প্রিয়তমের নিত্য আগমন। তবে এ গৃহ-ই বা সে অসজ্জিত রাখবে কেন? সেই প্রাণারামের প্রেম তার মনকে নিত্য নব নব রম্য সাজে সাজায়, জীবনে জাগায় চির-মহোৎসব। তাই দেহ-সজ্জায় দেহ-আভরণে তার নিজের কোনো প্রয়োজন নাই থাক্, হৃদয়স্বামীর তৃপ্তির জন্য—তার আনন্দ-বিধানের জন্য সে সবকিছুই করতে পারে।

তাই উদাসিনী হয়েও সুন্দরের প্রীতিবিধানের জন্য নিজের দেহকে সুন্দর করে সাজাতে চাইল শ্রীমতী রাধা। এ দেহ যে দুর্লভের স্পর্শ পেয়েছে—হয়েছে দেব-দেউল। সূর্যের মহিমা যখন তুচ্ছ মেঘকে স্পর্শ

করে, তখন তা হয়ে যায় স্বর্গের ফুল।

দেহ তো তুচ্ছ নয়, এ দেহ যে তার সেবার উপকরণ। হায় মন্দভাগিনী! কোন্ প্রাণে এতদিন এই অসজ্জিত উপকরণে তার সেবা করেছিস্? আর যে-প্রেমে সেবা নেই, সে প্রেমও যে অসজ্জিত।

আপন মনে ভাবতে ভাবতে কোন্ ফাঁকে অনুতাপের অশ্রু জেগে উঠল শ্রীমতীর দুনয়নে। ললিতা আর বিরজা গৃহসজ্জায় শ্রীমতীকে সাহায্য করছিল। সাজিয়ে রাখছিল তম্বরু বীণা মৃদঙ্গ খঞ্জনী। শ্রীমতীর নয়নে অশ্রু দেখে ললিতা বলল—একি হল সখি, এ অশ্রু কি আনন্দের, না বেদনার?

আঁখিধারা মুছে ফেলে শ্রীমতী বলল—ললিতা, আমার জীবনে আনন্দ আর বেদনা যে এক হয়ে মিশে গেছে। অনুতাপে আজ আমি কাঁদছি। সখি, এতদিন ধরে এত কাছে কাছে পেয়েও প্রাণভরে শ্যামসুন্দরের সেবা করতে পারিনি। তার চেয়ে যদি বৃন্দাবনের মেঘ হতাম, তবে প্রিয়তমের রৌদ্রতপ্ত দেহে আমার সুশীতল ছায়াখানি মেলে ধরতাম। অনুক্ষণ করতাম তার সেবা। যদি ব্রজের ঝরা কুসুম হতাম, তবু তার চলার পথে বিছিয়ে থেকে সেই কোমল চরণ-দুখানিকে সকল আঘাত থেকে রক্ষা করতাম। যদি হতাম ব্রজের কোকিল, তবুও তো মধুর কণ্ঠের সঙ্গীত শুনিয়ে তার শ্রান্ত প্রাণে আনন্দ দিতে পারতাম।

সখি, বৃন্দাবনের পশুপাখী তরুলতা, এমনকি তুচ্ছ ধূলিকণা পর্যন্ত তার যতটুকু সেবা করতে পেরেছে, আমি মানুষ হয়ে ততটুকুও পারিনি।

হায়! অমৃতের পাত্র হাতের কাছেই রয়েছে, তবু পান করা গেল না কণ্ঠভরে। সমুখেই রয়েছে আনন্দ-সাগর, তবু অবগাহন করা গেল না তার মাঝে। এ যে কি বেদনা তা বোঝাব কেমন করে।

তবু এই সামান্যার প্রতি তার অপরিসীম ভালবাসার কথা স্মরণ করে হৃদয় আমার পুলকিত। মন ভরে উঠেছে গর্বে আর আনন্দে। আমি তো শূন্য জল-বুদ্বুদ। তারই অনুরাগের বর্ণচ্ছটা আমায় ইন্দ্রধনু করে সাজিয়ে তুলেছে।

শ্রীমতীর কথা শুনে বিরজা বলল—সখি, তুমি অমন করে বোলো না। সবকিছু উজাড় করে দিয়ে তবেই তুমি শূন্য সেজেছ। এ শূন্যতা যে নিজের মহিমার জ্যোতিতে নিজেই ইন্দ্রধনু হয়ে ফুটে ওঠে।

ঠিকই বলেছে বিরজা। যতখানি শ্রীমতীর শূন্যতা, ততখানিই গভীরতা। আর যতখানি গভীরতা, ততখানিই আত্মনিবেদন।

কিন্তু শ্রীমতী বলল—হায় সখি, তার চরণে নিজেকে আর উজাড় করে দিতে পারলাম কই। একদিন আমার খেদ ছিল তাকে পরিপূর্ণভাবে পাইনি বলে। সেদিন আমি শুধু পেতেই চেয়েছিলাম। পেতে চেয়েছিলাম আনন্দ, মাধুরী—পেতে চেয়েছিলাম প্রেম, তৃপ্তি, শান্তি। আজ আমার ভুল ভেঙেছে। বুঝেছি, প্রেম তো পাওয়া নয়—প্রেম দেওয়া। তাই আজ শুধু দিয়ে যেতে চাই। প্রিয়তমকে দিতে চাই আমার সবকিছু—দিয়ে দিতে চাই আমার 'আমি'কে।

কিন্তু সখি, বার বার সবকিছু দিতে গিয়েও কোথায় যেন বাধা পেয়ে ফিরে আসি। মনে হয় আমার অস্তিত্বটুকুও যদি তাকে সমর্পণ করি তবে তার সেবা হবে কেমন করে। কে করবে সেবা। তাই আর দেওয়া গেল না নিজেকে উজাড় করে।

শ্রীমতী তো জানে না প্রিয়তম তার এ অভিলাষটুকুও অপূর্ণ রাখবে না। তাকে নিঃশেষ করেই নেবে—নেবে তার 'আমি'টুকুকেও উজাড় করে। শ্রীমতীকে সেবার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে নিজেকে সরিয়ে নেবে দূরে—বিরহের পরপারে, আর এমনি করেই শ্রীমতীর সমগ্রতার শেষতম বিন্দুটিও লুণ্ঠন করে নেবে সে।

যে আঘাতে তা সম্ভব হবে, সে আঘাত অক্রুর-সারথির বেশে ততক্ষণে নন্দালয়ে পৌঁছে গেছে।

ঃ রাজনন্দিনী শ্রীমতী, পুত্রী আমার, বড় দুঃসংবাদ পেয়ে ছুটে এসেছি তোমার কাছে।

অদূরে বড়িমার কম্পিত কাতর কণ্ঠ শোনা গেল। কান্নার মত শোনালো সে স্বর।

ঃ কি হয়েছে বড়িমা, কি তোমার দুঃসংবাদ ?

সখীরা চারদিক থেকে ছুটে এসে দাঁড়াল তাঁর কাছে।

ঃ দুঃসংবাদ শুধু আমার নয়, দুঃসংবাদ তোমাদেরও সকলের—দুঃসংবাদ সমস্ত বৃন্দাবনের। কৃষ্ণ-বলরামকে নিয়ে যাবার জন্য মথুরা থেকে অক্রুর

রথ নিয়ে এসেছে। মহারাজ কংস ধনুর্যজ্ঞে নিমন্ত্রণ করে পাঠিয়েছেন তাদের।

ললিতা বলল—বড়িমা, তাতে ভয় কি? শূন্য রথ ফিরে যাবে। কৃষ্ণ-বলরাম কখনই বৃন্দাবন ছেড়ে যেতে পারে না।

ললাটে মৃদু করাঘাত করে বড়িমা বললেন—হায় ললিতা, বৃথা তোমার আশা। আমি নিজের চোখে দেখে এলাম যাবার আয়োজন। কাল প্রভাতেই কৃষ্ণ-বলরামকে নিয়ে নন্দ মথুরায় যাত্রা করবেন।

শিহরিত হল সখীরা। কেউ কেউ অস্ফুট ধ্বনি করে উঠল। একটা করুণ আর্তনাদ বক্ষ ঠেলে উঠতে চাইল।

একী নিদারুণ বার্তা!

আকাশের দূর প্রান্ত থেকে যেন একটা হাহাকার ছুটে আসছে। বাঁধ-ভাঙ্গা প্লাবন যেন এগিয়ে আসছে গর্জন করতে করতে। বিশ্বপ্রকৃতি যেন ছায়ানট রাগে আলাপ করতে করতে সহসা ছিঁড়ে ফেলল তার বীণার তার—হারিয়ে ফেলল গানের সুর। দিবসের হৃৎপিণ্ড ছিন্ন করে অকস্মাৎ অস্তমিত হল সূর্য, আর অসীম রাত্রির অন্ধকার যেন এগিয়ে আসতে চাইল শ্রীরাধার দৃষ্টির সামনে।

একবার শুধু ক্ষণিকের জন্য কেঁপে উঠল শ্রীমতী রাধার দেহ। তারপর কি এক আশ্বাসে স্থিরতায় সংযত হল সে! কি এক বিশ্বাসে মৃদু হাস্যরেখা ফুটে উঠল আননে। সকলে বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে রইল তার পানে।

মনকে প্রাণে সংযত করল শ্রীমতী—আবেগকে সমর্পণ করল বুদ্ধিতে। তারপর প্রাণকে সংহৃত করল আত্মায়—বুদ্ধি সমর্পিত হল বিবেকে।

পেলব কুসুমে শিশিরপাতের মত মৃদু কোমল স্বরে শ্রীমতী বলল—ভয় নেই বড়িমা, আমার কাছে সে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আমি বিদায় না দিলে সে এক পাও যেতে পারবে না বৃন্দাবন ছেড়ে।

সংশয়পূর্ণ কণ্ঠে বড়িমা বললেন—সত্যই কি তার এ প্রতিজ্ঞা? অথবা কি বাকচাতুরী মাত্র? শ্রীমতী, তুমি সরলা আর সে অনন্ত-ছলনাময়।

অকম্পিত বিশ্বাসের স্থিরতা কণ্ঠে নিয়ে শ্রীমতী বলল—মিথ্যা হতে পারে না তার কথা। বড়িমা, একদিন মিলন-রজনীতে আমার গলায় সে তার বুকের মালা পরিয়ে দিয়েছিল। আমি সে প্রসাদী মালা দুহাতে বক্ষে চেপে ধরে কেঁদে উঠেছিলাম।

সে বলল—নিজে কেঁদে আমাকে কাঁদাতে চাও কেন রাধা। আনন্দকে গ্রহণ করতে তোমার বেদনা কেন? আমি তো রয়েছি তোমার পাশে।

আমি কেঁদে বললাম—হে প্রিয়, এই রাত কেটে যাবে—ফুরাবে মিলন-লগ্ন। চিরন্তন করে রাখা যাবে না এই আনন্দ-মুহূর্তটিকে। সেই আমার ভয়—সেই বেদনা। হে ভুবনাভিরাম, দুর্বল আমার প্রেমবন্ধন। কবে অতর্কিতে এ বন্ধন ছিন্ন করে তুমি পালিয়ে যাবে, তাই আমার অনুক্ষণ আশংকা। হে গোপনচারী, যেমন গোপনে তুমি আস, তেমনি গোপনে যে চলে যাও আবার!

পরম স্নেহে সে বলল—প্রিয়তমা রাধা, এই যদি তোমার বেদনা হয়, তবে শোনো, আমি প্রতিজ্ঞা করছি—তোমার কাছে বিদায় না নিয়ে—তোমাকে না জানিয়ে আমি কোনোদিন বৃন্দাবন ত্যাগ করে এক পাও যাব না। বিনোদিনী, তুমি আশ্বস্ত হও—মুছে ফেল অশ্রু। তুমিই যে আমার আনন্দ—আমার পরম প্রেম।

বড়মা, তাই আমার এ বিশ্বাস—এ নিশ্চয়তা।

বিশাখা বলল—প্রিয়সখি, তোমার কথা শুনে নিশ্চিন্ত হলাম আমরা। তাকে যদি কাল প্রভাতে মথুরায় যেতেই হয়, তবে আজ রাতে সে নিশ্চয়ই আসবে তোমার কাছে বিদায় চাইতে। কিছুতেই তাকে বিদায় দিও না শ্রীমতী —দিও না বৃন্দাবন ত্যাগ করার অনুমতি।

না, শ্রীমতী তাকে বিদায় দেবে না। কিছুতেই যেতে দেবে না বৃন্দাবন ছেড়ে। স্তিমিতশিখা প্রদীপের পানে তাকিয়ে ওই একটি ভাবনাকে যেন উজ্জ্বল করে নিতে চাইল শ্রীমতী—করে নিতে চাইল অগ্নিশুদ্ধ।

কতবার ঋতুচক্র আবর্তিত হবে। ফুল ফোটানোর পালা সাঙ্গ হলে আসবে পাতা-ঝরানোর বেলা। নিদাঘের রৌদ্রতপ্ত তৃষিত হৃদয়ের পরে নেমে আসবে নববর্ষার কাজলমেঘের ছায়া। তবু শ্রীমতী তাকে বিদায় দেবে না।

শ্রীমতীর যৌবন হবে নিঃশেষিত-সুরভি—আসবে জীবন-মধ্যাহ্নের মন্থর প্রবাহ। তারপর দূর থেকে ডাক দেবে সন্ধ্যার অস্তসূর্য। তবু তাকে বিদায় দেবে না শ্রীমতী।

অপূর্ব সাজে সেজেছে আজ কৃষ্ণপ্রিয়া। মুক্তবেণীমণ্ডিতা পুষ্পাভরণ-ভূষিতা। যেন কুসুম-অঙ্গে কুসুম-শোভা। যেন আজ অনুরাগের পুষ্পবাসর।

কুসুম-সম্ভারে সজ্জিত গৃহ—সজ্জিত কক্ষতল। যেন নব বসন্তের কুসুমোৎসব। চারপাশে সখীরা নীরব। শুধু তুঙ্গদেবী শিথিল কোমল আঘাতে বাজিয়ে চলেছে মহতী-বীণা। সুর আর সুরভির সঙ্গমতীর্থ।

প্রদীপের স্তিমিতশিখা জ্বলতে জ্বলতে নিভে গেল। নেমে এলো আঁধারের যবনিকা। তার আড়ালে লুপ্ত হল সখীদের চারু অবয়ব, স্নিগ্ধ বদন। শুধু তাদের নয়নের মণি জ্বলতে লাগল কৃষ্ণা রজনীর অসংখ্য তারকার মত!

রাত্রি গাঢ়তর হল।

নেমে এলো লঘুছন্দা নিদ্রা। শ্রান্ত নরনারীর ললাটে নয়নে তার কোমল হাতের শান্ত স্পর্শটুকু নামিয়ে রাখল। নির্জনতা যেন কথা কয়ে উঠল দূরাগত ঝিল্লির ঝংকারে। খসে গেল বুঝি আকাশের কোন্ তারা।

ক্লান্তি নেমে এলো শ্রীমতীর নয়নে। কিন্তু জেগে রইল তার হৃদয় একটি জাগ্রত সংকল্প নিয়ে।

না, আমি তাকে বিদায় দেব না—কিছুতেই যেতে দেব না বৃন্দাবন ছেড়ে।

বীণার মোহময় মূর্ছনা—কুসুমের আবেশজড়িত সুরভি—রজনীর নিদ্রালস বিহ্বলতা—সবকিছু মিলে যেন এক স্বপ্নজাল রচিত হল শ্রীমতীর চেতনায় আর তারই ফাঁকে একসময় শ্রীমতীর মনে হল কে যেন এসে স্পর্শ করেছে তার ললাটের চূর্ণকুন্তল। কি মধুর পরিচিত স্পর্শ!

তুমি এলে কি? এসেছ কি তুমি, হে আমার হৃদয়-সর্বস্ব। শ্রীমতীর সব ভাবনা, সব চেতনা সেই স্পর্শে নিমগ্ন হয়ে যেতে চাইল। অতি কষ্টে সে জাগিয়ে রাখল হৃদয়ের সেই একটি সংকল্প। না, আমি তাকে বিদায় দেব না—কিছুতেই যেতে দেব না বৃন্দাবন ছেড়ে।

: রাধারাণী, আজ আমি তোমার প্রেমের কাছে ভিখারী সেজে এসেছি—ভিক্ষা দাও আমায়।

অন্ধকারের মধ্য থেকে যেন বেজে উঠল ব্রজবিহারীর কণ্ঠস্বর। বেজে উঠল শ্রীমতীর কানের কাছে।

: নাও, নাও প্রিয়তম, আমার সবকিছু নাও। নিজেকে নিঃশেষ করে দিলাম তোমার চরণে। আর কিছুই তো বাকী নেই আমার।

: আছে, রাজনন্দিনী, আছে। তোমার যা শ্রেষ্ঠধন—যা তোমার সবচেয়ে প্রিয়, তাই আজ ভিক্ষা দাও আমায়।

চমকে উঠল শ্রীমতী।

: হৃদয়েশ, সে যে তুমি—সে যে তুমি। তা আমি কেমন করে দেবো। সে আমি কিছুতেই দিতে পারব না।

ক্ষণিক নীরবতা।

তারপর আবার জাগল মোহন স্বর।

: প্রেমময়ী, তুমি আমাকে অনেক পেয়েছ—অনেক দিয়েছ নিজেকে। চাওয়া-পাওয়া অনেক হল—অনেক হল দেওয়া-নেওয়া। এবার এসেছে অনুভবের পালা। মিলনে শুধু প্রাপ্তি—বিচ্ছেদে উপলব্ধি। মিলনে সঞ্চয় বিচ্ছেদে তার মূল্যায়ন। মিলনে শুধু বিস্তার—বিচ্ছেদে গভীরতা। রাধিকা, আমি তোমার আরো কাছে আসব বলেই চলে যেতে চাই দূরে। দেহ দূরে না গেলে হৃদয় তো কাছে আসে না।

শ্রীমতী দুহাতে বুক চেপে ধরল।

: অমন করে বোলো না, হে নিষ্ঠুর। আমি তোমায় কিছুতেই বিদায় দিতে পারব না।

: ওগো রাধা, প্রেমের অনন্ত নির্ঝরিণী তুমি। কিন্তু যাদের প্রেম ক্ষীণধারা শীর্ণ নদীর মত—ভীরু দুর্বল অসম্পূর্ণ প্রেম নিয়ে যারা আমায় চায়, তাদের কাছ থেকে কি চিরদিন বিচ্ছিন্ন করে রাখবে আমায়? তাদের সকলের মধ্য দিয়ে জেগে উঠছে তোমারি বিশ্বপ্লাবী প্রেম-তরঙ্গ—তাদের মনে তোমারি আকুলতার স্পর্শ। তাদের তুমি বঞ্চিত কোরো না। তাদের প্রতি অকরুণ হোয়ো না, ওগো আমার রাধা।

শ্রীমতী কথা বলল না। নূতন করে ভাবতে লাগল নূতন ভাবনা। জগতের সকল প্রেমের মধ্য দিয়ে আমিই তাকে পেতে চাইছি। তবে আর সে আমাকে ছেড়ে পালাবে কোথায়? যেখানে যাবে সেখানেই যে আমি। যারই ভালবাসা পাক্ না কেন তাতেই যে আমার ভালবাসার স্পর্শ। হায়! নিজের বেদনা এড়াতে গিয়ে তাদের হৃদয়ে কেমন করে বেদনা হানব।

: শ্রীমতী, এই বৃন্দাবনে তোমার প্রেমের কাছে আমার হৃদয় চিরদিনই আবদ্ধ থাকবে। কিন্তু আমার দেহকে এই দেশকালের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করে রেখো না। আমায় ডাকছে মথুরা, ডাকছে কুরুক্ষেত্র, ডাকছে

দ্বারকা-প্রভাস। রাধা, আমায় বিদায় দাও, মুক্ত কর প্রতিজ্ঞাবন্ধন থেকে।

অশ্রুপূর্ণ নয়নে আকুলকণ্ঠে শ্রীমতী বলল—হে নাথ, আমি যে তোমারি। আমার সব কিছুই তোমার—ইচ্ছা-অভিলাষ, প্রেম-প্রীতি—সবই তোমার। স্বতন্ত্র করে কোনো ইচ্ছাই আর রাখবো না। হে জীবনের অধীশ্বর, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক্। প্রেমের বক্ষ বিদীর্ণ করে চলে যাক্ তোমার বিদায়ের রথচক্র।

আর সঙ্গে সঙ্গেই ছিন্ন হল শ্রীমতীর স্বপ্নাবেশ। কেটে গেল তন্দ্রাঘোর। চমকে উঠে পাশে তাকাতেই দেখল কেউ নেই সেখানে। শুধু অপরিসীম শূন্যতা ভরে আছে তার দেহ-সুরভিতে।

হায়! আমি কি করেছি—কি করেছি! মোহের ঘোরে বিদায় দিয়েছি তাকে। ক্ষণিকের ভ্রান্তিতে আপনার হৃৎপিণ্ড আপন হাতে ছিন্ন করেছি।

আশেপাশে নিদ্রামগ্ন সখীরা। যেন শতদলের ছিন্ন দলগুলি ছড়িয়ে আছে চারদিকে।

শ্রীমতী ব্যাকুলতাভরে উঠে দাঁড়াল—খুলে দিল পূর্ব-বাতায়ন। বাইরে উষার অস্পষ্ট আলোকে প্রভাতের প্রথম পাখি আর্ত কণ্ঠে ডেকে উঠল। রাত্রি কেটে গেছে। এসেছে নিদারুণ প্রভাত। ঘনিয়ে এসেছে তার বিদায়ের লগ্ন। আশংকার উত্তেজনায় কম্পিত হতে লাগল শ্রীমতী। সখীদের ঠেলে ঠেলে ত্বরিতে জাগাতে লাগল।

ঃ ওঠো সখি, জাগো। সর্বনাশ হয়েছে। বিদায় নিয়েছে প্রাণ-বল্লভ। শত ধিক আমাকে। মোহাচ্ছন্ন হয়ে আমি তাকে হারালাম।

তীক্ষ্ণ শায়কের মত প্রাণে প্রাণে গিয়ে বিঁধল শ্রীমতীর আত্মধিক্কার। নয়ন মার্জনা করতে করতে তাড়াতাড়ি উঠে বসল সখীরা। উদ্বেগে আকুল হয়ে তাকাতে লাগল শ্রীমতীর মুখের পানে। চেষ্টা করল তার কথার মর্ম-গ্রহণ করতে।

দ্বারের পানে এগিয়ে চলল শ্রীমতী। যেতে যেতে বলল—সখি, নষ্ট করার মত সময় আর একটুও নেই। আমি চলেছি তার কাছে। রথ কারু জন্যে অপেক্ষা করবে না, ছুটে যাবে আপন গতিতে।

দ্বারের কাছে মায়া তাকে বাধা দিতে চেষ্টা করল।

ঃ শ্রীমতী, এমন পাগলিনীর মত কোথায় চলেছ তুমি। যে-প্রেম সম্বন্ধে

গোপন করে রেখেছ তোমার মনে, তাকে কি দিনের আলোয় সকলের মাঝখানে টেনে নিয়ে যাবে? নিন্দাভাজন হবে কি তুমি সকলের?

শ্রীমতী কারু বাধা মানল না। সখীদের দুহাতে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে উন্মুক্ত দ্বারপথে ছুটে বেরিয়ে গেল। ছুটে চলল প্রাঙ্গণ পার হয়ে।

সখীরা ছুটে চলল পেছনে। মিনতি করে বলতে লাগল—যেও না শ্রীমতী, যেও না তুমি। তোমার হয়ে যেতে দাও আমাদের! আমরাই ফেরাবো বৃন্দাবন-চন্দ্রকে।

কোনো কথাই যেন কানে যাচ্ছে না শ্রীমতীর। সে আত্মহারা হয়ে ধেয়ে চলেছে। আঁচল খসে পড়ে লুটাতে লুটাতে যাচ্ছে। খসে পড়েছে বেণীর বন্ধন। একে একে খসে যাচ্ছে সমস্ত দেহের পুষ্পাভরণ। যেন সমাজ-সংসারের সকল লোকাচারের বন্ধন খসে খসে পড়ছে।

শ্রীমতী নেমে এসেছে বৃন্দাবনের পথে। ছুটে চলেছে উন্মাদিনীর মত। ফেরাতে না পেরে সখীরাও ছুটে চলেছে সাথে সাথে।

: ফেরো শ্রীমতী, ফেরো। বিশ্বের চোখে নিজেকে তুমি কেন কলংকিনী সাজাতে চাও।

কিন্তু তাকে হারাবার চেয়ে কি কলংকের ভয় বেশি হতে পারে। তাই শ্রীমতী দ্বিধাহীন—বাধাহীন তার হৃদয়।

অদূরে দেখা যাচ্ছে পুলিনশালিনী যমুনা। তার শীতল জলে স্নান সেরে সূর্য তখন সবে দিগন্তের সিংহাসনে উপবেশন করেছে। তার দাক্ষিণ্যের শতধারায় বালুকারাশি উদ্ভাসিত। শ্রীমতী এগিয়ে চলল। সাথে সাথে চলল সখীরা।

যমুনাপুলিনে আজ বহু জনতার সমাবেশ। এসেছেন নন্দ-যশোদা তাঁদের অনুচর-পরিজন নিয়ে। এসেছে স্নেহশীলা গোপরমণীবৃন্দ। এসেছে রাখাল-সখাগণ। ধেনুবৎসগুলি দাঁড়িয়ে আছে দলে দলে। তাদের মাঝখান দিয়ে সজ্জিত রথ এগিয়ে চলেছে কৃষ্ণ-বলরামকে নিয়ে।

ছুটে আসতে আসতে শ্রীমতী আর্তনাদ করে উঠল—যেও না, ওগো যেও না। আমি তোমাকে কিছুতেই বিদায় দিতে পারব না।

প্রতিধ্বনির মত সখীদের কণ্ঠ শোনা গেল—না না, যেও না ব্রজরায়—যেও না গোকুলচন্দ্র। ফিরে এসো।

রথ ততক্ষণে যমুনার তীর ধরে দ্রুতবেগে ছুটে চলেছে। তার গতিশীল চক্রের ঘর্ঘর ধ্বনির সঙ্গে মিশে যেন কোন্ মধুর আশ্বাসবাণী ভেসে এলো—আমি আবার আসব। আমার হৃদয়ের সবটুকু ভালবাসা রেখে গেলাম এখানে।

ক্ষণিকের জন্য নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল শ্রীমতী। তার অসহায় বাহু দুটি শূন্যপানে প্রসারিত হয়ে বারেক যেন কাকে আশ্রয় করতে চাইল। পরক্ষণেই লঘুভার দেহখানি নিরালম্ব লতিকার মত লুটিয়ে পড়ল গমনপথের চক্রচিহ্নের উপর।

অশ্রুধারার চিহ্ন আননে এঁকে সখীরাও বসে পড়ল শ্রীমতীর চারপাশে। সকলেই নীরবে দেখছে সেই করুণ দৃশ্য। যেন চিত্রার্পিত অসহায় বেদনা। যেন মূর্ছাহত দীর্ণ অনুরাগ।

শ্রীমতীর গুপ্ত প্রেম আজ অনাবৃতরূপে ব্যক্ত করেছে নিজেকে। কিন্তু নিন্দার বাণী আজ আর জাগছে না কারু কণ্ঠে—কোনো দৃষ্টিতেই ফুটছে না অভিযোগের আভাস।

সকলেই তাকিয়ে আছে ভূলুণ্ঠিতা শ্রীমতী আর তার সখীদের পানে। প্রাণ যেন দেহ ছেড়ে চলে গেছে, তাই দেহ নিশ্চল। সুরভি যেন ছেড়ে গেছে কুসুমকে, তাই ধূলিতলে ঝরে পড়েছে নিরাশ কুসুম। ছিন্ন হয়ে গেছে যেন বীণার তার, তাই সহসা স্তব্ধ হয়ে গেছে রাগিণী—হারিয়ে গেছে সুর।

জনতার মধ্য দিয়ে পথ করে এগিয়ে এলেন নন্দরাণী যশোদা। তাঁরও দুটি আঁখি অশ্রুধারা-প্লাবিত। এগিয়ে এসে সস্নেহে শ্রীমতীর মাথাটি তুলে নিলেন নিজের কোলে। মনে মনে বললেন—বাছা আমার, তোর অশ্রুতে আমার অশ্রু মিশে গেছে। তোর বেদনায় মিলে গেছে আমারও বেদনা।

একে একে সকলেই এসে ঘিরে দাঁড়াল অচেতন শ্রীমতীকে। এলো ধেনু-বৎসগুলিও। সকলেরই মনে যে আজ হারাবার বেদনা। রাখালেরা হারিয়েছে তাদের সখাকে। ধেনুবৎস হারিয়েছে তাদের প্রভুকে। বড়িমা এসে বসলেন শ্রীমতীর পায়ের কাছে। তিনিও হারিয়েছেন তাঁর ভগবানকে। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য—সব রস আজ এসে সম্মিলিত হল মধুর রসে—পরিণত হল এক সুদুর্লভ প্রেমে, যে প্রেম সর্বসাধ্যসার।

'এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্যা
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়—
ত্যুন্মাদবৎ নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥'

—শ্রীমদ্ভাগবত॥ ১১।২।৩৮

চোদ্দ

এই তার জীবনের ব্রত প্রিয়নাম সতত কীর্তন।
অনুরাগ জেগে রয় প্রাণে বিগলিত হয়ে যায় মন॥
কখনো বা হাসে আর কাঁদে, কখনো বা নাচে গান গায়।
উন্মাদের মত আচরণ লোকলাজ নিয়েছে বিদায়॥

রথ চলে গেছে বৃন্দাবনের হৃদয়কে দ্বিধা-বিদীর্ণ করে। কেঁদেছিল বুঝি বৃক্ষলতাগুলি, তাই খসে পড়েছে পাতা—ঝরে গেছে ফুল। কেঁদেছিল বৃন্দাবনের বিহঙ্গকুল, তাই আজ বেদনায় রুদ্ধকণ্ঠ তারা।

বাঁশী আর বাজে না। ধেনুগুলি আর গোঠে যায় না আনন্দভরে। গোচারণে গিয়েও নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। কান পেতে রাখে এক পরিচিত বংশীধ্বনি শুনবার জন্যে। শ্যামলী ধবলী মথুরার পথে ছুটে যেতে চায়।

ভবনে ভবনে আজ বিষাদের ছায়া। গৃহকাজ করতে করতে সহসা থমকে যায় গোপরমণীগণ। থেমে যায় তাদের হাত। অশ্রু জমে ওঠে দুচোখে।

নন্দরাণীর গৃহে আজ কোলাহল নেই। স্তব্ধ হয়ে গেছে মন্থনদণ্ড। রন্ধনশালার অগ্নি স্তিমিতশিখা। কি হবে দধি-দুগ্ধ-ঘৃত-ঘোলে? কে খাবে ক্ষীর-সর-নবনী? মনে পড়ে কতদিনের কত কথা। সেই শৈশবের চপলতা—সেই চুরি করে খাওয়া ক্ষীর-নবনী। ইচ্ছে করে ধরা দেওয়া

মায়ের হাতে—কতবার শাস্তি ভোগ করা স্বেচ্ছায়। বসে বসে শুধু কাঁদেন যশোমতী।

সুবল সুদাম মধুমঙ্গল বার বার ভুল করে। গোচারণে যাবার আগে ভুল করে ডাকতে যায় কৃষ্ণ-কানুকে। পা বাড়ায় নন্দভবনের পানে। ভুল বুঝতে পেরে নতমুখে ফিরে আসে অর্ধপথ থেকে। গোষ্ঠে গিয়ে ভুল করে বার বার ডাকে কৃষ্ণ-সখাকে। তারপর পরস্পরের পানে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

শ্রীমতীর সখীগণ বার বার এসে দাঁড়ায় যমুনার কূলে—তাকায় পথের দিকে। কোথায় সে চক্রচিহ্ন? সে বুঝি এখনো জেগে আছে পথের বুকে। জেগে আছে হৃদয়ে হৃদয়ে। ও চিহ্ন বৃন্দাবনের জীবন থেকে কোনোদিন মিলাবে না। সখীরা অশ্রু বিসর্জন করে- যেন অশ্রুজলে সে চিহ্ন ধুয়ে-মুছে দিতে চায়। পরস্পরকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে আরও আকুল হয়ে কাঁদে তারা।

আর শ্রীমতী রাধা। প্রেমের অভিশাপে সে বুঝি আজ অহল্যার মত পাষাণী হয়ে গেছে। সুখ-দুঃখ, ভাল-মন্দ, অনুতাপ-অনুভূতি—সবকিছু হারিয়েছে সে। নয়নে নেই অশ্রুবিন্দু। হৃদয়ানলের অসহ উত্তাপে যেন তার সবটুকু শুষ্ক হয়ে গেছে। সে অনল ধীরে ধীরে পান করছে তার দেহ-লাবণী—তার নয়নের দীপ্তি—তার অধরের লালিমা। পান করছে তার কুন্তলের মসৃণতা—চরণের পেলবতা—ললাটের গরিমা। শ্লথ হয়ে খসে গেছে দুহাতের মণি-বলয়।

জড়িমাদশায় আচ্ছন্ন হয়েছে শ্রীরাধা। কথা বলতে পারে না সে। বুঝি ভাবতেও পারে না। বুঝতে পারে না সে হাসবে কি কাঁদবে। মরতে চায়, না বাঁচতে চায় সে—তাও বুঝতে পারে না। জীবন-চেতনা হারিয়ে ফেলেছে শ্রীমতী রাধা।

শ্রীমতীর দশা দেখে নিজেদের দুঃখ ভুলে গিয়েছে সখীরা। অসহ উৎকণ্ঠা তাদের প্রাণে। তারা জানে কান্না ছাড়া এর কোন প্রতিকার নেই। কেন কাঁদতে পারছে না শ্রীমতী। কেন আর্তনাদ করে উঠছে না বক্ষভেদী বেদনায়।

কাঁদো শ্রীমতী, তুমি কাঁদো! শ্রাবণ-গগনের ঘনীভূত মেঘের মত

তোমার পুঞ্জ পুঞ্জ বেদনাকে শতসহস্র অশ্রুধারায় গলিয়ে ঝরিয়ে তুমি কাঁদো। জীবনের শূন্য পাত্রখানিকে প্রাণ-নিংড়ানো তীব্র দ্রাক্ষারসে পরিপূর্ণ করে তুমি কাঁদো—কাঁদো।

শ্রীমতীর কাছে বসে বসে শুধু কৃষ্ণপ্রসঙ্গ আলোচনা করে সখীরা। বিগতদিনের সুখস্মৃতিগুলোকে বার বার টেনে টেনে আনে অতীতের গুহাগর্ভ থেকে। যদি সেই স্মৃতির আঘাত শ্রীমতীকে কাঁদাতে পারে। যদি জাগাতে পারে তার জীবন-চেতনা।

ঃ শ্রীমতী, মনে পড়ে কি তোমার সেদিনের সেই কথা। দধি-দুগ্ধের পশরা সাজিয়ে বড়িমার সঙ্গে আমরা চলেছিলাম মথুরার হাটে বিক্রয় করবার জন্যে। যমুনার তীরে এসে দেখা গেল না কোন তরী—দেখা গেল না নাবিক।

তুমি উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলে। কি করে যমুনা পার হব। বুঝি নষ্ট হয়ে যাবে সব সামগ্রী।

ঠিক সেই সময়—মনে পড়ে কি তোমার সখি—দূরে দেখা গেল একখানা সুন্দর তরী। আর দেখা গেল তার হাল ধরে দাঁড়িয়ে আছে এক নবীন নাবিক।

ললিতা বলেছিল—এমন সুন্দর নাবিক তো এ ঘাটে আর কখনো দেখিনি। বড়িমা, তুমি বলেছিলে—নাবিক শুধু সুন্দর নয়, রসিকও বটে। দেখ, কেমন বাঁকা চোখে আমাদের শ্রীমতীর দিকে বার বার তাকাচ্ছে। বড়িমার কথা শুনে তুমি নাবিকের দিকে ভাল করে তাকিয়েছিলে শ্রীমতী, বলেছিলে—বড়িমা, নাবিককে যেন কেমন চেনা চেনা মনে হচ্ছে।

তরী ততক্ষণে অনেকটা এগিয়ে এসেছিল। আমরা নিরীক্ষণ করতেই বুঝতে পেরেছিলাম। আমাদের সেই নিত্যলীলাময় গোকুলচন্দ্রই সেজে এসেছে নাবিকের ছদ্মবেশে। সখি শ্রীমতী, সে নাবিকবেশ শুধু তোমার জন্যে। আমাদের বিপন্ন দেখে নাবিক হয়ে সে খেয়াতরীর হাল ধরেছিল, পৌঁছে দিয়েছিল পরপারে।

হায়! শ্রীমতীর হৃদয়রঞ্জন সেই শ্যামলকিশোর আজ কোথায়?

কাঁদতে লাগল সখীরা। কিন্তু শ্রীমতীর দেহ অবিচল। অশ্রু নেই তার নয়নে।

ঃ আর একদিনের কথা মনে আছে কি তোমার সখি। গুরুভার পশরা

বহন করে রৌদ্রতপ্ত পথে যেতে যেতে আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। সবচেয়ে শ্রান্ত হয়েছিলে তুমি। পশরা আর বয়ে নিয়ে যেতে পারছিলে না, চলছিল না আর কোমল চরণ দুখানি। সেদিনও তোমায় বিপন্ন দেখে সে এসে দেখা দিয়েছিল। ভারবাহীর ছদ্মবেশে বহন করেছিল তোমার পশরাভার। শ্রীমতী, তোমার জন্যে কিছুতেই তার দ্বিধা ছিল না। তাই আর একদিন প্রখর মধ্যাহ্নকালে তোমার মস্তকে ছত্রধারণ করে সে তোমার সন্তাপ হরণ করেছিল। তার সে করুণাও তো ভুলবার নয় সখি।

ঈষৎ কম্পিত হল শ্রীমতীর দেহ, নত হল তার দৃষ্টি। তারপর ধীরে ধীরে মুদ্রিত হয়ে এল দুটি আঁখিপল্লব। বুঝি কোন স্মৃতির অতলে তলিয়ে গেল সে।

: শ্রীমতী, তুলনা নেই তার অনুরাগের। ভেবে দেখ আর একদিনের কথা। সেদিন তুমি তার বিলম্ব দেখে অভিমান করে বসেছিলে। সে এসে কত না মিনতি জানিয়েছিল—সেধেছিল কতবার। বুঝি কেঁদেও ছিল। তবু দুর্জয় অভিমান ত্যাগ করনি তুমি, করনি প্রসন্ন নেত্রপাত। তখন সেই প্রেমিক কান্ত তোমার মার্জনা ভিক্ষা করে দুই হাতে তোমার পদযুগল জড়িয়ে ধরেছিল।

জল গড়িয়ে পড়তে লাগল শ্রীমতীর মুদ্রিত নয়ন থেকে, অস্ফুট কণ্ঠে মোহাবেশে বলল—সখি, আমার চরণ ছেড়ে দিতে বলু। পাশে এসে বসতে বলু তাকে।

উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল সখীদের রোদন।

: হায় আত্মবিস্মৃতা, হায় মুগ্ধা, কোথায় সে প্রাণ-বল্লভ। সে যে চলে গিয়েছে আমাদের ত্যাগ করে।

নয়ন মেলে তাকাল শ্রীমতী। তাকাল নিজ পদতলে। কেউ কোথাও নেই। সব শূন্য স্বপ্ন—মিথ্যা মরুমায়া।

দীর্ঘ নিঃশ্বাসে কেঁপে কেঁপে উঠল শ্রীমতীর দেহ। স্মৃতির চরণস্পর্শে যেন উদ্ধার হল পাষাণী কন্যা। বক্ষে করাঘাত করে বলল—কি কঠিন প্রাণ আমার। কেন সে চলে গেল না তার সাথে সাথে। এই বিফল জীবন বহন করে কেন আমি এখনও বেঁচে আছি। কঠোর বক্ষ আমার। এখনও সে কেন বিদীর্ণ হচ্ছে না। নির্লজ্জ প্রাণ এখনও কেন আঁকড়ে আছে তুচ্ছ দেহকে।

অবিরল অশ্রুধারা নেমে এলো বাঁধভাঙ্গা প্লাবনে।

বৃন্দা জড়িয়ে ধরল শ্রীমতীর গলা। বেদনাময় স্বরে বলল—সখি, সে যে বলে গেছে আবার আসবে। এই আশ্বাসটুকু সম্বল করেই যে আমাদের জীবনধারণ করতে হবে শ্রীমতী। শূন্যতার বেদনা অন্তরে বহন করেই তার জন্যে করতে হবে অনির্দিষ্ট প্রতীক্ষা। একদিন তাকে ফিরে আসতেই হবে। কিন্তু তার আগে তুমি আরো কাঁদো—আরো কাঁদো শ্রীমতী। আমাদের মিলিত অশ্রুধারা ওই রথচক্র-চিহ্ন অবলম্বন করে ছুটে যাক্ মথুরার পানে—চুম্বন করুক তার চরণ-যুগল—স্মরণ করিয়ে দিক আমাদের মর্মবেদনার কাহিনী।

বার বার তাকাচ্ছে শ্রীমতী, বার বার মুদ্রিত করছে আর্ত নয়ন। শতদিক থেকে শত স্মৃতি এসে মর্মে দংশন করছে। তাকালো সে আকাশের পানে। সেখানে যে ভেসে বেড়াচ্ছে কৃষ্ণ মেঘরাশি—স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে তার নাম। সেদিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে তাকাল সুদূর দিগন্তে। সেখানে যে ফুটে আছে তার দেহ-নীলিমা। দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে এলো সুমুখের উদ্যানে। সেখানে তরুণ তমালে যে তার ত্রিভঙ্গ-বংকিম-ঠাম। কোন্‌দিকে তাকাবে শ্রীমতী। সূর্যালোকে তার হাসি, কুসুমে তার মাধুরী—তৃণদলে তার সজীবতা। শুধু স্মৃতি আর বেদনা। বেদনা আর দহন।

আপনার পানে তাকাল শ্রীমতী। প্রতি অঙ্গে যে জড়িয়ে আছে তার স্পর্শস্মৃতি—প্রেমের স্বাক্ষর।

নয়ন মুদ্রিত করল অবশেষে। দৃষ্টিকে গোপনে ঢেকে রাখতে চাইল আপন অন্তরের আড়ালে। কিন্তু সেখানেও যে শ্যামস্মৃতি। সেই রাসলীলা—সেই যমুনা-বিহার—সেই মিলন—সেই অভিসার।

বিহ্বল হয়ে চোখ খুলে ফেলল আবার। হায়! তার অন্তরে স্মৃতি বাহিরে স্মৃতি। চারিদিক থেকে প্রতি মুহূর্তে ছুটে আসছে তীক্ষ্ণ স্মৃতির শায়ক। কোথায় পালাবে—কোথায় লুকাবে তুমি শ্রীমতী।

শরণ নিতে পার একমাত্র তারই স্মৃতির চরণে।

কখনো হাসছে, কখনো কাঁদছে শ্রীমতী। মাঝে মাঝে সব স্বপ্ন বলে মনে হচ্ছে। সেই বিদায় গ্রহণ—সেই মথুরা যাত্রা—ঘূর্ণিত ধাবিত রথচক্রের ক্রম-বিলীয়মান ছবি—এই বেদনা, এই রোদনের অশ্রু হাহাকার—সব স্বপ্ন বলে মনে হচ্ছে। শ্রীমতীর মগ্ন চেতনায় যেন পলকে মিলিয়ে যাচ্ছে বৃন্দাবন আর

মথুরার দীর্ঘ ব্যবধান। কৃষ্ণকে নিজের পাশাপাশি বলে মনে হচ্ছে। ঘুচে যাচ্ছে সব বিচ্ছেদ—সব অন্তরাল। অমনি হেসে উঠছে শ্রীমতী রাধা, দুহাতে জড়িয়ে ধরতে যাচ্ছে প্রিয়তমের রাতুল চরণ।

কিন্তু শূন্যতায় প্রতিহত হয়ে এলিয়ে পড়ছে তার নিরাশাক্লান্ত বাহু। ভেঙ্গে যাচ্ছে আনন্দচেতনা। বৃন্দাবন থেকে মথুরার ব্যবধান দ্বিগুণিত হয়ে যাচ্ছে। দেশকালের কতশত অন্তরাল দুজনার মাঝখানে দাঁড়াচ্ছে এসে। হৃদয় ভরে উঠছে সুদীর্ঘতম বিচ্ছেদের বেদনায়। মুহূর্তকাল পূর্বের হাসি আকুল কান্নায় রূপান্তরিত হচ্ছে।

এমনি করে কখনো হাসছে, কখনো কাঁদছে শ্রীমতী। কখনো বা ভাবছে, ছলনা করে লুকিয়ে আছে চতুর কানাই। লুকিয়ে আছে বৃন্দাবনের কুঞ্জ-কাননে—তরুলতার অন্তরালে। বিরহের বেদনা-দহনে মিলনের মাধুরীকে গভীরতম করবার জন্যে সে লুকিয়ে আছে। বিচ্ছেদের শূন্যতা দিয়ে অনুরাগকে পূর্ণতম করবার জন্যে আত্মগোপন করেছে সে।

খুঁজে বের করতে হবে তাকে। খুঁজতে হবে আঁতিপাঁতি করে। খুঁজতে হবে কুঞ্জে কুঞ্জে, অরণ্যে প্রান্তরে, যমুনাসৈকতে।

পরক্ষণেই আবার ভাবছে, হায়! কি হবে বৃথা সন্ধানে। কত গিরি-নদী অতিক্রম করে চলে গেছে তার রথ। গেছে বৃন্দাবন হতে মথুরায়—এক প্রেম হতে অন্য প্রেমে। আর কি সে ধরা দেবে এ দুটি বাহুর বন্ধনে? আর কি এ তৃষিত হৃদয়খানি নিক্ষেপ করা যাবে তার চরণপ্রান্তে? হায়! সে নেই—সে নেই।

পেলে তাকে হারাতে হয়, আবার না হারালে তাকে পাওয়া যায় না।

হৃদয়ের ব্যথা হৃদয়ে চেপে রেখে পরস্পর যুক্তি করে সখীরা। জাগিয়ে রাখতে হবে শ্রীমতীর অন্তরের বেদনা। বেদনাহারা হলেই হবে সে চেতনা-হারা—হবে নির্বাক নিরাসক্ত প্রস্তরীভূত উদাসীন। তাই চলো সখি, শ্রীমতীকে আমরা নিয়ে যাই বৃন্দাবনের প্রতিটি স্মৃতি-তীর্থে—নন্দ-নন্দনের প্রতিটি লীলাক্ষেত্রে।

প্রথমেই নিধুবন। সেই সুরম্য বনস্থলী, যেখানে একদিন হোলি উৎসবে মেতেছিল কৃষ্ণ-রাধা আর উভয়ের সখা-সখীগণ।

: সখি শ্রীমতী, একবার ভাল করে চেয়ে দেখ আমরা কোথায় এসেছি। কোমল কণ্ঠে বলল রত্নলেখা।

চারিদিকে তাকাল শ্রীমতী। এ যে সেই উদ্যানবাটিকা—সেই দোলমঞ্চ। সব কথা মনে পড়ল একে একে। সেই মধুবসন্ত—সেই বর্ণসমারোহ—সেই রঙে রঙে রঙীন ভুবন। বসনে রঙ—বদনে রঙ, সর্বাঙ্গে বিচিত্র রঙের সমাবেশ। যেন হৃদয়ের রঙে সবকিছু রেঙে গিয়েছিল।

মিনতি জানিয়েছিল শ্রীমতী—হে লীলাময়, দয়া করে আমার নয়ন দুটিতে আবীর দিও না, তাদের মুক্তি দাও। নইলে আমি তোমার পানে চাইব কেমন করে, কেমন করে দেখব তোমার রঙের লীলা।

সে বলেছিল—আমার রঙের লীলা যদি দেখতে চাও, তবে নয়ন দুটিকেই রঙীন কর শ্রীমতী। আর নয়ন যদি রঙীন করতে হয় তবে হৃদয় রঙীন কর।

সেই রঙ বুঝি আজও ছড়িয়ে আছে এখানে আকাশে বাতাসে—বুঝি লেগে আছে আজও এখানকার তৃণে পল্লবে কুসুমে মুকুলে। সেই রঙ এসে বুঝি স্পর্শ করেছে শ্রীমতীর দেহাবরণ।

আর্তনাদ করে উঠল শ্রীমতী—হায়! আমার বসনখানি যে রঙে রঙে রঙীন হয়ে উঠল। এ বসন নিয়ে কেমন করে সকলের সামনে গিয়ে দাঁড়াব।

সান্ত্বনা দিল তাকে ললিতা—ভয় নেই শ্রীমতী, ভয় নেই। রঙীন বসন তো তোমার একার নয়, আমাদের সকলের বসনই যে রঙীন হয়ে গেছে।

সামনে এগিয়ে গেল চিত্রগন্ধা।

ঃ দেখ সখি দেখ, এই যে এখানে সেই কদম্ব তরু—এই যে তার শাখাতে বাঁধা পুষ্পদোলা।

ছুটে গেল শ্রীমতী। এগিয়ে গেল সখীরা। মন্থর পবনে পুষ্পদোলা এখনও ধীরে ধীরে দুলছে—ঝরে ঝরে পড়ছে কদম্বকেশর। পরাগরেণু ডানায় মেখে উড়ে বেড়াচ্ছে ভ্রমর আর প্রজাপতির দল।

আবেগ-কম্পিত অধর একবার মুক্তাদন্তে দংশন করে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে শ্রীমতী বলল—ওরে ভ্রমর, কাকে আর খুঁজে বেড়াচ্ছিস্। মাধব যে চলে গেছে বৃন্দাবন ছেড়ে।

নয়ন মার্জনা করে তাকালো পুষ্পদোলার পানে। এই দোলায় কতবার একসাথে দুলেছে দুটি দেহ আর একটি প্রাণ। সখীরা তালে তালে করতালি দিয়েছে। গান গেয়েছে সুদেবী, ভদ্রা, মধুমঞ্জরী।

কি আনন্দ দোলায় দুলেছে অঙ্গে অঙ্গে প্রতি অণু-পরমাণু। দুলেছে অঞ্চল, দুলেছে কণ্ঠের বনমালা। দুলেছে তরুলতা, গগন পবন—জীবনমৃত্যু।

এ প্রমত্ত দোলায় যে দুলিয়েছিল সে আজ কোথায়? যারা দুলেছিল আকুল পুলকে আমি কি তাদের কেউ? কৃষ্ণ যদি মথুরায়, শ্রীমতী কি থাকতে পারে বৃন্দাবনে। সে গেছে সাথে সাথে। আমি বুঝি শ্রীমতীর ছায়াখানি—ঘুরে বেড়াই কৃষ্ণছায়ার অন্বেষণে।

আকুল নয়নে চারিদিকে তাকাতে লাগল শ্রীমতী। বিবশ চরণে চলতে গিয়ে বার বার পতনোন্মুখ হল। ললিতা আর বিশাখার কাঁধে দেহভার এলিয়ে কোনমতে মাধবীকুঞ্জের কাছে এগিয়ে গেল বিরহিনী।

: সখি ললিতা এই তো সেই মাধবীতরু, যার তলায় প্রিয়তম আমার জন্য বসে থাকত—আমার আশাপথ চেয়ে থাকত ধ্যানের প্রতীক্ষা নিয়ে। ফুল তুলে তুলে মালা গাঁথত, তারপর পরিয়ে দিত আমার গলায়। যে প্রেমে ছিল এত সোহাগ, সে প্রেমে আজ এত বিস্মরণ কেন। গভীর আনন্দের আড়ালে কোথায় কেমন করে লুকিয়ে ছিল এই তীব্র বেদনা।

করুণ বিলাপ করতে লাগল শ্রীমতী। প্রকৃতির পানে তাকিয়ে এক একবার সহানুভূতি প্রকাশ করতে লাগল তার বেদনায়। আহা! কত না অসহ্য বেদনা তোদের, ওরে বনের কুসুমকলি, প্রভাতে প্রিয়তম বনমালীকে দেখবার জন্যে নয়ন মেলে তাকে আর দেখতে পেলি নে। হায়রে মুগ্ধ কোকিল, তোর আকুল সুরের শত আহ্বানেও সাড়া পেলি নে তার বাঁশীর পঞ্চম তানের। আহা! কত না দীর্ঘশ্বাস ফেলছিস্ তুই দক্ষিণ সমীর, তবু ফেরাতে পারছিস না তাকে।

পরক্ষণেই আবার ভর্ৎসনা করে শ্রীরাধা।

ধিক্ তোদের কুসুমরাজি, সে চলে গেছে বৃন্দাবন ছেড়ে, তবু তোরা কোন্ আনন্দে আজও ফুটে উঠছিস্। ওরে বৃন্দাবনের কোকিল, ধিক তোকে। তাঁর বাঁশরী নীরব হয়ে গেছে, তবু তোর কণ্ঠে আজও পঞ্চম তান। আর দক্ষিণ সমীর,- তোকেও ধিক। তার চারু অঙ্গ স্পর্শ করতে না পেরেও কেন অকারণে প্রবাহিত হচ্ছিস্।

না না, তোদের কেন ধিক্কার দিচ্ছি। শতধিক্ আমাকে—আমার নয়ন-যুগলকে। প্রিয়-বিরহিত বৃন্দাবনের দৃশ্য দেখবার আগে কেন সে অন্ধ হল না।

দুর্বার হয়ে উঠল শ্রীমতীর শোক। সান্তনা দিতে এগিয়ে আসছিল কোনো কোনো সখী। ললিতা তাদের বাধা দিল—কাঁদুক শ্রীমতী, আরো কাঁদুক। কাঁদতে দাও তাকে। একমাত্র কেঁদে কেঁদেই যদি ফুরিয়ে ফেলা যায় জীবনের সব কান্না। বর্ষাঋতু সমাপন হলে তবেই যদি ফোটে শরতের হাসি। সুদীর্ঘ নিশি উদ্‌যাপন করতে পারলে তবেই যদি পাওয়া যায় প্রভাতের আলো।

পাগলিনীর মত ছুটে বেড়াতে লাগল শ্রীমতী। ঘুরতে লাগল স্থান হতে স্থানান্তরে। যমুনা-সৈকতে যে রাসভূমি একদিন আনন্দের তীর্থভূমিতে পরিণত হয়েছিল, সে যেন আজ পরিত্যক্ত মরুবালুকার শ্মশানভূমি।

সেই বালুকার পরে শ্রীমতী বসে পড়ল নতজানু হয়ে—নত নয়নে চারিদিকে তাকাতে লাগল সতর্কতাভরে। এই বালুকার অন্তরালে কোথাও কি এখনও জেগে আছে তার পদচিহ্ন—তার দেহসুরভি কি এখনও জড়িয়ে আছে এ আকাশে—এ বাতাসে। ছুটে গেল যমুনার সলিলপ্রান্তে। এ তরঙ্গমালা এখনও বহন করে আনছে তার অঙ্গস্পর্শ।

সেই স্পর্শ পাবার জন্য শ্রীমতী দুবাহু প্রসারিত করে ঝাঁপিয়ে পড়তে গেল যমুনাবক্ষে। বিরজা আর ইন্দুলেখা ধরে ফেলল তার দুবাহু। ললিতা বলল—সখি এখানে তো শ্যাম নেই। চল, দেখি ওই নিকুঞ্জ কাননে, যেখানে সে রাস-মণ্ডল ছেড়ে প্রবেশ করেছিল তোমাকে নিয়ে।

ছুটে গেল শ্রীমতী বনের অন্তরালে। একে একে গিয়ে দাঁড়াতে লাগল অশোক কদম্ব কিংশুক তমালের কাছে। প্রশ্ন করতে লাগল প্রতি বৃক্ষলতাকে —পশু পাখি কীট পতঙ্গকে—ওগো; তোমরা কি জান কোথায় লুকিয়ে আছে আমার জীবনকান্ত। বলে দাও, কোন পথে গেলে পাব তার সন্ধান।

কেউ উত্তর দিলে না। শুধু যমুনার আকুল তরঙ্গরাজি এসে আছড়ে পড়ল উপকূলে। বিধুর সমীরণ হাহাকার করে উঠল।

: ওগো মল্লিকা-মালতী-মন্দার, ওগো শিরীষ-সপ্তপর্ণ-সিন্ধুবার, বলে দাও কোথায় পাব আমার প্রিয়তমের সন্ধান।

মর্মরগুঞ্জনে কেঁদে উঠল তরুলতাগুল্ম। খসে পড়ল পাতা—ঝরে গেল ফুল। দূরে কোথায় ক্লান্ত কপোত ডেকে উঠল।

: এই তো সেই চম্পকতরু। এরই শাখা অবলম্বন করে একদিন দাঁড়িয়েছিল আমার প্রাণারাম। হয়তো এরই কাছাকাছি কোথাও সে আছে।

ওরে চম্পক, বল কোথায় লুকিয়ে রেখেছিস্ গোকুলচন্দ্রকে। আমায় দয়া কর।

আত্মহারা শ্রীমতী লুটিয়ে পড়ল চম্পক-তরুমূলে—দুহাতে বুঝি ধরতে চাইল তার চরণ।

অশ্রুমুখী বিশাখা শ্রীমতীর মস্তক কোলে তুলে নিল, বলল—হায় সখি, বৃথা এ অনুনয় তোমার। শ্যাম তো লুকিয়ে নেই এখানে—লুকিয়ে নেই সে বৃন্দাবনে কোথাও।

উঠে বসল শ্রীমতী। নীরবে কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করে নিয়ে বলল—ঠিকই বলেছ বিশাখা, সে লুকিয়ে আছে আরো গভীরে। তবে খুঁজে দেখি আমার নীলাঞ্চলপ্রান্ত, আমার কৃষ্ণকেশরাশি, আমার কণ্ঠের অপরাজিতা মালা।

ছিঁড়ে ফেলল অঞ্চল প্রান্ত। প্রতি সূত্রের সংযোগস্থলে খুঁজতে লাগল সেই নীলমণিকে। ছিঁড়ে ফেলল অপরাজিতামালা। প্রতি ফুলের পরতে পরতে খুঁজতে লাগল শ্যামল কিশোরকে। দুহাতে ছিন্ন করতে লাগল এলায়িত কৃষ্ণকুন্তল। তার মধ্যে খুঁজে দেখতে লাগল কৃষ্ণকানুকে।

হাত ধরে তাঁকে বাধা দিল ভদ্রা, বলল—ক্ষান্ত হও সখি, এর মাঝেও নেই তোমার নয়নমণি।

ব্যগ্র কণ্ঠে শ্রীমতী বলল—কি বললে সখি? নয়নমণি! তবে এইবার বুঝেছি। সে লুকিয়ে আছে নয়নমণিতে—আমার দুটি আঁখি-তারায়। ললিতা, শীঘ্র এনে দাও তীক্ষ্ণ ছুরিকা। আমার নয়ন দুটিকে উৎপাটিত করে একবার খুঁজে দেখি মেলে কিনা তার সন্ধান।

বিরজা বলল—শ্রীমতী স্থির হও। ভেবে দেখ, সে কি আমাদের দৃষ্টির সামনেই অক্রুরের রথে করে বৃন্দাবন ছেড়ে যায় নি। যায় নি কি সে মথুরার পথে।

ছিন্ন লতিকার মত শ্রীমতী লুটিয়ে পড়ল শ্যাম তৃণদলে। দরবিগলিত ধারায় সিক্ত হল তৃণভূমি। করুণ বিলাপ করে বলল—তাহলে সত্যই সে ছেড়ে গেছে বৃন্দাবন—গিয়েছে মথুরায়। সখি, তবে আর এ জীবনে আমার বিন্দুমাত্র সাধ নেই। জীবনের সবকিছু জলাঞ্জলি দিয়ে তার শীতল চরণে আশ্রয় নিয়েছিলাম। সেই যদি আমায় ত্যাগ করে গেল তবে আর কি কাজ এ ব্যর্থ জীবনে। আমায় তোরা গরল এনে দে, তাই পান করে এ জীবন

আমি ত্যাগ করব। কৃষ্ণহীন জীবন যে জগতের আবর্জনা সখি।

ললিতার কোলে মাথা রেখে আকুল রোদনে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল শ্রীমতী। সখিরা সকলে তাকে ঘিরে বসে নীরবে অশ্রুবিসর্জন করতে লাগল। সান্ত্বনার বাণী জাগল না কারু কণ্ঠে।

বেদনাকাতর কণ্ঠে শ্রীমতী আবার বলল—প্রিয় সখি ললিতা, মরবার আগে পূর্ণ কর আমার শেষ সাধ। খুলে নাও আমার কংকন, স্মৃতিচিহ্নরূপে তা পরিধান কর তোমার হাতে। সখি বিশাখা, তুমি নাও আমার অঙ্গুরী, সখি চিত্রা নাও আমার বলয়। আর সব সখীরাও প্রত্যেকে যেন নেয় আমার এক একখানি অলংকার। শুধু সখি, বাকী থাকে যেন একটি অলংকার—আমার হিয়ার হারখানি। তাকে আমি রেখে যাব নিকুঞ্জের তমাল শাখে দুলিয়ে। আমি যখন থাকব না, তখন যদি কোনোদিন কোনক্রমে কৃষ্ণ আসে বৃন্দাবনে, তবে তাকে বোলো, যেন সে একবার এ হারখানি গলায় পরে। এরি মাঝে রেখে যাব আমার প্রেমস্পর্শখানিকে।

সখি, তোমাদের কাছে তো আমার কিছুই গোপন নেই। তাই মৃত্যুর আগে প্রকাশ করে যাই আমার প্রাণের গভীরতম—গোপনতম বাসনা। এ দেহ পঞ্চভূতে মিলাবার পরও আমি তার সেবা করতে চাই। এই পৃথিবীর যেখানে যেখানে অরুণ চরণ ফেলে প্রিয় আমার হেঁটে যাবে, সেখানকার মৃত্তিকায় যেন মিশে থাকে আমার দেহ-ক্ষিতি। যে দর্পণে সে নিজের মুখছবি নিরীক্ষণ করে, সেই দর্পণে যেন আমার দেহ-তেজ জ্যোতি হয়ে থাকে। যে সরোবরে সে প্রতিদিন অবগাহন করে, তারি সলিলে যেন মেশে আমার দেহ-অপ্। যে ব্যজনে তার অঙ্গ শীতল হয়, আমার দেহ-মরুৎ যেন হয় তারই সমীরণ। আর যে আকাশের নীচে ভ্রমণ করে সেই নবজলধর শ্যাম, সেইখানে আকাশে যেন মিশে যায় আমার দেহ-ব্যোম। তবেই আমার জীবনের সব তৃষা মিটবে। আমি চিরকাল ধরে তার সেবা করতে পারব।

বলতে বলতে চেতনা হারিয়ে ফেলল শ্রীমতী রাধা। নিশ্চল হল দেহ, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের গতি রুদ্ধ হল।

ললাটে করাঘাত করে আর্তনাদ করতে লাগল সখীগণ—হায় হায়। তবে কি সত্যই কৃষ্ণবিরহে শ্রীমতী মৃত্যুবরণ করল। উচ্চকণ্ঠে কৃষ্ণনাম শুনাতে লাগল সখীরা। অশ্রুবারি মস্তকে ঢেলে ব্যজন করতে লাগল বস্ত্রাঞ্চল দিয়ে। সূক্ষ্ম সূত্র নাসিকাগ্রে ধরে দেখল অতি ক্ষীণ নিঃশ্বাস-বায়ুতে ঈষৎ কম্পিত

হচ্ছে। এখনও প্রাণ আছে দেহে, কিন্তু দশমী দশা উপস্থিত শ্রীমতীর।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ল ললিতা। কি করা উচিত? কি করা সম্ভব এখন? কৃষ্ণ যদি হয় শ্রীমতীর প্রাণ, শ্রীমতী যে তাদের সকলের প্রাণ।

যেমন করেই হোক্ এ প্রাণ রক্ষা করতে হবে। শ্রীমতীর প্রাণাধারকে ফিরিয়ে আনতে হবে বৃন্দাবনে।

কেউ যাক্ মথুরায়, গিয়ে শ্যামসুন্দরকে সংবাদ দিক যে তার বিরহে শ্রীমতীর মৃত্যুদশা উপস্থিত। সে যেন করুণা করে একবার এসে শেষ দর্শন দেয় হতভাগিনীকে।

কিন্তু কে যাবে মথুরানগরে? কে যাবে সেই অপরিচিত অনভ্যস্ত পথে? এই মাধুর্যভূমি হতে সেই ঐশ্বর্যনিকেতনে প্রবেশ করতে পারবে কোন্ সখী?

ললিতা এক এক করে সব সখীর মুখের দিকে তাকাতে লাগল। তাকাতে লাগল ব্যাকুল প্রত্যাশা নিয়ে।

যেতে প্রস্তুত সখীরা সকলেই। শ্রীমতীর জন্য লক্ষ বিপদ বরণ করতেও তারা প্রস্তুত। আবার এ অবস্থায় শ্রীমতীকে ছেড়ে যেতেও তাদের মন সরে না। উভয় সংকটে পড়ে নীরব হয়ে রইল সখীরা।

নিঃসঙ্কোচে উঠে দাঁড়াল বৃন্দা। বিনা দ্বিধায় সে বলল—সখীদের অনুমতি পেলে আমিই যাব মথুরায়। যেখানেই থাক্ সে শ্যামরায়, খুঁজে বের করব তাকে। তারপর নিবেদন করব শ্রীমতীর কথা—আমাদের কথা, বৃন্দাবনের সকলের কথা।

বিশাখা বলল—সেই ভাল। বাক্‌নিপুণা সুচতুরা বৃন্দাই এ কাজের সম্পূর্ণ উপযুক্ত। সেই যাক্ শ্রীমতীর দূতী হয়ে। কিন্তু আর কে সঙ্গে যাবে?

শ্রীমতীর নিশ্চল দেহখানি কেঁপে উঠল। ধীরে ধীরে খুলে গেল দুটি মুদ্রিত আঁখি। একটি দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে তার বক্ষ ভেদ করে বেরিয়ে এল আর্তক্ষীণ স্বর—সে কোথায়? আমি কোথায়? কতদূরে গেল তার রথ? কতদূরে মথুরা?

শ্রীমতীর ব্যথাদীর্ণ বক্ষে কোমল হাতখানি রেখে ললিতা বলল—সখি আশ্বস্ত হও। সে আসবে। সে যে বলে গেছে সে আসবে।

ললিতার দেহে ভর করে অর্ধ-উত্থিত হল শ্রীমতী রাধা। নিবিড় হতাশায়

বলল—সে কি আর সত্যই আসবে? আমার দেহে প্রাণ থাকতে সে কি ফিরে আসবে আর?

ঃ আসবে সখি আসবে। তোমার বিরহের অকূল সাগর পাড়ি দিয়ে সে আসবে। এই ক্রন্দন আর অশ্রুপাতের মহাদুর্যোগের দিনেই সে অভয় বাহু মেলে দাঁড়াবে তোমার দুয়ারে এসে। তোমার প্রেমে নিঃশেষে ধরা দেবে বলেই আজ সে হয়েছে অধরা। তোমার বুকে বাজে যত বেদনার আঘাত, তার বুকে তা দ্বিগুণ হয়ে বাজে।

ললিতাকে জড়িয়ে ধরল শ্রীমতী—হায় সখি, তবে বুঝি আমায় কাঁদিয়ে সে নিজেও কাঁদছে সাথে সাথে। আমার জীবনকে শূন্য করে বুঝি নিজেকেও ভরিয়েছে শূন্যতায়। হায়! মন্দভাগিনী আমি! নিজে বেদনা পেয়ে কতই না বেদনা দিচ্ছি তাকে।

বৃন্দা এগিয়ে এলো শ্রীমতীর কাছে। নতজানু হয়ে তার কানে কানে বলল—শ্রীমতী, ধৈর্য-ধারণ কর। আমি যাব মথুরায়। ফিরিয়ে আনব তোমার জীবনাধারকে।

ঃ তাই যাও সখি, তাই যাও। তাকে হারিয়ে বৃন্দাবনের কি দশা সব বুঝিয়ে বলো তাকে। সে যেন এসে একবার তার বিরহকাতর সখাদের দর্শন দান করে। আহা! ধেনুবৎসগণ আজও মথুরার পথপানে তাকিয়ে থাকে, জলধারা গড়িয়ে পড়ে তাদের নয়ন হতে। তারা তো বিলাপ করতে পারে না, বলতে পারে না কৃষ্ণনাম। একবার এসে যেন তাদের কৃপাস্পর্শ প্রদান করে গোবিন্দ। নন্দযশোমতী তার জন্য কেঁদে কেঁদে দৃষ্টিহারা হয়েছেন—দুর্বল দেহে চলবার শক্তি নেই। মথুরায় গিয়ে তাঁদের নয়নমণিকে তো দেখে আসতে পারবেন না তাঁরা। তাঁদের অসীম স্নেহ স্মরণ করে একবার যেন সে বৃন্দাবনে আসে। আর—না থাক্ সখি, এ হতভাগিনীকে যদি সে স্মরণ না করে, নাই বা করল। যদি দর্শন দিতে না চায়, নাই বা দিল দর্শন। তবু যেন বৃন্দাবনের বিরহ ব্যথা দূর করে সে। তাই হবে আমার পরম আনন্দ।

বৃন্দা বলল—আশীর্বাদ কর শ্রীমতী, বৃন্দাবনে যার হৃদয়ে যত বেদনার বাণী পুঞ্জীভূত হয়ে আছে সব যেন উচ্চারিত হয় আমার কণ্ঠে। আমাকে তোমার পদধূলি দাও কৃষ্ণপ্রিয়া। কাল প্রত্যুষে ভোরের প্রথম পাখিটি জেগে ওঠার আগেই আমি তোমার নাম নিয়ে মথুরায় যাত্রা করব।

"অমন্যোধন্যানি দিনান্তরানি
হরে ত্বদালোকনমন্তরেণ।
অনাথবন্ধো করুণৈকসিন্ধো
হা হন্ত হা হন্ত কথং নয়ামি ॥"
—শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত ॥ ৪১ ॥

পনের

বিফল এ দিনগুলি মোর
তোমার দরশ বিনা হরি।
হায় অনাথের সখা করুণাসাগর
বল বল কাটাই কি করি ॥

দিনান্তের সন্ধ্যাতারা নিশান্তের শুকতারা হয়ে দেখা দিল। দীর্ঘরাত্রি জ্বলে জ্বলে প্রদীপ যখন নিভে গেল, তখন পূর্বগগনে ফুটে উঠল অরুণোদয়ের প্রথম আভাস।

প্রাঙ্গণপার্শ্বে শ্রীমতী যে মল্লিকাতরু রোপন করেছিল, তাতে আজ সহসা ফুল ফুটে উঠেছে। চন্দ্রলেখা ছুটে এসে এ সংবাদ জানাল শ্রীমতীকে। কষ্টে শ্রীমতী উঠে বসল বিরহ-শয্যায়। ক্ষীণকণ্ঠে প্রশ্ন করল— আজ কোন তিথি সখি?

শ্রীমতীর পদপ্রান্তে বসেছিলেন বড়িমা। সমস্ত রাত জেগেছিলেন। তিনি উত্তর করলেন—শ্রীমতী, আজ শুক্লা প্রতিপদ। ক্ষীয়মান চন্দ্র আবার দিনে দিনে উঠবে পরিপূর্ণ হয়ে—জ্যোৎস্না ছড়াবে তোমার আঙ্গিনায়—তোমার মল্লিকাবনে।

করুণ নয়নে তাকিয়ে শ্রীমতী বলল—কিন্তু বড়িমা, আমার জীবনে যে

আজও কৃষ্ণাতিথি। কতদিন হল বৃন্দা গিয়েছে মথুরায়, সে তো আজও ফিরল না। তার মুখ থেকে প্রিয়তমের একটি কথা শুনবার জন্যে আমি যে আজও অতিকষ্টে জীবনধারণ করে আছি।

কক্ষের বহির্দ্বারে শ্রীমতীর পোষা শারিকা সহসা ব্যস্তভাবে কলরব করে উঠল—কাকে যেন ডাকতে লাগল নাম ধরে। প্রতিহারিণী এসে প্রণাম করে জানাল—এক মথুরাবাসিনী রমণী রাজনন্দিনীর দর্শন কামনায় দ্বারে অপেক্ষা করছে।

চঞ্চল হয়ে উঠল শ্রীমতী। মথুরা নামের সঙ্গে জড়িত সবকিছুই যে আজ অতি আদরের—অতি বেদনার।

প্রতিহারিণীকে আদেশ করল—মথুরাবাসিনীকে সসম্মানে এখানে নিয়ে এসো।

পরক্ষণেই আভরণমণ্ডিতা অর্ধাবগুণ্ঠিতা এক নাগরী এসে শ্রীমতীকে অভিবাদন করে দাঁড়াল। শ্রীমতীর ইঙ্গিতে সখি লবঙ্গা একখানি গজদন্ত-নির্মিত উপবেশনপীঠিকা এগিয়ে দিল তার দিকে। রমণী উপবেশন করলে সকলেই সকৌতুকে নিরীক্ষণ করতে লাগল তার বেশভূষা—আভরণ-অলংকার। সবই ব্রজনারীদের থেকে ভিন্নতর। মর্যাদাব্যঞ্জক, কিন্তু মাধুর্যবিহীন।

শ্রীমতীর হয়ে ললিতা বলল—ভদ্রে, আমাদের সখি রাজনন্দিনী শ্রীমতী প্রিয়বিরহে একান্ত অধীরা। তাই আপনাকে যথাযোগ্য সম্বর্ধনা জানাতে পারছে না। আশা করি আপনি এই ত্রুটি মার্জনা করবেন। এবার বলুন, আমাদের সখি আপনার কি প্রিয়কার্য সাধন করতে পারে।

রমণী কোনো কথা না বলে বাম হস্তের দুটি অঙ্গুলিতে ধরে খুলে ফেলল তার অবগুণ্ঠন, আর সঙ্গে সঙ্গে বিস্ময়ের অস্ফুট ধ্বনি জেগে উঠল প্রতি কণ্ঠ থেকে।

নাগরী সাজে সজ্জিত হয়ে তাদের সামনে বসে আছে সখী বৃন্দা। ওষ্ঠে তার কৌতুকের হাসি।

বিস্মিত হয়ে ললিতা বলল—সখি বৃন্দা, একি তোমার অভিনব রহস্য। এত ঐশ্বর্য দিয়ে কেন সাজিয়েছ নিজেকে?

মৃদু হেসে বৃন্দা বলল—মথুরা যে ঐশ্বর্যপুরী। এসব ঐশ্বর্য মথুরা-পতির দান। ব্রজপুরীর সজ্জায় তো যাওয়া যায় না মথুরানাথের দর্শনে।

এবারে কথা বলল শ্রীমতী। কাতরতার সঙ্গে বিস্ময় মিশিয়ে বলল—

মথুরাপতি তো কংস। তার দর্শনে তুমি কেন গিয়েছিলে বৃন্দা?

বৃন্দা বলল—সখি শ্রীমতী, ব্রজপুরীতে আমরা ডুবে আছি আমাদের জীবনের গভীরতার অতলে। কিন্তু আমাদের জ্ঞানের অগোচরে মথুরা-পুরীতে হয়েছে বহু ঘটনার বিস্তার। ব্রজে যিনি প্রিয়তম, মথুরায় তিনি যে বীরোত্তম। দুরাত্মা কংসকে বধ করে তিনি পিতামাতাকে মুক্ত করেছেন কারাগার থেকে। ভেঙে দিয়েছেন বহু বন্দীর বেদনাশৃংখল। উগ্রসেন নামে মথুরাপতি হলেও মথুরার প্রকৃত অধিপতি আজ তিনিই।

শ্রীমতীর এক চোখে বেদনার অশ্রু অন্য চোখে আনন্দের অশ্রু। গভীর কণ্ঠে সে বলল—গোকুলচন্দ্র আজ মথুরাপতি হয়েছে। তবে সে আর আমাদের নেই। কোথায় সেই রাজাধিরাজ, আর কোথায় আমরা অতি সামান্যা গোপরমণী।

বড়িমা বললেন—শ্রীমতী, তিনি তোমাদেরই আছেন! ষড়ৈশ্বর্যশালী, অনন্ত বিভূতিময় বীরশ্রেষ্ঠ হয়েও তিনি প্রেমস্বরূপ আনন্দবিগ্রহ। ঐশ্বর্যে যিনি মহারাজ, প্রেমে তিনি ভিখারী। কন্যা, তোমার কাছে খাটবে না তার মহিমার বড়াই -ঐশ্বর্যের ছদ্মবেশ। মথুরায় যত বড় রাজাই থাকুন তিনি, বৃন্দাবনে আসতে হলে তাকে গোপনন্দন হয়েই আসতে হবে। রাজদণ্ড ছেড়ে হাতে তুলে নিতে হবে মোহনমুরলী।

: কিন্তু বড়িমা, সে কি আর কোনোদিন আসবে এই বৃন্দাবনে। যে হাতে রাজদণ্ড ধরেছে, সে হাতে কি আর তুলে নেবে মুরলী? যে মস্তকে পরেছে রত্নমুকুট, সে মস্তকে কি আর শিখিপুচ্ছ ধারণ করবে? মুক্তাহার দুলিয়েছে যে কণ্ঠে, সে কণ্ঠে আর কি শোভা পাবে বনমালা? সুবর্ণপীঠে স্থাপিত হয়েছে যে পদযুগল, তা কি আর আমাদের ভগ্ন হৃদয়কে স্পর্শ করবে?

ললিতা সান্ত্বনা দিয়ে বলল—সখি, আগে থেকেই কেন এত উতলা হচ্ছ। বৃন্দার কাছে শোনো সব বিবরণ—শোনো তার সংবাদ।

আত্মসংবরণ করে শ্রীমতী বলল—তাই হোক, সখি বৃন্দা, বল তোমার মথুরা যাত্রার সব বিবরণ। আহা! না জানি সে ঐশ্বর্যপুরীতে প্রবেশ করতে তোমায় কত কষ্ট পেতে হয়েছে।

বৃন্দা বলল—সখি, সত্যই তোমার অনুমান। আমি ব্রজপুরীর গ্রাম্য গোপরমণী, মথুরার ভাব কিছুই জানি নে। তাই পদে পদে বহু বাধা

বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্য শ্রীমতী, তোমার শ্রীরাধা নাম শুনে সেখানে সকলেই শ্রদ্ধা জানায়। স্বয়ং মথুরাপতি মাথা নত করেন ব্রজদেবীর নাম শুনে। এ রহস্য কিছুই বুঝতে পারি নে।

এইবার শোনো সখি, কেমন করে তার দর্শন পেলাম। মথুরা-বাজারের পথটুকুই আমার চেনা, বহুবার সেখানে দধিদুগ্ধ বিক্রয় করতে গিয়েছি তোমাদের সঙ্গে। তাই সেই বাজারে প্রবেশ করে একপাশে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলাম। কিছুই তো জানি নে এই নগরীর। কোন্ পথে যাব—কোথায় পাব তার সন্ধান। জানি নে পথের দিশা—জানি নে তার ঠিকানা। শুধু তার নামটুকু সম্বল। সেটুকু আশ্রয় করেই জনে জনে জিজ্ঞাসা করতে লাগলাম—ওগো তোমরা কি কেউ চেনো সেই কৃষ্ণকানুকে—জান কি সেই নন্দদুলাল যশোদানন্দনকে? কেউ উত্তর দিতে পারল না। এমনি সময় বড়িমা, তোমারই মত এক বৃদ্ধা এসে কোমল সুরে বলল—মা, হাটের লোকে তো তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে না, তুমি ওই কূপের কাছে যাও। ওই পবিত্র কূপ থেকে রাজার স্নানের জন্য জল নিয়ে যায় এক মথুরাবাসিনী। সে মথুরা নগরীর অনেক খবর রাখে। জানে অনেক পথের দিশা—অনেক ঠিকানা-পরিচয়।

বৃদ্ধার কথা শুনে আমি সেই কূপের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। কাতর চোখে তাকাতে লাগলাম চারদিকে। কিছুক্ষণ পরেই দেখলাম এক সুবেশা সুন্দরী পরিচারিকার দ্বারা সুবর্ণ কলসী বহন করে সেদিকেই এগিয়ে আসছে। রমণী আমার সমবয়সিনী। বোধহয় দূর থেকেই সে আমার বিপন্নভাব লক্ষ্য করছিল। কাছে এসে সস্নেহে আমাকে বলল—হে বিদেশিনী, তোমায় দেখে ব্রজবাসিনী বলে মনে হচ্ছে। মথুরানগরে তুমি কার সন্ধানে এসেছ সখি?

আমি বললাম—সখি, আমি যার সন্ধানে এসেছি সে ব্রজবাসীর প্রাণাধার বৃন্দাবন-কান্ত।

মথুরাবাসিনী হেসে বলল—বৃন্দাবন-কান্ত মথুরায় এলে যে মথুরাকান্ত হয়ে যায় সখি। বল তার নাম কি?

আমি বললাম—বৃন্দাবনে সে গোপাল নামে পরিচিত।

মাথা নেড়ে মথুরাবাসিনী বলল—না সখি, এখানে নরপাল আছে, মহীপাল আছে, নগরপাল আছে; কিন্তু গোপাল নেই। বল শুনি কি তার পরিচয়।

বললাম—সে নন্দসুত, যশোদানন্দন।

মধুপুর-নাগরী বলল—পুরোপুরি মেলাতে পারছি না সখি, এখানে আছে বসুদেব-সুত দেবকীনন্দন। আচ্ছা, বল তো সখি, তার আর কি পরিচয় আছে!

এবারে অনেক ভেবে আমি বললাম—সখি, তবে শোনো, তার সবচেয়ে বড় পরিচয়। সে রাধাকান্ত।

স্মিতহাস্যে উদ্ভাসিত হল মথুরাবাসিনীর নয়ন দুটি। সে বলল—এইবার চিনেছি তাকে। মথুরায় একজন আছেন, তিনি রাধাকান্তই বটে, কারণ যে তাঁর আরাধনা করে সেই তাকে কান্তরূপে পায়, স্বয়ং কুব্জাই তার প্রমাণ। কিন্তু সখি, এমন কাঙালিনীর বেশে তাঁর কাছে তুমি কেমন করে যাবে! একে একে ছয়টি সুরক্ষিত তোরণ অতিক্রম করে গেলে তবেই সপ্তম দ্বারে তাঁর সাথে সাক্ষাত হবে। কিন্তু দ্বাররক্ষীরা কাঙালিনীকে পথ ছাড়ে না—অপরিচিতের কাছে অভিজ্ঞান চায়।

আমি বললাম—সখি, আমি কাঙালিনী বটে, কিন্তু সাধারণ কাঙালিনী নই—প্রেম কাঙালিনী। আর তুমি যখন আমার সখী হয়েছ, তখন অপরিচিতও আমি নই। যেমন করেই হোক্, আমায় তার কাছে পেঁছে দেবার ভার তোমায় নিতেই হবে সখি।

একটু ভেবে সে বলল—দেখা যাক্ কতদূর কি করা যায়। তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে এসো সখি।

মথুরানগরীর ঐশ্বর্যশোভা দেখতে দেখতে আমরা প্রথম তোরণের কাছে এসে পেঁছিলাম। রক্তপ্রবালে নির্মিত বিচিত্র তোরণ। শীর্ষদেশে তার চতুর্দল পদ্মের মত চারটি গম্বুজ—অপূর্ব কারুকার্য তার।

দ্বাররক্ষী আমাকে বাধা দিলে মথুরাবাসিনী বলল—রক্ষী, ইনি আমার সখী। রাজার আদেশ আছে আমার সহগামিনীদের পথ ছেড়ে দিতে।

রক্ষী বলল—কিন্তু এর যে দেখছি ভিখারিণীর সাজ।

মথুরাবাসিনী বলল—আমার সখী প্রেমে সর্বস্ব ত্যাগ করেছে, তাই সে স্বেচ্ছায় ভিখারিণী।

দ্বার ছেড়ে দিয়ে রক্ষী বলল—তাহলে মহারাজের দানশালা থেকে উপযুক্ত বসন সংগ্রহ করে নাও। নইলে দ্বিতীয় তোরণে প্রবেশ করতে বাধা পাবে।

সখি শ্রীমতী, আমার দেহে এই যে বহুমূল্য বসন দেখছো, মহারাজের

দানভাণ্ডার থেকেই তা লাভ করেছি। এই বসনে মথুরাবাসিনীর নির্দেশ মত সজ্জিত হয়ে আমরা ক্রমে দ্বিতীয় তোরণের সামনে গিয়ে উপস্থিত হলাম। পদ্মরাগমণিখচিত এই তোরণ চারিধারে সিঁদুরের ন্যায় রক্তাভা বিকীরণ করছিল। এর স্তম্ভ ছয়টি—যেন একটি ষড়দল পদ্ম। প্রবেশপথ অধিকতর সুরক্ষিত।

শ্রীমতী, আমি মনে মনে তোমাকেই স্মরণ করতে লাগলাম। মথুরা-বাসিনীর কথায় এখানেও দ্বাররক্ষী পথ ছেড়ে দিল আর দানভাণ্ডার থেকে সংগ্রহ করতে বলল যথাযোগ্য উত্তরীয়। নইলে তৃতীয় তোরণে প্রবেশ করা যাবে না।

সখি, এই সেই স্বর্ণবিন্দুখচিত অবগুণ্ঠন-উত্তরীয়। এরই সাহায্যে মথুরাবাসিনীর মত মস্তক আচ্ছাদিত করে আমরা তৃতীয় তোরণের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। এ তোরণের শোভা আরও মনোরম। নীলকান্ত-মণিখচিত দশটি স্তম্ভ-সমন্বিত দশদল পদ্মের মত আকার। সে তোরণ অতিক্রম করে দানভাণ্ডার থেকে লাভ করলাম কর্ণের হীরককুন্ডল। এই দেখ-সখি, সেই মহামূল্য অলঙ্কার।

চতুর্থ তোরণ বান্ধুলিপুষ্পের মত লোহিতবর্ণ। স্তম্ভ তার দ্বাদশটি। সৌন্দর্য হৃদয়মুগ্ধকর। সে তোরণ অতিক্রম করে আমি লাভ করলাম দুহাতের এই মণিবলয়।

এইবার পঞ্চম তোরণের বর্ণনা শোনো সখি। বর্ণ তার ধূম্রাভ। ষোড়শদল পদ্মের মত স্তম্ভ তার ষোলটি। কোথা থেকে যেন কি এক মধুর সঙ্গীত-ধ্বনি ভেসে আসছে—যা সমস্ত চেতনাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। আমি মন্ত্র-মুগ্ধের মত দাঁড়িয়ে রইলাম। মথুরাবাসিনী বলল—সখি, যদি থেমে যাও এখানে, তবে আর দর্শন পাবে না তোমার প্রার্থিতের। সব মোহ কাটিয়ে এগিয়ে এসো।

সেখান থেকে এই মুক্তাময় কণ্ঠহার লাভ করে আমরা ষষ্ঠ তোরণের কাছে এগিয়ে গেলাম। সখি, ঐ তোরণের সৌন্দর্য বর্ণনাতীত। একটি আশ্চর্য শুভ্র জ্যোতি বিচ্ছুরিত হয়ে দৃষ্টিকে স্নিগ্ধ অচঞ্চল পরিপূর্ণ করে দেয়। এ তোরণের দুটিমাত্র স্তম্ভ, কিন্তু অতুলনীয় তার কারুকার্য। ইচ্ছা হয় বসে বসে শুধু তার শোভা নিরীক্ষণ করি। কিন্তু মথুরাবাসিনী আমায় স্মরণ করিয়ে দিল আমার উদ্দেশ্যের কথা—তোমার নাম বলল আমার কানে।

সচকিত হয়ে আমি তার সঙ্গে তোরণ অতিক্রম করে এই মাণিক্য-অঙ্গুরীয় লাভ করলাম।

তারপর সখি, কিছুদূর অগ্রসর হয়েই সামনে তাকিয়ে দেখলাম এক বর্ণনাতীত দৃশ্য। উচ্চমঞ্চের উপরে এক স্বর্ণময় পদ্ম-সিংহাসন। তার সহস্রদল থেকে উজ্জ্বল স্বর্ণাভা বিকীর্ণ হয়ে চারিদিক আলোকিত। আর সেই সিংহাসনের মাঝখানে বসে আছে—ও কে? মনে হল রাজবেশধারী পরম-দ্যুতিমান এক ক্ষত্রিয়বীর।

সেই অপরিচিত পুরুষকে দেখে আমি ত্বরিতে গুণ্ঠন টেনে দিলাম। মথুরাবাসিনীকে বললাম—সখি, এ আমায় কার কাছে নিয়ে এলে? একে তো চিনতে পারছি নে।

সে হেসে বললে—একবার ভাল করে চেয়ে দেখ তো সখি। তাকিয়ে দেখ রাজবেশের অন্তরালে। দেখ তুমি যাকে চাও এ সে কিনা।

ঐশ্বর্যময় অবগুণ্ঠন সরিয়ে একবার মন দিয়ে তাকাতেই তাকে চিনতে পারলাম। সঙ্গে সঙ্গে অতর্কিতে আর্তনাদ করে উঠল আমার অন্তর—হায় শিখিপাখাধারী মুরলীমনোহর শ্রীরাধাবল্লভ, তুমি কোথায়?

মথুরাবাসিনী আমায় সস্নেহে স্পর্শ করল, আর আমি বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে দেখলাম মথুরাবাসিনীর ছদ্মবেশে আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছ তুমি শ্রীমতী রাধা। তুমি স্বয়ং, অথবা সে কি তোমার প্রেমের প্রতিমা—আনন্দ-প্রতিচ্ছবি। অকস্মাৎ সেই দেহ থেকে একটি সূক্ষ্ম জ্যোতিরশ্মি বহির্গত হয়ে ছুটে গেল সিংহাসনের দিকে—মিলিয়ে গেল মথুরাপতির দেহে। আর অমনি দেখলাম, খসে পড়ল মহারাজের রাজমুকুট—খসে গেল হাতের রাজদণ্ড। দুই চোখ থেকে প্রবাহিত হল অবিরল অশ্রুধারা। মুহূর্তের জন্য আমি সকল চেতনা হারিয়ে ফেললাম! শ্রীমতী, শুধু তোমার স্মৃতিখানি জেগে রইল অন্তরে—অকূল আকাশে ধ্রুবতারার মত।

চেতনা ফিরে এলে দেখলাম এক নিভৃত প্রকোষ্ঠে সুকোমল শয্যায় আমি শুয়ে আছি। দুজন সুন্দরী সুসজ্জিতা রাজ-পরিচারিকা আমার সেবা করছে। আমার সামনে বসে আছেন মথুরাপতি স্বয়ং। কিন্তু আর তার রাজবেশ নেই। নেই রাজমুকুট রাজদণ্ড। আমাদের অতিপ্রিয় সেই পরিচিত বেশ। সেই শিখিপাখা—সেই বনমালা, মোহনমুরলী। কি করুণ নয়নে সে তাকিয়ে আছে আমার পানে। তোমারি মত রুক্ষ কেশরাশি, মলিন বদন—নয়নে

জলধারা। তোমারি মত বিরহক্লিষ্ট শীর্ণ দেহ। প্রিয়তমের এ দশা দেখে হৃদয় আমার বিদীর্ণ হয়ে গেল। আমি চীৎকার করে বললাম—হে গোপীজনবল্লভ, এ কি দশা হয়েছে তোমার!

সে বলল—সখি বৃন্দা, যে বেদনা রাধিকার বুকে, তার শতগুণ বেদনা যে আমার বুকে।

যে বিরহে বৃন্দাবনে কাঁদছে রাধা, সেই বিরহে কৃষ্ণ কাঁদছে মথুরায়—এ কথা কোনোদিন জানবে না কেউ। সখি, মথুরায় এসে শুধু আমার রাজবেশ দেখে ফিরে যেও না, দেখে যাও তার অন্তরালে লুকানো আমার বিরহের অশ্রু-ধারা।

বললাম—হে জীবিতেশ, ফিরে চলো বৃন্দাবনে। কেন এ বেদনা—এ অশ্রুধারা। রাধা তোমার বিরহে মৃতকল্পা আর তুমিও যে জীবন্মৃত হয়ে আছ তার বিরহে।

সে কি উত্তর দিল জান সখি। সে বলল—বিরহ যে গভীরতর মিলনেরই নামান্তর। সব পাওয়ার চেয়ে বড় যে পাওয়া, তেমনি করে রাধা আমায় পেতে চেয়েছিল। তাই বেদনাসাগরে অবগাহন করে তাকে পবিত্রতর হতে হল। উজ্জ্বলতর হতে হল বিরহের অনলে দগ্ধ হয়ে। এই তার শ্রেষ্ঠ আরাধনা। এই আরাধনাকে সম্পূর্ণ করবার জন্য মথুরানগরীর রাজ-ঐশ্বর্যের মধ্যে বসে বসে আমাকেও সাধনা করতে হচ্ছে বিরহ-বেদনার মধ্য দিয়ে।

আমি বললাম—হে শ্যামরায়, আর কতকাল চলবে এই নির্মম সাধনা? জীবন কি নিঃশেষ হয়ে যাবে—মৃত্যুতে কি হবে এর পরিসমাপ্তি?

সে হেসে বলল—বৃন্দা, পরিপূর্ণ হয়েছে সাধনা। বৃন্দাবন মথুরা আজ এক হয়ে মিশে গেছে। তাই আজ ব্রজবাসিনীর এখানে মথুরাবাসিনী-বেশে আগমন। এই নাও বৃন্দা, আমার মুকুট আর বাঁশী। এই নিয়ে যাও তুমি ব্রজপুরে। এর সাথে সাথে আমিও অলক্ষিতভাবে গিয়ে পৌঁছাব বৃন্দাবনে—দেখা দেব আমার প্রিয়তমাকে।

দুখানি ব্যাকুল বাহু প্রসারিত করে শ্রীমতী রাধা বলল—কোথায় সখি, কোথায় সে মুকুট-মুরলী। আমার দুটি কম্পিত হাতে একবার তাদের স্পর্শ করতে দাও।

বৃন্দা দূরে ফেলে দিল অবগুণ্ঠন। খুলে ফেলল মথুরার বহুমূল্য বসন-ভূষণ। তার অন্তরাল থেকে প্রকাশিত হল গোপীজন-সুলভ ব্রজবেশ।

বস্ত্রের অভ্যন্তর থেকে মুকুট-মুরলী বের করে বৃন্দা শ্রীমতীর কম্পিত হাতে তুলে দিল।

শ্রীমতী মাথায় ঠেকালো সে মুকুট। মুরলী বুকে জড়িয়ে ধরল। তার মধ্য দিয়ে সে প্রিয়তমের সুধাস্পর্শ অনুভব করল—আঘ্রাণ করল তার কুন্তল-সুরভি।

সখীরাও একবার সে স্পর্শলাভের জন্য ব্যাকুল। তাদের হাতে মুকুট তুলে দিয়ে আরও নিবিড় করে বক্ষে জড়িয়ে ধরল বাঁশরী। এতদিনের এত যে বেদনা সব যেন ডুবে গেল শান্তির পারাবারে। পরম পরিতৃপ্তির আভা ফুটে উঠল সিক্ত নয়নে। এই বাঁশরীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে জড়িয়ে আছে প্রিয়তমের অধর-স্পর্শ। সেই স্পর্শ পাবার জন্য শ্রীমতী বাঁশী তুলে নিল তার অরুণ-অধরে আর শ্রীমতীর অধরস্পর্শ পেয়ে কি জানি কেমন করে এতদিন পরে আবার বেজে উঠল সেই মোহনমুরলী।

শ্রীরাধার নিবেদিত জীবনখানিও যে আজ বাঁশরী হয়ে গেছে। সুদীর্ঘ বিরহ বেদনার শতশত ছিদ্র তার মাঝে। তাই মোহনমুরলীর সুরে সুর মিলিয়ে তার হৃদয়-বাঁশরীও বেজে উঠল। বিস্ময়-পুলকে রোমাঞ্চিত হল সখীদের দেহ। আপনা থেকেই মুদ্রিত হয়ে এল নয়ন—যুক্ত হল করযুগল। গুঞ্জন করে উঠল তাদের অন্তর।

ঃ হে মুরলী মনোহর, তবে কি তুমি সত্যই এসেছ—এতদিন পরে ফিরে এসেছ হৃদয়-বৃন্দাবনে। ফিরে এসেছ কি ব্যথার যমুনাতীরে!

শ্রীমতী রাধা শুনতে পেল সেই বংশীধ্বনির মধ্য দিয়ে তার প্রিয়তমের কণ্ঠস্বর—শ্রীরাধা, আমি এসেছি। তোমার প্রেমকে মাথার মুকুট করে আমি এসেছি। এসেছি তোমার আত্ম নিবেদনকে মোহনমুরলী করে।

শ্রীমতী মনে মনে বলল—হে প্রিয়তম, একদিন মোহবশে আমি তোমার মাথার মুকুট হতে চেয়েছিলাম। মার্জনা কর সে প্রগল্‌ভতা। আজ তোমার অধরের মুরলী হতে চাইবার স্পর্ধাও আমার নেই—নেই বক্ষের বনমালা হতে চাইবার। আজ আমি তোমার চরণের নূপুর হতে চাই।

বাঁশি বলল—শ্রীমতী, তুমিই যে আমার সর্বকিছু। আমার আরাধিতা দেবী তুমি, তাই মুকুট হয়ে রয়েছ আমার মস্তকে। তুমিই আমার নিত্যশুদ্ধ প্রেমস্বরূপা, তাই মুরলী হয়ে আমার অধরে রয়েছ। তুমিই আমার প্রাণ-রূপিনী শক্তিময়ী, তাই আমার বক্ষে রয়েছ বনমালা হয়ে। আবার তুমিই

আমার প্রেমদাসী হয়ে রয়েছ চরণের নূপুররূপে। ওগো রাসেশ্বরী অনন্ত প্রেম নিয়ে তুমি যে অনন্তরূপিনী।

রাধার অধরে বাজতে লাগল বাঁশী। ধীরে ধীরে তার সুরধারা ছড়িয়ে পড়ল গগনে-পবনে, পরিব্যাপ্ত হল সমস্ত বৃন্দাবনে। সেই সুরে যেন সহসা বিষাদ-শয্যা ছেড়ে জেগে উঠল ব্রজের নর-নারী, পশু-পাখি, তরুলতা তৃণগুল্ম।

পরিচিত মোহন সুরে কে বাজায় এ বাঁশি। এতদিন পরে কি শ্যাম ফিরে এলো মধুপুর হতে? ফিরে কি এলো উপেক্ষিত বৃন্দাবনে! পরম কৌতূহলে চোখ মেলে দেখতে গিয়ে একসাথে ফুটে উঠল সব কুসুমকলিকা। এক সাথে ছুটে এল সব ভৃঙ্গ-মধুকর-প্রজাপতি। বিশুষ্ক প্রান্তরে সহসা একসাথে মাথা তুলে তাকাল হরিৎ তৃণদল। যমুনার স্রোতধারা সম্মুখে ছুটে যেতে যেতে অকস্মাৎ পেছন ফিরল উজান গতিতে।

বাঁশরীর সুরধারায় অভিষিক্ত হয়ে শ্রীমতীর হৃদয় পূর্ণ হল গভীর আনন্দে। এক নিবিড় উপলব্ধিতে প্রশান্ত হল তার সকল আকুলতা। যখন একান্ত কাছে কাছে ছিল শ্যামচাঁদ, তখনও তো এমন পূর্ণতম আনন্দ—মধুরতম পরিতৃপ্তি লাভ করেনি শ্রীমতী।

আজ সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে শ্রীরাধা তার উপস্থিতি অনুভব করতে পারছে। উপলব্ধি করতে পারছে তার প্রেম সুরভি। আনন্দ ঝরে পড়ছে আকাশ আলোক হতে শত লক্ষ ধারায়। চারদিক হতে বর্ষিত হচ্ছে অবিরাম মধুধারা। বায়ু প্রবাহিত হচ্ছে মধুছন্দে, যমুনা-সলিলে ক্ষরিত মধুবিন্দু, ওষধি-বনস্পতি মধুময়। মধুময় ত্রিভুবন, মধুময় জীবন-মৃত্যু।

ললিতার হাতে বাঁশরী সমর্পণ করে সহসা উঠে দাঁড়াল শ্রীমতী। আনন্দে, সৌন্দর্যে প্রেমে যেন সে বিদ্যুৎলতা। ওই যে এসেছে তার জীবন-বল্লভ। দর্শন দিয়েছে দীর্ঘকাল পরে। দ্বারের বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে চুপে চুপে। তবে সে সত্যই ফিরে এসেছে বৃন্দাবনে—পালন করেছে তার প্রতিজ্ঞা-বাক্য।

আনন্দে ছুটে গেল শ্রীমতী। নতজানু হয়ে বসে জড়িয়ে ধরতে গেল প্রিয়তমের পদযুগল। সম্মুখে তার কৃষ্ণপ্রস্তরনির্মিত স্তম্ভ। বুঝি তারই মাঝে আত্মগোপন করেছে শ্যাম।

ওই যে আবার দেখা যাচ্ছে তাকে। প্রাঙ্গণের তরুণ-তমালে তারই সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি। ছদ্মবেশ ধরে কি শ্রীমতীর দৃষ্টিকে প্রতারিত করতে পারবে শ্যাম।

আকুল আনন্দে প্রাঙ্গণের পানে ছুটে গেল শ্রীমতী। এসো এসো হৃদিরঞ্জন, বহুভাগ্যে আজ আবার তোমার দর্শন পেলাম। আমার এতদিনের এত অশ্রুধারা—এত বেদনা সব আজ পরম আনন্দে বিলীন হল। মিলনের মাধুরীতে পূর্ণ করে দিলে সমস্ত জীবন—সমস্ত ভুবন। ধন্য তুমি প্রেমময়। প্রণাম তোমায়।

কে গো অন্তরতর সে !
আমার চেতনা আমার বেদনা
তারি সুগভীর পরশে ॥
আঁখিতে আমার বুলায় মন্ত্র,
বাজায় হৃদয়বীণার তন্ত্র,
কত আনন্দে জাগায় ছন্দ
কত সুখে দুখে হরষে ॥

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

ষোল

আনন্দ চেতনায় আত্মহারা শ্রীমতী। আনন্দমাধুরীর অফুরন্ত দানে সে আজ পূর্ণ হল—প্লাবিত হল—নিমজ্জিত হল। পরিতৃপ্ত হল তার সকল পিপাসা।

প্রতি মুহূর্তে হৃদয়-দেবতাকে কাছে কাছে পাচ্ছে শ্রীরাধা। পাচ্ছে দৃষ্টির অদূরে জীবনের সন্নিকটে—স্পর্শের সীমানায়—হৃদয়ের গভীরে। কখনো দক্ষিণে, কখনো বামে, কখনো পশ্চাতে, কখনো সম্মুখে এসে দাঁড়াচ্ছে সেই নয়নাভিরাম। এ পাওয়াতে নেই হারানোর শংকা। এ মিলনে বিচ্ছেদ নেই। চরম বিরহ সাঙ্গ হল আজ পরমমিলনে।

মাঝে মাঝে বিস্ময় বোধ করছে শ্রীমতী, গভীরতম বেদনা আর গভীরতম আনন্দের অনুভূতি যে একই। অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়ে শ্রীমতীর দুটি নয়ন হতে। এ অশ্রু বেদনায় উত্তপ্ত নয়, আনন্দে শীতল।

বসে বসে কত ফুলে কত মালা গাঁথে সখী চন্দ্রমালা, কাঞ্চনমালিকা,

মধুমঞ্জরী। শ্রীমতী সে মালা পরিয়ে দেয় প্রিয়তমের কণ্ঠে। সখীরা দেখে সে মালা কখনো দুলছে অশোকশাখায়, মৃগশাবকের কণ্ঠে। কখনো লুটিয়ে আছে কুঞ্জবেদিকায়—বাতায়নতলে।

সখী প্রিয়ব্রতা বলল—শ্রীমতী, শ্যাম নাকি ফিরে এসেছে বৃন্দাবনে; কিন্তু কই, আমরা তো আজও তার দর্শন পেলাম না।

চারদিকে একবার সন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করে শ্রীমতী বলল—কেন সখি, ওই তো সে দাঁড়িয়ে আছে তোমার পেছনে। ফিরে না তাকালে তাকে দেখতে পাবে কেমন করে।

ফিরে তাকালো সখীরা। শ্রীমতী ছুটে যাচ্ছে পলাশতরুর পানে। কাছে গিয়ে দুহাতে তরুমূল স্পর্শ করে বলল—এই যে সখি, আমি স্পর্শ করেছি তার চরণ।

নিঃশ্বাস ফেলে সুনিষ্ঠা বলল—হায় সখি, আমরা যে তাকে দেখতে পাচ্ছি নে।

মৃদু হেসে শ্রীমতী বলল—শ্যামরায় কি বলছে জানিস্ সখি। তাকে যদি দেখতে হয় তবে আমার চোখ দিয়ে দেখতে হবে।

উঠে দাঁড়াল শ্রীমতী। দক্ষিণে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলল—ওই যে সখি, সে এগিয়ে চলেছে মাধবী-বিতানের দিকে। আমাদেরও ডাকছে ইঙ্গিতে। চল সখি, তাকে অনুসরণ করি।

চিত্রা বলল—শ্রীমতী, কোথায় শ্যাম! ও যে এগিয়ে যাচ্ছে তোমার রঙ্গিনী হরিণী।

চিত্রার কথা শ্রীমতীর কানে গেল না। সে ততক্ষণে দ্রুতপদে অনেকদূর এগিয়ে গেছে। সখীরাও তাই চলল শ্রীমতীর পশ্চাতে।

মাধবীবিতানের দ্বারপ্রান্তে এসে থমকে দাঁড়াল শ্রীমতী। কোথায়—কোনদিকে গেল মাধব? সন্ধান করতে করতে মল্লিকাকুঞ্জে গিয়ে প্রবেশ করল বিনোদিনী। এই তো রাশি রাশি শুভ্র মল্লিকা ফুলে ছড়িয়ে রয়েছে তার হাসি। তবে তো সে নিকটেই আছে। সামনে তাকালো শ্রীমতী। ওই তো সে বসে আছে বকুল-বেদিকায়। নয়নে প্রেম—বদনে প্রেম—প্রেমের লাবণ্য ঝরে পড়ছে সমস্ত দেহ হতে। সে দিকে ছুটে যেতে গিয়েও যেতে পারল না শ্রীমতী। তার পাশেই যে এসে দাঁড়িয়েছে ঘনশ্যাম।

এই যে তুমি—এখানেও যে তুমি। বলে শ্রীমতী জড়িয়ে ধরল

অশোকতরুকে।

ঃ প্রিয়তম, এমন একান্ত করে জীবনের প্রতি পদক্ষেপে তোমায় আমি পাব—তা কোনদিন ভাবতে পারিনি। আজ যেদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করছি সেদিকেই যে তুমি। কত বিচিত্ররূপে বিচিত্রবেশে তুমি আমায় দেখা দিচ্ছ ভুবনেশ্বর। রূপের যে তোমার শেষ নেই। কত বিরাট হয়ে দেখা দিলে তুমি। আকাশের মেঘ হয়ে ছড়িয়ে গেল তোমার কুঞ্চিত কেশকলাপ। নভোনীলিমায় ফুটেছে তোমার নয়নের দৃষ্টি। গোধূলির অস্ত-দিগন্তে তোমার অধরের অরুণিমা।

আবার কত ছোট হয়ে তুমি ধরা দিলে। তৃণপল্লবে তোমার শ্যামতনু। পুষ্পপতঙ্গে তোমার চপল গতি। তোমার পুলক-রোমাঞ্চ কদম্বকেশরে। আমার এ দুটি মাত্র নয়ন, আর অসংখ্যরূপে সামনে এসে দাঁড়িয়েছ তুমি। কোন্‌দিকে তাকাব—কোন্‌ রূপ দর্শন করব, হে অনন্ত রূপময়। একাধারে গভীরতা আর ব্যাপ্তি নিয়ে একি আনন্দ-অনুরাগে তুমি ধরা দিলে আজ শ্রীরাধার কাছে। তার জীবনে আজ দীপান্বিতার একি মহোৎসব।

ললিতা-বিশাখাকে ডেকে শ্রীমতী উৎসবের আয়োজন করতে বলল। জেবলে দিতে বলল প্রাসাদ-ভবনের সব আলো। সুগন্ধ ধূপে আর কুসুমে সুরভিত করতে বলল সব কক্ষ। উজ্জবল বসনভূষণে সজ্জিত হতে অনুরোধ করল সব সখীদের। শ্রীমতীর বিরহনিশা যে মিলন-রজনীতে পরিণত হয়েছে।

দিবারাত্রি অবিচ্ছিন্ন কৃষ্ণদর্শনে আনন্দবিহ্বল শ্রীমতী। প্রভাতে নয়ন মেলেই পায় তার প্রথম শুভদর্শন। মুক্ত বাতায়ন-পথে প্রভাতের যে আলো এসে লুটিয়ে পড়ে শ্রীমতীর শয্যাপালঙ্কে, তারি সাথে সাথে সে এসে পাশে বসে। আলোকের কোমল করে তাকে স্পর্শ করে বলে—আঁখি মেলো কমলিনী রাধা, তাকাও আমার নয়নে নয়নে। এতক্ষণ নিদ্রাঘোরে যে স্বপ্ন-শ্যামলের দর্শন পেয়েছিল, জাগরণেও মেলে তারই দর্শন। বদন-মার্জনা করতে গিয়ে শীতল সলিলে দেখে তারই রূপছবি। প্রসাধন-মুকুরে জেগে ওঠে তারই অন্তরের পবিত্র শুভ্রতা। অলক্তরাগে তারই প্রেমানুরাগ। নীলাম্বরীতে তারই সুনীল দেহকান্তি। অবিরাম দর্শন আর অফুরান আনন্দ। অফুরান আনন্দ আর অন্তহীন পরিতৃপ্তি।

মাঝে মাঝে সখীদের উপস্থিতি ভুলে যায় শ্রীমতী। সকলের মাঝে

থেকেও যেন একান্তে কার সাথে কথা বলে—হেসে ওঠে আনন্দউচ্ছ্বাসে। দুটি বাহুলতা প্রসারিত করে কাকে যেন জড়িয়ে ধরতে চায়। আত্মহারা সুরে বলে—প্রিয়তম আমার, তুমি যে শতরূপে আমায় বেষ্টন করে আছ, তুমি বসে আছ, তুমি দাঁড়িয়ে আছ—তুমি শয়ন করে আছ আমার কোলে মাথা রেখে।

শ্রীমতী অন্ত পায় না এ সৌন্দর্যের—এ আনন্দের। কখনো তার চোখের সামনে এক শ্যাম বহুরূপে পরিণত হয় বৃক্ষপত্র ফলফুলে। রূপে রূপে প্রতিরূপে বিকশিত হয় সেই পরম রূপাধার। আবার কখনো দেখে, পৃথিবীর সমস্ত রূপ এসে একীভূত হয় একমাত্র রূপে—ধরে সে শ্যামসুন্দরের প্রতিমূর্তি। সে রূপের জ্যোতি জেগে ওঠে শ্রীরাধার সর্বদেহে। প্রণাম জানিয়ে বলে—হে চিরসুন্দর, এই বিচিত্র পৃথিবীর মর্মলোকে দাঁড়িয়ে আছ তুমি। তোমার অনুপম মাধুরী ছড়িয়ে পড়েছে জলে-স্থলে অনলে-অনিলে। সেই মাধুরী-স্রোতে ভেসে চলেছে দেশ-কাল-পাত্র। সেই স্রোতে একই তরীতে ভেসে চলেছি তুমি আর আমি, আমি আর তুমি।

বহুজনের মধ্যে থেকেও শ্রীমতী আজ একা। আবার একান্ত থেকেও একাকিনী নয় সে। এক কৃষ্ণ আজ বহু হয়ে ধরা দিয়েছে তার কাছে। বহু এসে মিলিত হয়েছে একে।

মাঝে মাঝে লীলাছলে শ্রীমতীর সাথে লুকোচুরি খেলে শ্যামরায়। এই দর্শন—এই অদর্শন। এই আবির্ভাব, এই তিরোধান। এই আছে- এই নেই। পিছে পিছে ছুটে যায় শ্রীমতী। কখনো বালুকাসৈকতে, কখনো যমুনাসলিলে, কখনো গোষ্ঠ-প্রান্তরে, কখনো কুঞ্জকাননে। কখনো নীপ-তরুতলে, কখনো কেলি-কদম্বমূলে। তীব্র আনন্দের পুলকে মাঝে মাঝে অচেতন হয়ে পড়ে।

সন্দেহ-শংকায় জর্জরিত হয় সখীদের হৃদয়। তবে কি প্রেমে উন্মাদিনী হল শ্রীমতী। সংবাদ পাঠায় তারা বড়িমাকে।

বড়িমা এসে বিস্মিত হন শ্রীমতীর ভাব দেখে। সে যেন আর এ পৃথিবীর কেউ নয়। মৃন্ময়ী রাধা যেন আজ চিন্ময়ী রাধায় রূপান্তরিতা। ভক্তিতে অবনত হয়ে আসে বড়িমার মস্তক—বসতে যান তিনি শ্রীমতীর পদতলে।

পা সরিয়ে নিয়ে লজ্জিতা শ্রীমতী বলে—হে জীবনকান্ত, হে শ্যাম-

সুন্দর, পদতলে কেন? আমায় অপরাধিনী কোরো না। সমস্ত অভিমান যে আমি অর্পণ করেছি তোমার চরণে। হে মহিমময়, অহেতুক তোমার কৃপা, অতুলন তোমার প্রেম, তাই আমাকে তুমি প্রাণেশ্বরী বলে ডাক। কিন্তু আমি জানি, তোমার ক্রীতদাসীর চেয়েও নগণ্যা আমি। তোমার চরণ-স্পর্শেরও যোগ্যতা নেই আমার।

বড়িমার দুনয়নে অশ্রু ভরে এল। শ্রীমতী আর আমাকে দেখছে না, আমার মধ্যেও দেখছে তার শ্যামসুন্দরকে। শ্যামরূপ ছাড়া আজ আর কিছুই দর্শন করছে না তার নয়ন।

সখীদের ডেকে বললেন—শোনো ললিতা বিশাখা, শোনো বৃন্দা, শ্রীমতীর মধ্যে যে প্রেমের উন্মাদনা, তা বৈকুন্ঠ-দুর্লভ—গোলোকেরও কামনার বস্তু। এরই নাম দিব্যোন্মাদ।

'মর্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্মা
নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে।
তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো
ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ ॥'
—শ্রীমদ্‌ভাগবত ॥ ১১।২৯।৩২ ॥

সতের

মর্ত্যের মানুষ যদি ত্যাগ কোরে সর্বকর্মভার।
চির-আত্মনিবেদনে মগ্ন রয় সেবায় আমার ॥
মরণ-সাগরকূলে হয় তবে সে অমৃতময়।
আমা-ময় হয়ে শেষে আমাতেই হয়ে যায় লয় ॥

নিভৃত কাননের কস্তুরীগন্ধ ছড়িয়ে যায় দিকে দিকে। অন্ধকারে জ্বালা প্রদীপের আলো সহস্ররশ্মি বিস্তার করে। সমস্ত বৃন্দাবন আজ শ্রীরাধার ভাবস্পর্শে আকুল—ভক্তিপ্রণত তার চরণে। স্তব্ধ হয়ে গেছে নিন্দুকের রসনা। লুপ্ত হয়ে গেছে নাস্তিকের অবিশ্বাস। তটিনীর অমিত সলিল তটভূমি প্লাবিত করেছে।

আজ শ্রীরাধার জ্যোতির্ময় দিব্য রূপখানি একবার মাত্র যে দর্শন করে, তারই হৃদয়ে মুদ্রিত হয়ে যায় চিরতরে। তার অনুপম দেহকান্তিকে ছাপিয়ে জেগে উঠেছে আত্মার লাবণ্য। প্রেমের ব্যাকুলতাকে ছাপিয়ে জেগেছে এক ধ্যানের স্থিরতা—অনুভবের নীরবতা।

প্রাসাদকুঞ্জে তমালতরুমূলে রত্নবেদিকা। তার উপর পুঞ্জীভূত আলোকের মত জ্যোতি বিকিরণ করে বসে আছে শ্রীরাধা। ঈষদুন্মুক্ত ওষ্ঠাধর কম্পিত হচ্ছে। জিহ্বা বুঝি আপনা হতেই উচ্চারণ করছে কৃষ্ণনাম।

উর্ধ্বমুখী স্তিমিত দৃষ্টিতে মাখানো আনন্দ-মাধুরী। শীতল অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে দুটি ধারায়! এক সুরধুনী বুঝি আজ দুই হল।

পীতবসন পরেছে সদ্যস্নাতা শ্রীরাধা। সিক্ত কুন্তলে জড়ান সুগন্ধি ফুলের মালা। সমস্ত দেহে কুসুম-আভরণ পরিয়ে দিয়েছে সখীরা। রত্ন-আভরণ, কুসুম-আভরণ, নিরাভরণ—সব কিছুতেই আনন্দ আজ শ্রীরাধার। স্বয়ং মাধব যে হৃদয়ভূষণ হয়ে প্রতি মুহূর্তে আছে তার সাথে সাথে। মস্তকে তার শোভা পাচ্ছে পুষ্পমুকুট। দেখে মনে হচ্ছে সত্যই সে ব্রজের অধিষ্ঠাত্রী—ব্রজদেবী রাধারাণী। শ্রীরাধাকে ঘিরে অজস্র কুসুমের সমারোহ। তার ক্রোড়ে পার্শ্বে পদতলে—চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে কুসুমরাশি। ব্রজ-নারীগণ দলে দলে এসে ফুলের অর্ঘ নিবেদন করে তাকে প্রণাম জানিয়ে যাচ্ছে। শ্রীরাধার চরণে নিবেদিত হয়ে বৃন্দাবনের ফুল্ল কুসুমরাশি যেন আবার নূতন করে ফুটে উঠছে।

মাঝে মাঝে দিব্য হাস্য বিকশিত হচ্ছে শ্রীরাধার আননে। অস্ফুট মধুর কণ্ঠে অর্ধবাহ্য দশায় সে বলছে—হে কৃষ্ণ, হে মাধব, হে শ্যাম, এত কুসুম সাজে কেন সাজাচ্ছ আমায়? কেন এনেছ এত কুসুমের উপহার! বৃন্দাবনের এই সব পবিত্র কুসুমের সাথে একটি ক্ষুদ্র কুসুম হয়ে আমিও যে তোমার চরণে অর্ঘ্য হতে চাই। বলে ধরতে যায় পার্শ্ববর্তী সখীদের চরণ। বীণানিন্দিত সুরে হেসে উঠে বলে—তোমার চরণ সরিয়ে নিও না, হে শ্যামল, জীবন-মরণ সুখ-দুঃখ দিয়ে বক্ষের মাঝখানে নিবিড় করে জড়িয়ে ধরতে দাও।

সখীরাও নয়নজলে ভাসে। মনে মনে বলে—ওগো কৃষ্ণপ্রিয়া, একবার তোমার নয়ন দুটি আমাদের দাও। আমরা প্রাণভরে গোকুলচন্দের রূপ বারেকের জন্য দর্শন করি। সার্থক করি জীবন-যৌবন। কিন্তু শ্রীরাধা কেমন করে দেবে তার নয়ন। ক্ষণিকের অদর্শনও যে অসহনীয় তার কাছে।

তপস্বিনী বড়িমা এলেন আরতি-সম্ভার নিয়ে। আরতি করবেন তিনি আজ রাধারাণীকে।

বেজে উঠল আরতি-বাদ্য। পঞ্চপ্রদীপ হাতে তুলে নিয়ে বড়িমা আরতি করতে লাগলেন সেই আনন্দ-প্রতিমাকে। বাধা দিল না শ্রীরাধা—জানাল না কোন অসন্তোষ। বিহ্বল নয়নে তাকিয়ে হাসিমুখে বলল—দেখ দেখ নাথ, আরতি হচ্ছে তোমার। কিন্তু প্রিয়, কি প্রয়োজন এ আরতির। আমার

হৃদয়ে যে নিরন্তর তোমার আরতি চলছে! প্রেমই পূজা—প্রেমই আরাধনা—প্রেমই তোমার আরতি। পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের প্রদীপ জ্বেলে তোমায় আরতি করছি আমি। আরতি করছি আমার কেশের চামরে—নিঃশ্বাসের ব্যজনে—তোমার নামধূপের সুরভি ছড়িয়ে। অঞ্চলবস্ত্রে, আনন্দাশ্রুর শুভ্র কুসুমে শুচিতার জলশঙ্খে করছি তোমার আরতি। লীলাময় তবু বুঝি আশা মেটে না তোমার। তাই নিজেই নিজেকে আরতি করছ।

বলে সমবেত সকলের উপর দিয়ে শ্রীরাধা একবার চোখ বুলিয়ে নিল।

কখনো অর্ধবাহ্যদশায় কখনো বা বাহ্যদশায় কথা বলছে শ্রীরাধা। সখীদের বলল—একি সখি ললিতা, বিশাখা, চিত্রা, তোমরা আমার পদপ্রান্তে বসে আছ কেন? তার চেয়ে শ্যামসুন্দরের পদতলে বোস। সেবা কর তার চরণ-কমল দুখানি। এই দেখ, আমার পাশে বসে আছে মুরলীমনোহর। ওই তো ললিতা, তোমার পাশে গিয়ে সে দাঁড়াল—স্পর্শ করল তোমার নত মস্তক। সখি, ধন্য তোমরা, তোমাদের জন্যই প্রাণেশ্বরকে আবার ফিরে পেলাম। আর সখি বৃন্দা, তুমিই নন্দদুলালকে ফিরিয়ে এনেছ বৃন্দাবনে। তোমার এ ঋণ রাধা জীবন দিয়েও শোধ করতে পারবে না। আহা কত কৃপা আমার প্রেমময়ের। সে তোমাদের সকলকে একে একে স্পর্শ করে যাচ্ছে। স্বীকার করে নিচ্ছে তোমাদের সকলের প্রীতি।

একি একি ললিতা! তোমার মধ্যেও যে আমার শ্যামকে দেখতে পাচ্ছি। একটু একটু করে তুমিও শ্যাম হয়ে যাচ্ছ বিশাখা। সখি বিরজা, মায়া, চিত্রা, ইন্দুলেখা, তোমাদের প্রত্যেকের স্থানেই যে দাঁড়িয়ে আছে আমার কৃষ্ণ। তবে আমার সখীদের ছদ্মবেশেও তুমিই রয়েছ হে আমার জীবনাধার। বুঝেছি ছলনাময়, বুঝেছি তোমার ছলনা। আমার সেবা তুমি শুধু হাতে গ্রহণ করনি। তার বিনিময়ে তুমিও আমাকে সেবা করেছ সখীদের রূপ ধরে। যতটুকু পেয়েছ তার শতগুণ দিয়েছ ফিরিয়ে।

আর একি! আমার নয়ন হতে যে অশ্রুবিন্দু ঝরে পড়ছে তাও যে কৃষ্ণময়। আর সেই কৃষ্ণময় অশ্রুবিন্দুর স্পর্শ পেয়ে আমার দেহও যে কৃষ্ণ হয়ে গেল। আমার জীবনের প্রতি অণু-পরমাণু এক এক করে কৃষ্ণময় হয়ে যাচ্ছে। রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে আমার সমস্ত সত্ত্বা। আমার

দেহ-মন-প্রাণ কৃষ্ণ। অনুরাগ কৃষ্ণ। অনুভব কৃষ্ণ। কৃষ্ণময় হয়ে গেল আমার অন্তরাত্মা।

আমার আনন্দ বাক্যাতীত হয়ে কোন্ এক গভীর নীরবতার সাগরে ডুবে যাচ্ছে। ভাষাও আমার হারিয়ে গেল। আমার বলতে আজ আর আমার কিছুই রইল না। অবশেষে আমার চিন্তাও কৃষ্ণ হয়ে গেল।

কোথায় আমার শিখিচূড়া—বনমালা—পীত বসন। কোথায় আমার মোহন বাঁশরী। কোথায় রাধা, কোথা তুমি। কাছে এসো—আরো কাছে এসো। তোমার অনুপম চরণ-কমল দুখানি আমায় বক্ষে ধারণ করতে দাও। ওই লাবণ্যের প্রেমস্পর্শে আমার কৃষ্ণ অঙ্গ আজ গৌরাঙ্গ হোক। তোমার পরম প্রেমের আনন্দ-বেদনার মাধুরী হৃদয়ে বহন করে একবার ভিখারীর বেশে পথে পথে দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াই। তোমার মতই কেঁদে কেঁদে বলি—হা কৃষ্ণ, হা দয়িত, কোথা তুমি।

জগত জানুক আমার মাঝেই চিরদিন তুমি আছ, আর তোমার মাঝেই রয়েছি আমি।

———

দ্বিতীয় পর্ব: বিষ্ণুপ্রিয়া

"যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা।
সর্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা ॥"

—পদ্মপুরাণ ॥

বিষ্ণুর যেমন প্রিয় রাধা, রাধাকুণ্ড প্রিয় সেইমত।
সকল গোপীর মাঝে একা বিষ্ণুপ্রিয়া তাই সে নিয়ত ॥

অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশী ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরোভবেৎ ॥
—শ্রীমদ্‌ভাগবত ॥ ১০।৩৩।৩৬ ॥

এক

ভক্তজনের কল্যাণতরে নরদেহ ধ'রে করুণাময়।
যে-মধুর লীলা করেন প্রকাশ, শ্রবণে ভক্তি হয় উদয় ॥

'আমি' 'তুমি' মিলেমিশে একাকার হয়ে কার এই দুর্লভ অভিসার নদীয়ানগরে—নববৃন্দাবনে?

কে এই গৌরতনু নবীনকিশোর? অভিনব হেম-তরুর মত আনন্দে বিচরণ করে বেড়াচ্ছে কে এই নিখিলানন্দময় পুরুষ? মনে হয় লৌকিক পরিচয়ের আড়ালে লুকিয়ে আছে কি যেন এক অলৌকিক পরিচয়। ওই দুই চোখের গভীরে যেন নিহিত আছে মর্ত্যের মানবের জন্য এক অমৃত-আলোক। একে যে চিনেও চিনি নে—জেনেও জানি নে।

মনে মনে ভাবেন প্রভু অদ্বৈতাচার্য। তবে কি মিশ্রতনয়রূপে এই সেই অখিলরসামৃতসিন্ধু প্রেমাস্পদ, যার আবির্ভাব কামনা করে আমি প্রার্থনা জানিয়ে এসেছি এতকাল? সেই কৃষ্ণকিশোরই কি আজ হল গৌর-কিশোর? সেই বৃন্দাবন-বিহারীই কি আজ এসেছে নদীয়া-বিহারী হয়ে?

তবে নয়নে কোথায় সে করুণাঘন দৃষ্টি—এ যে দীপ্ত বুদ্ধির শাণিত

কঠোরতা। কোথায় সে কল্পতরুস্বভাব—সেই স্পর্শমণি-প্রতিমতা—সেই দিব্যদ্যুতিবিলাস ?

ভেবে পান না প্রভু অদ্বৈত। মনে মনে সংশয়ের দ্বিধা, অথচ অন্তরের গভীরে কোথায় যেন এক স্থির প্রত্যয়। হয়তো এ সেই লীলাময়ের স্বেচ্ছাকৃত আত্মবিস্মরণ—অথবা কি কৌতুকছলে আত্মগোপন ?

আচার্য শুধু ভাবেন আর ভাবেন।

আর ভাবে সনাতন-দুহিতা শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া।

কাকে আজ সে দেখে এলো গঙ্গার ঘাটে স্নান করতে গিয়ে ? আর সেই ক্ষণিক দেখার মুহূর্তটি কেন অনন্ত মুহূর্ত হয়ে দেখা দিল। সেই কুঞ্চিত চারু কেশদাম—সেই চম্পক গৌরকান্তি—সেই দীপ্ত উন্নত দেহঠাম। সে কেন চোখের মণি বেয়ে চলে এলো স্মৃতির মণিকোঠায় ? কে সে ? তার জীবনের কোন্ সে অনাগত-বিধাতা ?

কিশোরী বিষ্ণুপ্রিয়ার ধীরতা সহসা আজ এক অচঞ্চল অধীরতায় পরিণত। যেন দিব্যদর্শন প্রসাদে কোন্ অজানিত নিমেষে বয়ঃসন্ধি পার হয়ে তারুণ্য আর যৌবনের মিলিত ভাব-সোপানে উপনীত। কি অপরূপ বিস্ময় সে আজ তার নিজের কাছেই !

মনে মনে কত কি ভাবে বিষ্ণুপ্রিয়া।

সেই এক দেখা আর এই এক দেখা।

রাজপণ্ডিত পিতার মুখে কতবার কতভাবে বিষ্ণুপ্রিয়া শুনেছে বৃন্দাবনের লীলাকাহিনী। গায়ক-কথকের মুখে শুনেছে যমুনাতীরে শ্রীমতী রাধার শ্রীকৃষ্ণ দর্শনের অনুপম অমৃতকথা তখন শুধু ভক্তমনের অকল্প কল্পনা বলেই ভেবেছে বিষ্ণুপ্রিয়া। ভেবেছে বাস্তবে মাটির পৃথিবীতে এ পরম সংঘটন কখনো সম্ভব নয়। সম্ভব হতে পারে না শ্রীমতীর সেই পরমপ্রেমসংবেদন।

কিন্তু আজ গঙ্গাতীরের এই দুর্লভ দর্শন যেন কি যোগসূত্রে বাঁধা আছে সেই ভাগবতী আখ্যানের সাথে।

সব ধারণা ওলট-পালট হয়ে গেছে তার। পুরাণের আধারে যা অসম্ভব মনে হয়েছিল সে যেন আজ তাকেই অবলম্বন করে সম্ভাবিত ইতিহাসে পরিণত হতে চলেছে।

বিষ্ণুপ্রিয়াকে বুঝি হতে হবে শ্রীরাধা-সূত্রের ভাবভাষ্য।

সেখানে যমুনা আর এখানে গঙ্গা। তাই প্রেমযমুনা আজ ভাবগঙ্গায় প্রতীকিত হয়ে সঙ্গমের মহাতীর্থ।

সজ্জনমুখে ভাগবতকথা শুনতে শুনতে কতবার ভেবেছে বিষ্ণুপ্রিয়া, কেমন সে শ্রীমতীর প্রেমভক্তি—যা অমৃত-স্বরূপা—যা পেয়ে অন্তরাত্মা তৃপ্ত হয়, স্তব্ধ হয়। সে ভক্তির একবিন্দুও কি লাভ করা সম্ভব তার মত মানবীর পক্ষে? নাকি এ শুধু আদর্শই—চিরকাল অনায়ত্ত ধ্রুবতারা হয়ে জেগে থাকবে সুদূর আকাশে?

আজ সেই প্রশ্নের অসংশয় উত্তর এসেছে বিষ্ণুপ্রিয়ার জীবনে। আদর্শের ধ্রুবতারা আজ গৃহপ্রদীপ হয়ে জলে উঠেছে অন্তরে। একদিন শ্রীরাধার দিব্যপ্রেমের একবিন্দুমাত্র মনে মনে আস্বাদ করতে চেয়েছিল বিষ্ণুপ্রিয়া, আজ অঞ্জলিভরে বুঝি তা পান করে এলো সুরধুনীতীর থেকে।

তবু তো বোঝা যাচ্ছে না তার স্বাদ। সে কি আনন্দ, না বেদনা? এ যদি আনন্দ তবে কেন এই হৃদয়ের আর্ত আবেদন! এ যদি বেদনা তবে কেন এই পুলক-শিহরণ! চেতনার কোন্ কেন্দ্রে, কোন্ প্রাণকোষে এর জন্ম? এত স্মৃতি এত প্রজ্ঞা নিয়ে আসে প্রেম! আনে এত অনুচিন্তন—এত অনুশীলন!

ধীরে ধীরে উঠে গিয়ে দক্ষিণের বাতায়নে দাঁড়াল প্রিয়া। দূরে তাকিয়ে সমস্ত অন্তরাল ভেদ করে যেন দেখতে চাইল সেই গঙ্গাতীর—তীরের সেই স্নানঘাট—আর স্নানঘাটের অদূরে সেই গৌরমনোহর তনু।

বিষ্ণুপ্রিয়া মনে মনে বলল—আমি তো তোমাকে দেখতে চাই নি, তুমিই যে এসে দাঁড়ালে আমার চোখের আগে। কিন্তু তবু তোমার দৃষ্টি তো আমার হৃদয়ে এসে লাগে নি। সে দৃষ্টি ছিল যেন অহঙ্কৃত—উদাসীন—অথবা হয়তো আপনাতে আপনি বিভোর।

জানতে পারে নি বিষ্ণুপ্রিয়া কখন সখি কাঞ্চনা এসে দাঁড়িয়েছে তার পেছনে। হঠাৎ তার হাসি শোনা গেল। শোনা গেল কৌতূহলী প্রশ্ন।

: এমন করে একান্তমনে কি দেখছিস্ প্রিয়া? এখান থেকেই আজ গঙ্গাস্নান সেরে নিতে চাস্ নাকি?

বিষ্ণুপ্রিয়া ফিরে তাকাল।

: কখন তুই এলি কাঞ্চনা? এত নিঃশব্দে!

নিঃশব্দ পদ-সঞ্চারেই এসেছে কাঞ্চনা—যেন ঠিক প্রেমের আবির্ভাবের মত। কে জানে কোন্ নিমেষে কেমন করে আসে প্রেম। কি কৌশলে মনের রুদ্ধদ্বার অনায়াসে খুলে চলে যায় জীবনের অন্তঃপুরে।

গঙ্গার ঘাটে স্নানে যাবার জন্য তৈরী হয়েই এসেছে কাঞ্চনা। তাগিদের সুরে বলল—আর দেরী কিসের প্রিয়া? স্নানের বেলা যে বয়ে যায়।

নিরুত্তর দাঁড়িয়ে আছে বিষ্ণুপ্রিয়া।

বয়ে যাক বেলা। ওই সাগরাভিমুখী গঙ্গার ধারা বেয়ে বয়ে যাক্ তার সমস্ত বেলা। বয়ে যাক্ তার বেদনা গঙ্গা থেকে যমুনায়।

অবশেষে মৃদুকণ্ঠে বলল—আজ আর আমি গঙ্গার ঘাটে স্নানে যাবো না সখি।

কাঞ্চনার কণ্ঠে জেগে উঠল বিস্ময়-ছোঁয়া কোমল হাসির তরঙ্গ। বলল—অথচ দেখছি স্নানের সব আয়োজনই করে রেখেছিস্। বস্ত্র কলসী অঙ্গমার্জনী তৈল-হরিদ্রা—সবই যে প্রস্তুত।

সত্য বটে। অজানিত মনে কখন সে প্রস্তুত হয়েছে স্নানে যাবার জন্যে তা নিজেই জানতে পারেনি। চেতন মনের কাছে ধরা পড়ে গেছে তার অবচেতন মনের প্রহেলিকা।

লজ্জা গোপন করে বলল—সবই প্রস্তুত; কিন্তু আমি নিজে প্রস্তুত নই কাঞ্চনা। গঙ্গার ঘাটে আর আমি যাবো না।

এবার যথার্থই বিস্মিত হল কাঞ্চনা।

: কেন সখি, এতকাল তো গঙ্গাস্নানে অনিচ্ছা দেখিনি কখনো। নিয়মিত স্নানে গেছিস্ দুবেলা। পূজা-পার্বণ ব্রত-উপবাসে আরো গেছিস্ কতবার। আজ কেন তোর এ অদ্ভুত খেয়াল?

নিজের বিপন্নতা ঢাকতে গিয়ে বিষ্ণুপ্রিয়া শাড়ির আঁচল আঙুলে জড়ায়। মনের কথা বলা যায় না মুখ ফুটে।

কাঞ্চনা যেন প্রিয়ার মনোভাব অনুমান করতে পারল। কৌতুকভরে বলল—জানতে পারি কি কে আমার সখীর স্নানের বিঘ্ন ঘটিয়েছে? কার প্রতি সখীর এ ছদ্ম-বিরূপতা?

বিষ্ণুপ্রিয়া তার প্রিয়সখীর কাছে অন্তরের অনেক কথাই বলতে চাইল। কিন্তু শুধু বলতে পারল—কাল স্নানের ঘাটে সেই উদ্ধত যুবকের কথা মনে পড়ে কি? বড় যেন অহংকার তার—কত যেন তুচ্ছ তাচ্ছিল্য সকলের প্রতি।

অথচ বিষ্ণুপ্রিয়ার মন মৌনভাষায় অন্য কথা বলল—যাকে তুমি অহংকার বলছ সে বুঝি তার আত্মপ্রত্যয়। সে যে আপনাতে আপনি পূর্ণ আত্মারাম, তাই অপরের প্রতি তাকে উদাসীন বলে মনে হয়।

বুদ্ধিমতী কাঞ্চনা সহজেই সব বুঝতে পারল। ঈষৎ হেসে বলল—তুই যার কথা বলছিস্ সে তো জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র নিমাই পণ্ডিত। বোধহয় আগে আর কখনো তাকে দেখিস্ নি।

দৃষ্টি আনত করল বিষ্ণুপ্রিয়া। মৃদুকণ্ঠে বলল—এই তবে নদীয়ার সেই নবীন অধ্যাপক যিনি দিগ্বিজয়ী কেশব কাশ্মীরীকে পরাজিত করেছেন—যার পাণ্ডিত্যের প্রশংসা শোনা যায় টোলের ছাত্রদের মুখে মুখে। যার গুণগানে আমার পিতা পঞ্চমুখ।

আর একথাও জানে কি বিষ্ণুপ্রিয়া যে এই সেই নদীয়ার প্রাণপ্রদীপ, যার মুহূর্ত বিচ্ছেদও অসহনীয়। যার বিরহ ভুজঙ্গ হয়ে দংশন করেছিল পত্নী লক্ষ্মীপ্রিয়াকে।

কাঞ্চনা প্রিয়ার কথায় সম্মতি জানিয়ে বলল—নিমাই পণ্ডিতকে তুই চিনিস্ বা না-চিনিস্ সখি, এঁর মা শচীদেবীকে ভাল করেই চিনিস্। রোজ গঙ্গার ঘাটে দেখা হলেই তাঁকে তুই ভক্তিভরে প্রণাম করিস্ আর তিনিও তোকে প্রাণভরে আশীর্বাদ করেন।

কি এক অকারণ পুলকে শিহরিত হয়ে বিষ্ণুপ্রিয়া মনে মনে ভাবল—এর পর যেদিন আবার শচীদেবীর সঙ্গে দেখা হবে সেদিন দুটি প্রণাম মিলিত করে নিবেদন করব তাঁর পায়ে।

মনের আসনে শচীদেবী আজ থেকে আমার শচীমাতা।

"মায়াবাদকুতর্কপুঞ্জতিমিরান্ স্বজ্যোৎস্নয়াহস্তয়ন্।
ভক্তিং ভাগবতীং প্রপন্ন হৃদয়ে কারুণ্যয়া ভাসয়ন্॥
বিস্রব্ধং মাধুর্য্যং প্রতিপদনবং স্বান্তরঙ্গে প্রযচ্ছন্।
নটস্তং গৌরাঙ্গং স্মরতু মে মনঃ শ্রীলক্ষ্মী-বিষ্ণুপ্রিয়েশম্॥"
—বাসুদেব সার্বভৌম॥

দুই

মাযাবাদ-কুতর্ক-আঁধার আপন জ্যোৎস্নায় করে দূর।
ভাগবতীভক্তিময় প্রাণ করুণায় করে পরিপুর॥
যে-বিলায় অন্তরঙ্গজনে নিত্যনব শান্তির অমিয়া।
লক্ষ্মী-বিষ্ণুপ্রিয়েশ যে গৌর তাঁহাকে স্মরুক্ মোর হিয়া॥

কে তুমি শচীনন্দন বিশ্বম্ভর ?
কে তুমি কনক-কান্তি নব-নটবর ?
কি তোমার সত্য পরিচয় ?

সমাহিত চেতনায় প্রভু অদ্বৈতাচার্য খুঁজে চলেন তাঁর সব প্রশ্নের উত্তর। নীরবতার পথ বেয়ে এগিয়ে চলেন চিন্তাস্পন্দনহীন অনাহত বোধিচেতনার পানে।

সহসা একসময় ভাস্বর পটভূমিতে যেন উদ্ভাসিত হয় এক অনুচ্চারিত অনুভবশ্রুত বাণী। চলে অলৌকিক সংলাপের প্রশ্নোত্তর।

ইনিই সেই। তোমার আর্তিময় প্রার্থনাকে উপলক্ষ করে তাঁরই অবতরণ ঘটেছে। ভাল করে দেখে নাও—চিনে নাও তাঁকে। গোলোকবিহারী যিনি, যিনি বৃন্দাবন-বিহারী, তিনিই নদীয়া-বিহারী হয়ে আবার এসেছেন বাংলার কুটীর-আঙ্গিনায়। 'সোঽহম্' এবার এসেছেন 'দাসোঽহম্' হয়ে।

তবে কোথায় সে শ্যামতনু ?

সে যে নিজেকে আজ হারিয়ে ফেলেছে। রাধারূপের প্রেমসায়রে ডুব দিয়ে শ্যামরূপ আজ গৌর হয়েছে। লীলাবিলাসের এ যে এক অপরূপ রূপায়ন।

কিন্তু কেন এই রাধাকৃষ্ণমিলিততনু বিগ্রহ ?

কি-ই বা এর রহস্য ?

সেই ভুবনবন্ধু যে করুণাসিন্ধু হয়ে এবার শুধু বিলিযে দিতে এসেছেন। এসেছেন নাম বিলাতে, প্রেম বিলাতে—অবশেষে নিজেকে বিলিযে দিতে। পতিত-উদ্ধারের জন্য অভিনব বেশে এসেছেন আজ পতিত-পাবন। কিন্তু এখনো বোধন হয়নি দেবতার। এখনো স্বর্গের সুরভি আবদ্ধ আছে কুসুমের মর্মকোষে।

আচার্যের সমাহিত হৃদয প্রার্থনা রাখে দিব্যচেতনার পদপ্রান্তে—বল বল হে পূর্ণ, যদি আরো কিছু গভীর বার্তা থাকে। এর চেযেও গোপনতর—গূঢ়তম যে রহস্য তা জানতে দাও আমায।

অনন্ত প্রজ্ঞালোকের দ্বার খুলে যায আচার্যের অন্তরাত্মায—শুনতে পান তিনি সূক্ষ্মতম আলোকের বাণী।

তবে শোনো, পরমতম অন্তরঙ্গ যে অমৃতবার্তা। এবার এসেছেন তিনি শ্রীরাধার প্রেমের ঋণ পরিশোধ করতে। আর এসেছেন শ্রীরাধার প্রেমমহিমা অনুভব করতে। যে-পূর্ণতম পুরুষের কোনো অভাবই নেই, তার যে থেকে গেল একটি অভাব। নিজেকে ভালবাসার আস্বাদ নিজে কখনো পাননি তিনি। শ্রীমতী রাধা কি মাধুর্য পেয়েছে তাঁর মধ্যে আর কেমনই বা সেই মাধুরীর মিলনবিরহময় আনন্দ তা জানতে চান তিনি নিজে। সে ইচ্ছার পূর্ণতার জন্যই আজ ইচ্ছাময রাধার ভাবকান্তি অঙ্গীকার করেছেন। তিনি আজ কৃষ্ণময়ী রাধার প্রেমঋণ শোধ করবার জন্যে হযেছেন রাধাময় কৃষ্ণ।

নদীয়াবিহারী গৌরসুন্দরের এই নিগূঢ় তত্ত্বরহস্য অনুভব করে আচার্যের সমাহিত বোধিচিত্ত আবার ধীরে ধীরে ফিরে এলো বুদ্ধির জগতে। আর তখনি আবার দেখা দিল সংকল্প-বিকল্প-জাত সন্দেহ-সংশয়।

আমি যা জেনেছি, যা অনুভব করেছি আমার অলৌকিক সংবেদনে, তার আছে কি কোনো লৌকিক সত্যতা ? শাস্ত্রে কি আছে এর সমর্থন ? আছে কি এই অপূর্ব অনুভাবিত সংবাদের কোথাও কোনো ইঙ্গিত ?

শাস্ত্র-সাগর মন্থন করতে সুরু করলেন আচার্য। নইলে যে ঘোচে না লৌকিক মনের যুক্তির সংশয়।

যে-সব শাস্ত্র-পুরাণ পূর্বে বহুবার পড়েছেন তা আবার নূতন করে অধ্যয়ন করতে করতে মাঝে মাঝে চমকে উঠতে লাগলেন প্রভু অদ্বৈত। বহু শ্লোক-সূত্রের অনুপলব্ধ ইঙ্গিত উজ্জ্বল হয়ে চোখের সামনে মনের দর্পণে ফুটে উঠতে লাগল। এই তো বলছেন স্বয়ং ভাগবতকার. চার যুগে অবতারের চারটি দেহবর্ণের কথা—"শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গত"। দ্বাপরে ভগবান কৃষ্ণতাপ্রাপ্ত আর অন্য তিন যুগে শুক্ল রক্ত ও পীতবর্ণ। তবে কে এই পীতবর্ণ অবতার? কার ইঙ্গিত রয়েছে শ্রীমদ্‌ভাগবতের ভবিষ্যবাণীতে?

পুলকে রোমাঞ্চিত হল আচার্যের দেহ। এই তো মহাভারতে সহস্র-নামস্তোত্রে তার উপলব্ধ সত্যের আরো সুস্পষ্ট সমর্থন। সেখানে বন্দনা করা হয়েছে সুবর্ণবর্ণ হেমাঙ্গ সন্ন্যাসকৃৎ পুরুষকে, যিনি নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণ। এখানেও ভক্ত তার সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিতে যে হেমাঙ্গ ভগবানকে দর্শন করেছেন তিনিই কি তবে সত্য সত্য আবির্ভূত শচীনন্দন গৌরাঙ্গরূপে? কিন্তু একটি বিষয়ে যে সামঞ্জস্য হচ্ছে না। গৌরাঙ্গ তো 'সন্ন্যাসকৃৎ' নয়, সংসারের সীমাবন্ধনে সে যে অতিমাত্র আবদ্ধ।

কিন্তু মন বলছে এ ভবিষ্যদ্বাণীও অবশ্য সিদ্ধ হবে একদিন। অনুক্ষণ গঙ্গাজল আর তুলসীমঞ্জরী সমর্পণ করে প্রার্থনাহুঙ্কারে যে ভগবানকে তিনি নদীয়ায় আকর্ষণ করে এনেছেন, এবার তাকে জাগাবার জন্য বোধনপ্রক্রিয়াও করতে হবে তাঁকেই। মৃন্ময় প্রদীপে এখনো জাগেনি চিন্ময় আলোক-দ্যুতি।

যে অকৃষ্ণবর্ণ অবতারের ইঙ্গিত করা হয়েছে ভাগবতে, তার মুখে নিরন্তর উচ্চারিত হবে কৃষ্ণনাম—সঙ্গে থাকবে অগণিত ভক্তপার্ষদগণ, অবিরাম সংকীর্তনই হবে তার যজ্ঞ।

কোথায় সে সব আয়োজন? শচীনন্দন গৌরাঙ্গ যে সদাহাস্যময় রঙ্গপ্রিয় পণ্ডিতাভিমানী অধ্যাপকমাত্র।

কিন্তু তবু আমি কি মাঝে মাঝে লক্ষ্য করিনি তার আকস্মিক ভাবান্তর? পরিহাস-চপলতার মধ্যপথে সহসা তার অকারণ উদাসীনতা? অধ্যয়ন-অধ্যাপনার নির্বাধ নিপুণ বাক্যবিন্যাসের মাঝে অপ্রত্যাশিত ক্ষণিকস্তব্ধতা?

আরো ভাবলেন আচার্য। বিশ্লেষণ করে দেখলেন যুক্তি-বুদ্ধি দিয়ে। মনে

পড়ল নিমাই-এর নব-যৌবনের উচ্ছ্বাস-উদ্বেলতার মাঝে সেই অসামান্য শান্ত-স্থৈর্যের সমাচার। শৈশব-সঙ্গিনী যে-লক্ষ্মীপ্রিয়াকে তিনি অনুরাগে স্বেচ্ছায় পত্নীত্বে বরণ করেছিলেন তার অকালমৃত্যুর সংবাদ যখন শুনতে পেলেন পূর্বদেশ-পরিক্রমা শেষে ঘরে ফিরে এসে, তখন কি অবিচলিত ধৈর্যে সংযত করেছিলেন নিজেকে। মাতাকে সান্ত্বনা দিয়ে নাকি বলেছিলেন—কে কার পতি-পুত্র-বন্ধু-জায়া, সবই মোহমাত্র।

নদীয়া থেকে শান্তিপুরের নাতিদীর্ঘ ব্যবধান অতিক্রম করে সব সংবাদই এসে পৌঁছায় আচার্যের কাছে। কে যেন তাঁর অন্তরের মধ্য থেকে সিদ্ধান্ত উপস্থিত করে—এ যে এক ভাবসমুদ্র। উপরে তার শততরঙ্গভঙ্গ, কিন্তু অতল গভীরে প্রশান্ত নীরবতা।

গোধূলির ঈষৎ স্বর্ণাভ ম্লানিমা নেমে এসেছে আচার্যের কুটীরে, প্রাঙ্গণে—ছেয়ে এসেছে কি এক রহস্যময়তা। চিন্তাকুল প্রাণে উঠে দাঁড়ালেন আচার্য। গৌরকান্তি শ্যামসুন্দরের আবির্ভাবের ইঙ্গিত তিনি খুঁজে পেয়েছেন একাধিক পুরাণগ্রন্থে—পেয়েছেন মহাভারতে, ভাগবতে, পেয়েছেন আপন চেতনার প্রজ্ঞাবাণীতে।

তবু থেকে যায় কিছু সংশয়-জিজ্ঞাসা। মিশ্রতনয় গৌরাঙ্গই কি সেই রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত কৃষ্ণস্বরূপ? এত কাছাকাছি—এত আপনার! তবে সামঞ্জস্য হচ্ছে না কেন সামগ্রিক বর্ণনার সঙ্গে?

অকস্মাৎ অপূর্ব পদ্মগন্ধ। বিস্মিত হলেন আচার্য। গন্ধের উৎস-সন্ধানে সামনে তাকিয়ে যে-দৃশ্য দেখতে পেলেন তাতে সমস্ত দেহ শিহরিত হল। গোধূলির অস্পষ্ট কোমল আলোকে মনে হল যেন গৌরাঙ্গ এসে দাঁড়িয়েছে দুয়ারের কাছে। কিন্তু এ তার কি বেশ। মাথায় নেই সেই কুঞ্চিত কৃষ্ণ কেশকলাপ, নেই বেশবাসের পারিপাট্য—এ যে মুণ্ডিতমস্তক গৈরিকবসন দণ্ডকমণ্ডলুধারী সন্ন্যাসী। মুখে উচ্চারিত মধুময় কৃষ্ণনাম—দুনয়নে অবিশ্রাম জলধারা।

আচার্যের দুই কর আপনা হতেই যুক্ত হয়ে গেল। অন্তরে নেমে এলো প্রণাম। পরক্ষণে দুইবাহু সম্মুখে প্রসারিত করে ভাবরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন—তবে কি সত্যই তুমি এলে প্রভু। সত্য তবে আমার অন্তরের প্রত্যাদেশ—সত্য তবে শাস্ত্রের ইঙ্গিত।

কয়েক পা এগিয়ে গেলেন আচার্য। আবার থমকে দাঁড়ালেন। মনে আশঙ্কা হল হয়তো এ অলৌকিক আবির্ভাব মুহূর্তেই তিরোহিত হবে সন্ধ্যার আসন্ন আঁধারে।

কিন্তু সে মূর্তি যে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে—ক্রমে স্পষ্ট হয়ে উঠছে সর্ব অবয়ব। না, এতো স্বপ্ন নয়, মায়া নয়, মতিভ্রমও নয়।

ঃ গোরাচাঁদ, আমার প্রাণের গৌরাঙ্গ, একি বেশ আজ তোমার!

আনন্দ-বিষাদ মেশা স্বর জেগে উঠল অদ্বৈতাচার্যের কণ্ঠে।

সন্ন্যাসী আরো এগিয়ে এলেন। মুখোমুখি হয়ে দাঁড়িয়ে শান্ত মৃদুকণ্ঠে বললেন—আমি গৌরাঙ্গ নই আচার্য।

অদ্বৈত প্রভু ভাল করে তার মুখের পানে তাকালেন। এক অপরিচিত বৈষ্ণব সন্ন্যাসী। ভজনপ্রভায় অপরূপ তেজোময়।

আচার্য সাগ্রহে প্রশ্ন করলেন—কে আপনি সন্ন্যাসী?

যুক্ত করে প্রণাম জানিয়ে সন্ন্যাসী বললেন—আমি একজন নগণ্য বৈষ্ণব। আপনাকে দর্শন করতে এসেছি।

ঃ বৃথা কেন এই ছলনা? কেনই বা আত্মগোপনের চেষ্টা? আপনি তো সামান্য সন্ন্যাসী নন।

বললেন আচার্য অদ্বৈত।

সন্ন্যাসী হাসলেন, বললেন—আপনার কাছে আত্মগোপন কি করে সম্ভব। আমি শ্রীকৃষ্ণের দাসানুদাস ঈশ্বরপুরী।

ঃ মহাত্মা ঈশ্বরপুরী! সসম্ভ্রমে দুপা পিছিয়ে গেলেন আচার্য।—আমার কুটীর আজ আপনার পদরজে পবিত্র হল।

ঈশ্বরপুরী বিনীত কণ্ঠে বললেন—আচার্য অদ্বৈত, আপনার কুটীর পবিত্রতার অপেক্ষা রাখে না, কারণ আপনি স্বয়ং তীর্থীভূত। আমি এক বিশেষ কর্তব্য-সাধনেই এখানে এসেছি, কিন্তু আমার পরিচয় নদীয়াবাসীর কাছে গোপনেই রাখতে চাই। ভগবৎ-নির্দিষ্ট এ কাজে আপনাকে আমার সহায় হতে হবে।

ঃ আদেশ করুন মহাত্মা।

ঃ অতি গম্ভীর বিষয়। আমি জানতে পেরেছি যে আপনার ভজন-প্রার্থনার আকর্ষণ অবলম্বন করে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র স্বয়ং আবির্ভূত হয়েছেন নদীয়ায়। খুঁজে বের করতে হবে তাঁকে। তারপর হবে তার বোধন—স্বরূপের জাগরণ। সেই ভার পড়েছে আমাদের উপর।

ঃ কি আদেশ এই অভাজনের প্রতি ?

জানতে চাইলেন আচার্যদেব।

উত্তরে মহাত্মা পুরী বললেন—নব-অবতার শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে স্বচেতনা জাগিয়ে তুলে তাঁকে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে আবাহন করতে হবে। কিন্তু পার্থিব প্রেমের মধ্য দিয়েই হবে তাঁর বিস্মৃতিমুক্তি—হবে আত্মপ্রেমের জাগরণ। এ কার্যে আপনার দায়িত্ব প্রচুর।

ঃ এ সব কথা আমিও ভেবেছি অনেকবার। কিন্তু বুঝতে পারিনি কোন্ পথে অগ্রসর হতে হবে।

ঃ প্রথমেই খুঁজে চিনে নিতে হবে তাঁকে।

ঃ চিনতে তাঁকে আমি পেরেছি আর নিঃসংশয়ও হয়েছি আজ। এবার এসেছেন তিনি গৌরতনু ধারণ করে। জগন্নাথ মিশ্রের তনয়রূপে। নন্দদুলাল এবার শচীদুলাল।

ঃ আমিও তাই অনুভবে বুঝেছিলাম। বর্তমানে কি তার সাংসারিক স্থিতি ? কোন্ আশ্রম অবলম্বন করে আছেন তিনি ?

ঃ গার্হস্থ্য আশ্রমে আছেন, কিন্তু বিপত্নীক। পত্নী লক্ষীপ্রিয়ার বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তি ঘটেছে।

ঃ তবে বর্তমানে তিনি না গৃহস্থ, না সন্ন্যাসী। তাই হৃদয় শূন্য—বিঘ্নিত হচ্ছে প্রকাশ। আবার তাঁকে সংসারজীবনে নিয়ে আসতে হবে—দিতে হবে লৌকিক প্রেমের স্পর্শ।

ঃ এর কি যথার্থই প্রয়োজন আছে ?

ঃ অবশ্যই। পার্থিব প্রেম একবার যদি খুলে দেয় হৃদয়ের রুদ্ধদ্বার, তবে সেই পথেই এসে প্রবেশ করবে অপার্থিব অলৌকিক প্রেম। সুরু হবে রাগভক্তির পথে অনন্ত যাত্রা। তাছাড়া—

ঃ তাছাড়া কি, বলুন।

ঃ আছে আরো এক গভীর তাৎপর্য। বহু বেদনার অশ্রুপাতেই একটি মহিমার ফুল ফোটে। গৌরাঙ্গের মহিমাকে যদি ফুল হয়ে ফুটতে হয় তবে কে হবে বেদনার অশ্রুপ্রতিমা ? যে পরমপ্রেমের অমৃতফল বিতরণ করতে হবে গৌরসুন্দরকে, তার পটভূমিতে থাকা চাই আর একটি জীবনের অনন্ত বিরহ-সাধনা। উভয়ের মিলিত সাধনা ব্যতীত পতিত-উদ্ধারের বিপুল যজ্ঞ সম্পূর্ণ হতে পারে না।

অদ্বৈতাচার্য নীরবে চিন্তা করলেন কিছুকাল। তারপর বললেন—তাই যদি লীলাময়ের অভিপ্রায় তবে কেন লক্ষ্মীপ্রিয়ার তিরোধান ঘটল ?

সুদূরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে ঈশ্বরপুরী যেন ধ্যানস্থ রইলেন কিছুকাল—যেন মহাকালের সভায় প্রবেশ করে জেনে নিলেন মহা-রহস্যের প্রকৃত স্বরূপ। ঈষৎ হাসির আভা ফুটিয়ে তিনি বললেন—আপনি কি বুঝতে পারেন নি আচার্য। লক্ষ্মীপ্রিয়া ছিলেন স্বয়ং লক্ষ্মীস্বরূপিনী। তার পক্ষে গোবিন্দের ক্ষণিক বিচ্ছেদও অসহনীয়। গৌরাঙ্গের দেশান্তরগমনে তাই বিরহ-ভূজঙ্গের দংশনে তাঁর দেহপাত হল।

প্রভু অদ্বৈতের স্মরণ হল সেই পুরাণ কাহিনী। শ্রীকৃষ্ণ একদা পরিহাসছলে রুক্মিণীকে বলেছিলেন তাঁকে ত্যাগ করার কথা। তাঁর সেই পরিহাসবাণী শুনে বিচ্ছেদের আশঙ্কায় তৎক্ষণাৎ দেবী অচেতন হয়ে ভূমিলগ্ন হয়েছিলেন। তাই লক্ষ্মীপ্রিয়ার মৃত্যুর যে তাৎপর্য প্রকাশ করলেন মহাত্মা ঈশ্বরপুরী তা অদ্বৈতের কাছে যুক্তিযুক্ত বলেই মনে হল।

তিনি বললেন—তবে এমন শক্তি কার আছে যা নেই স্বয়ং লক্ষ্মীর ? কে আছে এমন যে এই অসীম বিরহ বেদনা সহ্য করতে পারবে ?

: একমাত্র শ্রীমতী রাধারাণীরই সে শক্তি আছে। আর থাকতে পারে সেই মহীয়সীর মধ্যে যিনি রাধারাণার শক্তিতে শক্তিময়ী। নইলে কার এমন সাধ্য যে গৌরবিরহের অনন্ত দহনে তিলে তিলে দগ্ধ হবে—উত্তীর্ণ হবে এই সর্বস্বত্যাগের অগ্নিপরীক্ষায়।

চিন্তাকুল হলেন অদ্বৈতপ্রভু। কৃষ্ণলীলার মর্মজ্ঞ ঈশ্বরপুরীর কাছে মেলে ধরলেন তার মনের ব্যাকুল জিজ্ঞাসা।

: তবে সে কে ? এমন কে আছে এ নদীয়ামণ্ডলে যে গৌরাঙ্গপ্রিয়া হয়ে এই নিদারুণ দুঃখ-সাধনায় সক্ষম ? কার মধ্যে নিহিত আছে শ্রীরাধার শক্তিমহিমা ?

নির্দ্বিধায় স্মিতহাস্যে ঈশ্বরপুরী বললেন—

সনাতন পণ্ডিতের কন্যা শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া।

অধিকারী নহোঁ মুঞি করোঁ পরমাদ।
গোরাগুণ কহিবারে বড় লাগে সাধ ॥
যে হউ সে হউ কথা কহিব অবশ্য।
সাবধানে শুন সবে নদীয়া-রহস্য ॥

—ঠাকুর লোচনদাস

তিন

মনে মনে স্বয়ংবরা হয়েছে বিষ্ণুপ্রিয়া। কিন্তু মনের কথা খুলে বলতে পারে না কারু কাছে—এমন কি সবচেয়ে অন্তরঙ্গ সখী-সঙ্গিনীদের কাছেও নয়। অথচ অন্তরের দুর্বার ভাব-নির্ঝর ভাষার উৎস-মুখে নিঃসৃত হতে চায়। নিষ্ঠুরের মত তাকে চেপে রাখতে হয়। গতিপথ রুদ্ধ করতে হয় পাথরের মত ভারী নির্বাক নৈঃশব্দ্য দিয়ে।

হঠাৎ কোথা থেকে উড়ে এলো এক চন্দনা পাখি। এসে বসল বিষ্ণুপ্রিয়ার জানালায়। অনায়াসেই তাকে ধরতে পারল বিষ্ণুপ্রিয়া। রেখে দিল খাঁচায়। এই খাঁচায় রেখে পাখিকে কৃষ্ণনাম শেখাবে আর মনের খাঁচায় রেখে শেখাবে গৌরনাম। এ নাম যেন দৈববশে পাওয়া অতুল গুপ্তধন—ভোগ করতে না পারলেও ভাগ দিতে পারে না যাকে-তাকে।

একান্তে পাখির সঙ্গে কথা বলেই মনের ভার লাঘব করে বিষ্ণুপ্রিয়া।

বলে—জানিস পাখি, আমি স্বয়ংবরা হয়েছি। গঙ্গা সাক্ষী রেখে দূর থেকে অনুরাগের মালা পরিয়ে দিয়েছি তাঁর গলায়।

কখনো বা অতি সন্তর্পণে উচ্চারণ করে মনের একান্ত ভাবনা।

ঃ পাখি, তুই কি পারিস্ না আমার দূত হতে? পারিস্ না কি তাঁর কাছে আমার কোমল মনটিকে বহন করে নিয়ে যেতে। আমার এ ক্ষুদ্র সামান্য মন তোর কাছে গুরুভার হবে না।

কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়া জানে না অতি লঘুভার অতি নরম কোমল মনও গাঢ় অনুরাগে সিক্ত হলে অতি গুরুভার হয়। তবু ভাগবতের কৃপালু ব্রাহ্মণ রুক্মিণী দেবীর আত্মনিবেদনের বার্তা বহন করে নিয়ে গিয়েছিল দয়িত কৃষ্ণের কাছে। আর ব্রাহ্মণের মত পাখিও তো দ্বিজ।

ভাব-সংবেদন অপেক্ষাও কঠিন যে ভাব-সংগোপন তাতেও আশ্চর্য সিদ্ধি বিষ্ণুপ্রিয়ার। কেউ জানতে পারে না তার মনের গভীরে চলে কি ওঠা-পড়া—চলে কি ভাঙা-গড়া। সুখ-দুঃখ আনন্দ-বিষাদে তার একই স্থিরতা—একই অবিচল প্রশান্তি। ইদানীং এক একটি ঘটনায় পাওয়া যাচ্ছে তার এক একটি পরিচয়।

যেদিন বিষ্ণুপ্রিয়া জানতে পেলো যে শচীদেবী তার পুত্র নিমাই-এর সঙ্গে তার সম্বন্ধের প্রস্তাব করে পাঠিয়েছেন, তখন প্রথমে এ অপ্রত্যাশিত ঘটনা তার কাছে সৌভাগ্যের অতীত বলে মনে হয়েছিল। যেন আনন্দের এক তীব্র আলোকে ধাঁধিয়ে গিয়েছিল তার অনুভূতির স্বচ্ছ দৃষ্টি। বিবশ হয়ে গিয়েছিল সব ইন্দ্রিয়বোধ। তবু, যে আনন্দের প্লাবনে নিজেকে নিজের মধ্যে ধরে রাখা যায় না, তারও কোনো চিহ্ন সে প্রকাশ পেতে দেয় নি আঁখিতারায়—প্রকাশ হতে দেয় নি অধরপ্রান্তে। গুরুজনদের সামনে থেকেছে অতি সাবধানে, পাছে কোনো অসতর্ক অভিব্যক্তি আনন্দের ব্যঞ্জনা নিয়ে আসে। সাথী-সঙ্গিনীদের মাঝে থেকেছে আরো ভয়ে ভয়ে, পাছে কোনো আনন্দিত মুহূর্তে হৃদয়ের গোপন অনুরাগ ব্যক্ত হয়ে পড়ে।

সেই অপর্যাপ্ত সুখের দিনে অসামান্য তার আত্মগোপন।

আবার নিদারুণ দুঃখ-আঘাতেও তাই।

তখন বিবাহের প্রস্তাব অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছে। শচীমাতা নিজে মনোনীত করেছেন কন্যাকে, এই সৌভাগ্যে রাজপণ্ডিত সনাতন মিশ্র কৃতার্থ। পত্নী মহামায়ার সঙ্গে চলছে একান্ত মন্ত্রণা—আত্মীয়-বান্ধবদের সঙ্গে চলেছে যুক্তি-পরামর্শ।

এমনি সময় একদিন শুষ্কমুখে কাঞ্চনা এসে দাঁড়াল বিষ্ণুপ্রিয়ার কাছে।

বিষ্ণুপ্রিয়া তখন তার সাধের আসনে রঙীন সুতোর কারুকার্য করছিল। তার হাত থেকে সুঁচ-সুতো টেনে ফেলে উত্তেজিত কণ্ঠে কাঞ্চনা বলল—খবর শুনেছিস্ সখি ?

ঃ কি এমন খবর যে এত অস্থিরতা সেজন্যে ? শান্ত হয়ে বোস্ না কাঞ্চনা।

কাঞ্চনা বসল না। বলল—শান্ত হবার মত ঘটনা নয় প্রিয়া।

ঃ খবরটা তাহলে প্রকাশ করলেই তো হয়।

ভ্রূভঙ্গিতে নিন্দার আভাস ফুটিয়ে কাঞ্চনা বলল—তুই সত্যই বলেছিলি সখি, ভারী অহংকারী এই নিমাইপণ্ডিত। বিবাহে সে নাকি অসম্মতি জানিয়েছে। প্রকারান্তরে বলেছে, এ বিবাহ হবে না।

বিষ্ণুপ্রিয়াকে এই নির্মম আঘাতে অবিচলিত থাকবার জন্য মনের সঙ্গে কঠিন সংগ্রাম করতে হল, তাই কিছুই বলতে পারল না।

কাঞ্চনা আবার বলল—অথচ এ বিবাহে শচীদেবীরই একান্ত ইচ্ছা ছিল। তবে সে কেমন পণ্ডিত-বিদ্বান যে মায়ের ইচ্ছার সম্মান দিলে না।

বিষ্ণুপ্রিয়া ততক্ষণে আবার সূচিশিল্পে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছে। যেন নিমজ্জিতের তৃণখণ্ড আশ্রয়। অতি মৃদুস্বরে সে বলল—তাঁর ধর্ম তাঁর কাছে কাঞ্চনা। আমরা বিচার করবার কে ?

কাঞ্চনা বলল—আশ্চর্য তুই প্রিয়া। তোর কি ক্ষোভ দুঃখ অভিমান—কিছুই নেই ?

প্রবল চেষ্টায় মনকে স্থির করে নিয়ে বিষ্ণুপ্রিয়া অতি ধীরে বলল—সব অধিকার সকলের থাকে না কাঞ্চনা। আমার ভগবান আমায় সুখ-দুঃখ বিপদ-সম্পদ যা কিছু দেবেন আমি শুধু মাথা পেতে নেব। এ টুকুই আমার অধিকার।

অজস্র সন্ধ্যামণি ফুল ফুটে আছে আঙ্গিনায়। একপাশে মৃত্তিকাসোপানে বসে বসে যে আপন চিন্তায় মগ্ন হয়ে যাবে তাতেও সংকোচ বিষ্ণুপ্রিয়ার। সন্ধ্যার করুণ বেদনা তার বুকে। মুখে সন্ধ্যামণির করুণ হাসি।

যদিও আমি প্রভুর প্রত্যাখ্যাত আর অসহ এই প্রত্যাখ্যানের বেদনা, তবু আমি কর্তব্যে শিথিল হব না। শকুন্তলার মত অন্যমনা হয়ে সুখের সংসারে ডেকে আনব না দুর্বাসার দুর্বার অভিশাপ। বাড়িয়ে তুলব না আত্মীয়-বান্ধব-গুরুজনদের সমস্যা।

চিরাচরিত গৃহকর্মের মধ্যে নিজেকে নিযুক্ত রেখে তারই ফাঁকে ফাঁকে চিন্তা করে বিষ্ণুপ্রিয়া। প্রভুর এ বিবাহ প্রত্যাখ্যান তো প্রকারান্তরে আমাকেই প্রত্যাখ্যান। আর কেনই বা তিনি তা করবেন না। আমি জলের কুমুদী আর তিনি আকাশের চাঁদ। আমার ক্ষুদ্র হৃদয়ের প্রেম কি এই সুদীর্ঘ ব্যবধানের মধ্যে সেতু রচনা করতে পারে।

বিষ্ণুপ্রিয়ার মনে নেই কোনো অভিমান—নেই কোনো অপমানের ক্ষোভ। শুধু একটি মাত্র দুর্বার ভাবনা। যে-ফুল একবার নিবেদন করেছি হৃদয়-দেবতার চরণে কেমন করে তা তুলে এনে তুচ্ছতার মালায় সাজাব? স্বয়ংবরা কন্যা হবে কি ভ্রষ্টলগ্না?

অবিচ্ছিন্ন চিন্তার সুযোগ পেতে চায় না বিষ্ণুপ্রিয়া। তাই মনের সব আলোড়ন-আন্দোলনকে পাশ কাটিয়ে আরো বেশি কাজের ভার হাতে তুলে নেয়।

তবু আবার কোন্ এক ফাঁকে তারা এসে হাজির। বিষ্ণুপ্রিয়া কিছুতেই ভাবতে পারে না তার হৃদয়-বেদীতে প্রিয় বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা হবে না। আচ্ছা, তিনি কি আপন শক্তিতে আমার বুকের মধ্যে লুকানো কথাও জানতে পারেন না? একই অন্তর্যামী ভগবান যদি সকলের অন্তরে অধিষ্ঠিত, তবে কেন একের মন অপরের কাছে ধরা পড়তে পারে না?

অথবা একি তাঁর পরীক্ষা? তিনি কি জেনে নিতে চান আমার নিষ্ঠা—আমার সুখ-দুঃখের সীমানা। মনে মনে প্রার্থনা জানায় বিষ্ণুপ্রিয়া।

প্রভু, আমায় তুমি যত খুশী আঘাত দাও, কিন্তু লজ্জা দিও না। অতি দুর্বল আমি। তোমার অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারি এমন শক্তি আমার নেই।

সত্যই বুঝি বিশ্বম্ভর গৌরাঙ্গের এ এক পরীক্ষা। কেন না অবিলম্বেই জানা গেল যে বিবাহে অনিচ্ছার কথা তিনি বলেছিলেন পরিহাসছলে। মাতার ইচ্ছাই তাঁর কাছে অনিবার্য আদেশ। তা তিনি মাথা পেতে গ্রহণ করেছেন। বিবাহের সবই স্থির।

কাঞ্চনার মুখেই আবার এ শুভ সংবাদ জানতে পেল বিষ্ণুপ্রিয়া। কিন্তু মনের দ্বিগুণিত আনন্দের আভাসও বাইরে প্রকাশ পেতে দিল না। কে জানে কি অচিন্ত্য লীলা জগদীশ্বরের অথবা আমার প্রাণের প্রভুর। কান্না-হাসির

দোলায় দুলিয়ে কি জানি কি খেলায় তিনি আমার আগে থেকেই প্রস্তুত করছেন।

তারপর সব কিছু যেন এক মধুর স্বপ্নের মধ্যে ঘটে গেল। বিষ্ণুপ্রিয়া যেন ছিল অর্ধনিদ্রাঘোরে অর্ধজাগরণে। সেই মঙ্গলশঙ্খধ্বনি, বাদ্যগীতনৃত্যের আনন্দ-কোলাহল। সেই পূর্ণ ঘট, ধান্য-দধি-দীপ, আম্রসারে সজ্জিত গৃহদ্বার অঙ্গন। চতুর্দিকে সুশোভিত নানাবর্ণ পতাকা, কদলী-তরু-শ্রেণীতে আবদ্ধ আম্র-পল্লব-মালা।

সেই লোকাচার-অধিবাস, নান্দীমুখ, গঙ্গাপূজা, ষষ্ঠীবন্দনা। যথাসর্বস্ব ব্যয়ে সনাতন মিশ্রের ত্রুটিহীন আয়োজন-অনুষ্ঠান—সমাগত সকল ব্রাহ্মণকে পাত্রানুযায়ী ভোজ্য-বস্ত্র-দক্ষিণাদান।

তারপর সেই অবিস্মরণীয় শুভমিলন-লগ্ন। অনুপম বরবেশে গৌরসুন্দরের আগমন—চন্দন ও গন্ধে অনুচর্চিত শ্রীঅঙ্গ, ললাটে অর্ধচন্দ্রাকৃতি চন্দ্রলেখার মধ্যে সুশোভন গন্ধের তিলক, শিরে অপূর্ব মুকুট; কণ্ঠে সুগন্ধি ফুলের মালা, পরিধানে দিব্য সূক্ষ্ম পীতবস্ত্র। দুই কানে স্বর্ণ কুণ্ডল, বাহুতে রত্নহার।

আরতি-আশীর্বাদ শেষে সর্বালঙ্কার-ভূষিতা বিষ্ণুপ্রিয়াকে যখন বিবাহ-বেশে সাজিয়ে তার প্রভুর সামনে নিয়ে আসা হল, তখন বিষ্ণুপ্রিয়ার বাহ্যিক চেতনা লুপ্তপ্রায়। তারপর সপ্তপ্রদক্ষিণ শেষে মুখচন্দ্রিকার মুহূর্তে বিষ্ণুপ্রিয়া যেন আর এ জগতে নেই। শুধু মনে হতে লাগল এ জগতের ঊর্ধ্বে কোন্ এক দিব্য-আনন্দের বৈকুণ্ঠলোকে তার মুক্ত আত্মা নিদ্রাঘোরে বিচরণ করছে। যে-কোন মুহূর্তেই যেন এ স্বপ্ন ভেঙ্গে যেতে পারে—মিথ্যা হয়ে যেতে পারে তার কল্পনার বৈকুণ্ঠলোক।

যখন চেতনা ফিরে এলো বিষ্ণুপ্রিয়ার তখন সম্মুখে জ্বলছে পবিত্র হোমাগ্নি আর গৌরসুন্দরের শান্তমধুর কণ্ঠে অনুরণিত হচ্ছে পবিত্র বেদমন্ত্র।

বিষ্ণুপ্রিয়ার অন্তরাত্মা সেই মন্ত্রের সঙ্গে একীভূত হয়ে বলল—আজ থেকে আমার সব কিছু তোমার হল। তোমার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা হল—তোমার ব্রত হল আমার ব্রত।

বিষ্ণুপ্রিয়ার সকল প্রেমানুরাগ একটি বিনীত নীরব প্রণামে রূপান্তরিত হয়ে নিবেদিত হল নিষ্ঠুর সুন্দরের চরণ-যুগলে।

"আনন্দলীলাময় বিগ্রহায়।
হেমাভ দিব্যচ্ছবিসুন্দরায় ॥
তস্মৈ মহাপ্রেমরসপ্রদায়।
চৈতন্যচন্দ্রায় নমো নমস্তে ॥"
চৈতন্যচন্দ্রামৃত ॥

চার

বিগ্রহ যাঁর আনন্দলীলাময়।
হেমাভ দিব্য সুন্দরছবি যাঁর ॥
মহাপ্রেমরস প্রদান করেন যিনি।
শ্রীচৈতন্য তাঁহাকে নমস্কার ॥

দেহ যদি সূর্যের অভিমুখী হয় তবে দেহের ছায়া থাকে পেছনে। প্রেমাভিমুখী গৌরাঙ্গের ছায়ার মত বিষ্ণুপ্রিয়াও নিজেকে রাখে পেছনে পেছনে—ছায়ার মতই নিঃশব্দে থাকে প্রভুর পায়ে পায়ে। অথচ পদলগ্ন থেকেও আবদ্ধ করে না। রেখে যায় না আপনার রেখামাত্র চিহ্ন।

তবু শচীনন্দন গৌরাঙ্গের ভবনে-প্রাঙ্গণে আজ বিষ্ণুপ্রিয়ার হাতের সেবাস্পর্শ। নিজেকে সম্পূর্ণ অন্তরালে রেখে আশ্চর্য নৈপুণ্যে সে সেবাসিদ্ধা। সর্বক্ষণ তার সতর্কতা, যেন সেবার চেয়ে সেবিকা কখনো বড় হয়ে না ওঠে।

মুহূর্তের জন্য গৌরসুন্দরের দর্শন পেলে অনাবিল আনন্দের মাধুরীতে পূর্ণ হয় তার মন-প্রাণ। দেহের প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আবেশে বিভোর হয়ে আসে।

এমন যে দুর্লভ আনন্দ-অমৃত তার লোভও সে ত্যাগ করে সেবাবিঘ্ন এড়াবার জন্য। অনলস সেবায় শচীমাতার মনস্তুষ্টির সাধনা করে।

প্রাচীরদ্বার পেরিয়ে প্রাঙ্গণ। তার একপাশে শুচিশুদ্ধ তুলসীমঞ্চ। অন্যধারে

রোপিত সন্ধ্যামণি-টগর-যূথিকা। প্রাঙ্গণ পেরিয়ে মৃত্তিকাসোপান। সোপানের ঊর্ধ্বে গৃহের প্রবেশদ্বার। তারি একপাশে ঝুলন্ত খাঁচায় সেই পোষা চন্দনা, যাকে বিষ্ণুপ্রিয়া সাথে নিয়ে এসেছে।

পাখিকে শোনায় কৃষ্ণনাম আর মনে মনে উচ্চারণ করে গৌরনাম। আর ভাবে, আহা! আমার শেখানো কৃষ্ণনাম যদি পাখির মুখে গৌরনাম হয়ে ফুটত।

পিতার মুখে শুনেছে বিষ্ণুপ্রিয়া নাম-মাহাত্ম্যের কথা—শ্রীমতী রাধার নামানুরাগের কাহিনী। সে জানে মনে মনে জপ করার চেয়ে উচ্চকণ্ঠে জপ করলেই নামকে অধিক মর্যাদা দেওয়া হয়। কিন্তু নিরুপায় বিষ্ণুপ্রিয়া। তাই প্রিয় গৌরনাম সে দেহের প্রতি অস্থিতে গেঁথে রেখেছে, লিখে রেখেছে প্রতি রক্তবিন্দুতে।

খাঁচার মধ্যে পাখির ডানা-ঝাপ্‌টানোর শব্দ শোনা যাচ্ছিল। বিষ্ণুপ্রিয়াকে ডেকে শচীদেবী বললেন—দেখ তো বৌমা, খাঁচার মধ্যে পাখিটা অমন ছট্‌ফট্‌ করছে কেন। ওর কি দানা ফুরিয়ে গেছে?

বিষ্ণুপ্রিয়া খাঁচার কাছে এসে দাঁড়াল। লক্ষ্য করে বলল—

: না মা ফুরোয় নি তো।

: জল?

: তাও আছে মা।

: তবে ও অমন করছে কেন?

বিষ্ণুপ্রিয়া বলল—কিছুদিন থেকে কি যেন ওর হয়েছে। কিছুই খাচ্ছে না, সাড়াশব্দও বড় দিচ্ছে না। শুধু ছট্‌ফট্‌ করে মরছে।

শচীদেবীও কাছে এসে দাঁড়ালেন। বললেন—এতদিনের পোষমানা পাখি, তবুও পালাতে চায় বোধহয়। খাঁচার দরজাটা ভাল করে এঁটে দিও বৌমা।

: কেন ওর এমন হল?

: তাই তো ভাবছি বৌমা। বললেন শচীদেবী।

কিন্তু দুজনার কেউ-ই বুঝতে পারল না পাখির এ ব্যাকুলতার ইঙ্গিত। সে যে কৃষ্ণনাম শিখেছে। কৃষ্ণনামের পাখিকে কি আর সুখের খাঁচায় বেঁধে রাখা যায়। তার বন্দী হৃদয় যে আজ মুক্ত আকাশের ডাক শুনেছে।

প্রভাতী বেলা মধ্যাহ্ন পার হয়ে অপরাহ্ণের দিকে গড়িয়ে চলেছে। নিমাই

এখনো বাড়ি ফেরেনি। গয়া থেকে ফিরে আসার পর আজকাল প্রায়ই এমন হচ্ছে। চিন্তিত হয়ে শচীমাতা ঈশানকে পাঠালেন নিমাই-এর সন্ধানে। খানিকক্ষণ বাদে ঈশান ফিরে এলো। যেন কিছু ক্লান্ত—দেহে না মনে, কে জানে। বারান্দার একধারে বসে রইল নিঃশব্দে।

শচীদেবী ঈশানের প্রত্যাগমন কেমন করে টের পেলেন যেন। ঘর থেকে বেরিয়ে তার সামনে এসে দাঁড়ালেন। ঈশান শচীদেবীকে দেখতে পেল, কিন্তু তাঁর দিকে তাকালো না।

উদ্বিগ্ন স্বরে শচীদেবী বললেন—নিমাই-এর খোঁজ পেলে ঈশান?

বিব্রতভাবে নড়েচড়ে বসল ঈশান। বলল—নিমাই-এর খোঁজ পাওয়া আর কষ্ট কি ঠাকরুণ। যেখানেই শুনবে খোল-করতালের আওয়াজ দিচ্ছে সেখানেই জানবে তোমার নিমাইচাঁদ হাজির আছে।

: তাহলে সে কি শ্রীবাসের ওখানেই—

এতক্ষণে ঈশান শচীদেবীর দিকে সোজাসুজি তাকাল।

বলল—তা নয় তো আর কি! একেবারে বিভোর-বেভুল। পাগলের মত কেবল নাচছে আর কাঁদছে। কখনো মাটিতে পড়ে কৃষ্ণ কৃষ্ণ ডাক ছেড়ে চিৎকার করছে।

: আমার নাম করে তুমি তাকে বাড়ি আসতে বললে না?

: একবার ছেড়ে হাজারবার বলেছি। তা, বললেই শুনছে কে ঠাকরুণ। কৃষ্ণকথা ছাড়া অন্য কোনো কথা তার কানেই ঢুকছে না। আমার দিকে ফিরেও তাকালে না।

শচীদেবী নিঃশ্বাস ফেললেন। যেন আপন মনেই বললেন—সমস্ত দিন গড়িয়ে গেল, দুটো মুখে দিতেও সে এলো না। তার জন্যে বৌমাও আমার সমস্ত দিন উপবাসী রইল।

ঈশান জানে সে কথা ভাল করেই। আর এও জানে শচীমাতাও সকাল থেকে একফোঁটা জল মুখে দেননি। কিন্তু নিজের জন্যে ভাবেন না শচীমাতা। তাঁর ধারণা বিষ্ণুপ্রিয়ার বয়েস কম বলে দুঃখ সইবার শক্তিও তার অনেক কম। বালিকা-বধূর কষ্টের কথা মনে করে তাঁর মাতৃহৃদয় দীর্ণ হয়ে যায়। নিজে ভালবেসে তিনি সোনার প্রতিমা এনে গৃহে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আহা! তার এই অবহেলা।

কিন্তু সুবর্ণ-বর্ণের প্রতি গোরাচাঁদের আর আকর্ষণ থাকবে কি করে। তার

মনে যে কৃষ্ণবর্ণ বাসা বেঁধেছে। যদি গোরাচাঁদকে বাঁধতে হয় তবে তাদের সকলকেও আজ কৃষ্ণবর্ণ গ্রহণ করতে হবে।

আড়াল থেকে সবই শুনেছে বিষ্ণুপ্রিয়া। শচীদেবীর কাছে বালিকা হলেও আসলে সে বালিকা নয়, নয় কিশোরী তরুণী কিংবা যুবতী। বিষ্ণুপ্রিয়া চিরন্তনী চেতনায় অনুভব করতে পারে যেন যুগ-যুগান্তের মনোবেদনা—অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের সমস্ত সংঘটন। সে বোঝে ঈশানের উদ্বেগ—শচীমাতার প্রাণের হাহাকার। তার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে থাক্ নিজের জীবনের অনুচ্চারিত শূন্যতা। মন বিচলিত হতে চাইলে তাকে কঠোরভাবে শাসন করে বিষ্ণুপ্রিয়া। দুঃখ-বঞ্চনা তার যত গভীরই হোক্ তা নিয়ে মনকে সে করুণ-পদাবলী রচনা করতে দেবে না। তাকে হতে হবে অসহায় শচীমাতার অবলম্বন-দণ্ড—তেমনি শুষ্ক কঠিন ঋজু। শোক-সমুদ্রে সে হবে ভাব-উচ্ছ্বাসহীন একটি নির্বিকার ভেলা।

গঙ্গাস্নানে যাবার পথে শ্রীবাস আচার্যের পত্নী মালিনীদেবী এলেন একদিন শচীদেবীর সঙ্গে দেখা করতে।

শ্রীবাস-অঙ্গনেই আজকাল নিত্যানন্দ ও অন্যান্য সাঙ্গোপাঙ্গ-পরিবৃত হয়ে গৌরসুন্দরের অধিকাংশ সময় কাটে। তাই তার ক্রিয়াকলাপ মতিগতির বেশির ভাগ সংবাদ মালিনীদেবীর সুবিদিত।

এমন অসময়ে মালিনীকে দেখে একটু বিস্মিত হলেন শচীদেবী। বললেন—এসো মালিনী। এখন তুমি আসবে আমি ভাবতে পারিনি।

মালিনীদেবী উদ্বিগ্ন স্বরে বললেন—লোকের মুখে কি সব শুনছি দিদি। তাই গঙ্গার ঘাটে যাবার পথে একবার তোমার কাছে এলাম। নিমাই নাকি—

বলতে বলতে থেমে গেলেন মালিনীদেবী।

শচীদেবী ব্যাকুল হয়ে বলে উঠলেন—বলতে বলতে থামলে কেন মালিনী? নিমাই তো তোমার ওখানেই কীর্তনে মেতেছিল। কি হল তার?

মালিনীদেবী আশ্বস্ত করে বললেন—তুমি উতলা হোয়ো না দিদি, তার কিছু হয় নি। কিন্তু—তাহলে একথা কি তুমি এখনো শোনো নি।

শচীদেবী দ্রুতপায়ে এগিয়ে এসে মালিনীর হাত চেপে ধরলেন। শঙ্কিতকণ্ঠে বললেন—কি হয়েছে আমায় খুলে বলো মালিনী। কিছু গোপন কোরো না। ভয় নেই বোন, আমি সব সইতে পারবো।

মালিনীদেবী একটু ভেবে বললেন—কথাটা তোমাকে জানিয়ে রাখাই ভালো দিদি। নবদ্বীপের সবাই একথা বলাবলি করছে। নিমাই নাকি সন্ন্যাস নেবার মতলব করেছে। অন্তরঙ্গদের অনেকের কাছেই সে নাকি তার মনের ইচ্ছা খুলে বলেছে।

খানিকক্ষণ শচীদেবী সম্পূর্ণ নির্বাক হয়ে রইলেন। যদিও একেবারে অপ্রত্যাশিত নয় এ সম্ভাবনা, তবু প্রথম আঘাতের তীব্রতা সহ্য করতে কিছুটা সময় কেটে গেল।

অনেকদিন থেকেই এ ভয় ছিল শচীমাতার মনে—হয়তো বিশ্বরূপের মত বিশ্বম্ভরও একদিন ফাঁকি দেবে তাকে। কিন্তু আজ এ বিপদে তিনি তো একা বিপন্ন হবেন না—কি হবে স্বামীহারা বিষ্ণুপ্রিয়ার ?

দিশাহারার মত দৃষ্টি মেলে শচীদেবী বললেন—তাহলে আমি এখন কি করব মালিনী ?

মালিনীদেবী বললেন—ব্যস্ত হলে তো চলবে না দিদি। এখন খুব বুঝে-সুঝে কাজ করতে হবে। ভেবে দেখ, নিমাই গেলে কি শুধু তোমারই যাবে। সে যে আমাদেরও চোখের মণি। তাকে হারিয়ে যে সমস্ত নদীয়া কাঁদবে।

: আমি কিছুই আর ভাবতে পারছি না। শচীদেবী বললেন।

তোমরাই আমার একমাত্র ভরসা বোন। যা-কিছু যুক্তি-বুদ্ধি তোমাদেরই দিতে হবে।

মালিনীদেবী বললেন—আমরা সবাই মিলে তাকে বাধা দেব—নিষেধ করব। কিন্তু এ বিপদে বৌমা বিষ্ণুপ্রিয়াই আমাদের প্রধান সহায়। তাকে দিয়েই নিমাইকে বাঁধবার চেষ্টা করতে হবে। বিষ্ণুপ্রিয়ার বাঁধন যদি শক্ত হয় তবে নিমাই-এর সাধ্য কি যে সন্ন্যাসগ্রহণ করে।

শচীদেবীর মনে দ্বিধা-সংশয়।

তিনি বললেন—বৌমা আমার পূজার ফুল। সে সেবা জানে, কিন্তু পুরুষ ভোলাবার ছলাকলা তো জানে না।

মালিনীদেবী একটু ভেবে বললেন—তবু বৌমাকে তুমি বুঝিয়ে বল দিদি। আমাদেরই জন্যে তাকে এ কাজ করতে হবে। তার সখী কাঞ্চনাকেও সব কথা বল—এ বিষয়ে সাহায্য করতে বল।

বিষ্ণুপ্রিয়ার কানে সবই গেছে। স্তব্ধ হয়ে গেছে যেন তার বুকের স্পন্দন।

থেমে গেছে গৃহকর্মরত হাত। সামনে তাকিয়ে দেখছে যেন এক বিশাল সমুদ্র—তাতে তীর নেই, তরী নেই, শুধু আছে উতলা তরঙ্গ।

আর এই সমুদ্র উত্তীর্ণ হবার সব দায়িত্ব এখন তারই উপরে। তাকেই তরী হয়ে সকলকে পার করে দিতে হবে—নদীয়াকে বাঁচাতে হবে গৌরাঙ্গের বিচ্ছেদ-বেদনা থেকে। সেজন্যে তার প্রভুর মুক্তিপিপাসু ভক্তিময় হৃদয়-দ্বার তাকে শৃঙ্খল হয়ে জড়াতে হবে।

কিন্তু কেমন করে তা পারবে বিষ্ণুপ্রিয়া! যে চিরকল্যাণী, সে কেমন করে হবে মোহিনী কামিনী? উভয়-সঙ্কট তার।

স্বামীর ব্রতের অনুকূলা হলে জীবনে গ্রহণ করতে হবে অনন্ত বিরহ-বেদনা। আর প্রতিকূলচারিণী হলে সহধর্মিনী নামে হবে কলঙ্ক।

তবে কোন্ দিকে যাবে বিষ্ণুপ্রিয়া? কোন্ ধ্রুবতারা তাকে শ্রেয়পথ দেখাবে?

যুক্তকর বক্ষে স্থাপন করে মনে মনে প্রার্থনার মত বলল বিষ্ণুপ্রিয়া—গৌররূপে যদি তুমিই এসে থাকো ভগবান্, তবে তারই মধ্য দিয়ে তুমি আমায় পথ দেখাও—আলো দেখাও।

হে প্রভু, শক্তি দাও তোমার প্রিয়কার্য সাধন করতে।

"আপনার দুঃখ-সুখ তাহা নাহি গণি।
তাঁর যেই সুখ সেই নিজ সুখ মানি॥"
—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

পাঁচ

দিনের আলো স্তিমিত হয়ে ধীরে ধীরে সন্ধ্যার ছায়া নেমে এলো।

বিষ্ণুপ্রিয়া সন্ধ্যাপ্রদীপ হাতে নিয়ে মন্থরচরণে নেমে এলো অঙ্গনে। পরেছে সে চওড়া লালপাড় তাঁতের সাদা শাড়ি। ঘোমটার পাশ দিয়ে কাঁধের ওপর নেমে এসেছে কালো কেশের বন্যা। দেখে মনে হয় যেন সে প্রত্যাসন্ন রাত্রির আকাশ। এলোচুলে আঁধারের ব্যঞ্জনা, চাঁদের উপমা স্নিগ্ধ-শান্ত মুখমণ্ডলে, হাতের প্রদীপ যেন সন্ধ্যাতারা।

তুলসীমঞ্চে প্রদীপ নামিয়ে রেখে প্রণাম করল বিষ্ণুপ্রিয়া। তারপর শঙ্খধ্বনির মধ্য দিয়ে যেন আপন হৃদয়ের আর্তনাদকে সুকৌশলে ব্যক্ত করল। অঙ্গন পেরিয়ে ঘরে যাবার মুখে দৃষ্টি পড়ল বারান্দার আধ-অন্ধকারে। সেখানে নিশ্চল হয়ে নীরবে বসেছিলেন শচীদেবী। অন্ধকারে মুখের অভিব্যক্তি চাপা পড়েছিল।

কাছে এগিয়ে গিয়ে তার পায়ের সামনে বসে বিষ্ণুপ্রিয়া প্রশ্ন করল—অমন করে বসে কেন মা? শরীর অসুস্থ নয় তো?

শচীদেবী কোনো উত্তর করলেন না।

বিষ্ণুপ্রিয়া তাঁর পায়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল—আর হবে না-ই বা কেন। এ বয়সে এখন আপনাকে প্রায়ই নির্জলা উপবাস করতে হচ্ছে।

এবারে কথা বললেন শচীদেবী—তুমি শুধু আমার কথাই ভাবো মা। কিন্তু তোমাকেও প্রায়ই উপবাসে কাটাতে হয়। নিমাই বাড়ি ফিরে এসে না খেলে আমার মত তোমারও তো কিছু মুখে ওঠে না।

বিষ্ণুপ্রিয়ার মৃদুহাসির শব্দ শোনা গেল যেন। সহজ কণ্ঠে সে বলল—তাতে আমার একটুও কষ্ট হয় না মা। এ আমার বরাবরের অভ্যাস। মা যে আমায় কত ব্রত-উপবাস করিয়েছে।

সত্যই বুঝি কষ্টবোধ ভুলে গেছে বিষ্ণুপ্রিয়া। তার মুখে জেগে আছে সর্বদাই স্মিত হাসি। গৌরচাঁদ যখন সংকীর্তনে বিভোর হয়ে গৃহের কথা বিস্মৃত হয়—মাতা শচীদেবীর কথা, এমন কি বিষ্ণুপ্রিয়ার কথাও স্মরণ করে না, তখনও হাসি জেগে থাকে বিষ্ণুপ্রিয়ার মুখে। বহু যত্নে রন্ধন করা ব্যঞ্জনগুলি যখন নামমাত্র স্পর্শ ক'রে অর্ধভুক্ত অবস্থায় সে উঠে যায়, তখনও বিষ্ণুপ্রিয়ার হাসিটি ম্লান হয় না। যখন সমস্ত রাত্রি সংকীর্তনে অতিবাহিত করে পরদিন প্রভাতে গৃহে ফিরে আবেশে বিহ্বল থেকে কারু সঙ্গে কথা কয় না, উন্মত্তের মত চিৎকার করে কাঁদে, তখনও বিষ্ণুপ্রিয়ার মুখে হাসি দেখা যায়।

পাছে তার দুঃখ দেখে শচীমাতার দুঃসহ দুঃখ আরো বেড়ে যায় তাই বুঝি বিষ্ণুপ্রিয়ার এ অসাধ্য হাসি। কিন্তু সে হাসি যে কান্নার চেয়েও নিদারুণ—তীক্ষ্ণ শায়কের চেয়েও মর্মচ্ছেদী।

শচীদেবী করুণ কণ্ঠে বিষ্ণুপ্রিয়াকে বললেন—মা, আমার একটা কথা শোনো। বড় বিপদের দিন আসছে আমাদের। নিমাই নাকি সন্ন্যাস নেবার সঙ্কল্প করেছে। এ সময় তোমাকে আর উদাসীন থাকলে চলবে না।

বিষ্ণুপ্রিয়া অতি মৃদুকণ্ঠে বলল—আপনি যা আদেশ দেবেন, আমি তাই করব।

শচীদেবী বললেন—নিমাই-এর মন সংসারে আবদ্ধ করতে হবে। লজ্জা করলে হবে না বৌমা।

বিষ্ণুপ্রিয়া নতমুখে বলল—লজ্জা তো আমি করি নে মা। কতবার তাঁর কাছে মিনতি করেছি যেন তিনি আপনার মনে কষ্ট না দেন। কিন্তু—

বিষ্ণুপ্রিয়াকে স্নেহহস্তে কাছে টেনে নিয়ে শচীদেবী বললেন—মা আমার, তুমি ভাবছ আমার কথা। আর আমি যে তোমার কথা ভেবেই মনে শান্তি

পাচ্ছি নে। আমার জীবন তো প্রায় শেষ হয়ে এলো, কিন্তু তোমার সামনে যে পড়ে আছে সমস্ত জীবন। এ গভীর দুঃখ তুমি কতকাল কেমন করে বয়ে বেড়াবে।

: আমি বেশ আছি মা, বেশ আছি। আমার কথা ভেবে আপনি আর কষ্ট পাবেন না।

: না বৌমা, যোগিনীর বেশে থাকলে আর চলবে না। তোমায় সাজসজ্জা করতে হবে—অলঙ্কার পরতে হবে।

মুহূর্তকাল নীরব রইল বিষ্ণুপ্রিয়া। পরক্ষণেই বলল—আপনি যদি সুখী হন তবে আমি সব কিছুই করতে পারি। কিন্তু মা, সাজসজ্জা অলঙ্কার আমার ভাল লাগে না।

কেমন করেই বা ভাল লাগতে পারে। বিষ্ণুপ্রিয়ার যে আছে অনেক অলঙ্কার—তার তিতিক্ষা, সেবা—তার ভক্তি-প্রীতি-সরলতা, শুচি-শুভ্রতা—এসব অলঙ্কার তো কোনোদিন খুলে ফেলতে হয় না। অন্য অলঙ্কারে আর প্রয়োজন কি তার।

শচীদেবী বললেন—তোমাকে সাজাবার ভার আমি কাঞ্চনাকে দেবো।

: আপনার আদেশ আমার মানাই উচিত। ধীর কণ্ঠে বলল বিষ্ণুপ্রিয়া। কিন্তু আপনার কাছে আমি একটি আশীর্বাদ চাই। যেন নিজের সুখের জন্য অন্য কারু সুখের পথে আমাকে কখনো বাধা হতে না হয়।

শচীদেবী বুঝতে পারলেন বিষ্ণুপ্রিয়ার মনের কথা। তিনি নির্বাক হয়ে বিস্মিত দুচোখ মেলে অন্ধকারে তাকিয়ে রইলেন। বিষ্ণুপ্রিয়া শচীদেবীর পায়ের ধুলো মাথায় ঠেকিয়ে নিজের ঘরে গিয়ে প্রবেশ করল। তুলসীমঞ্চে প্রদীপশিখা জ্বলতে লাগল উভয়ের মিলিত বেদনার শিখা হয়ে।

কাঞ্চনাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন শচীদেবী। অঙ্গনে পা দিয়েই শচীদেবীকে সামনে দেখে কাঞ্চনা বলল—এই যে জ্যাঠাই মা, সখী কোথায়?

কাঞ্চনাকে দেখে মনে মনে খুশী হয়ে শচীদেবী বললেন—নিজের ওই ঘরটুকুই তো তার আশ্রয় কাঞ্চনা। আর এই প্রাঙ্গণ ছাড়িয়ে একপাও সে বাইরে যায় না। কত বলেছি। তবু এতবড় পৃথিবীতে এটুকুই তার সীমানা।

কাঞ্চনা জানে বিষ্ণুপ্রিয়ার মনের একান্ত কথা। তাই সে বলল—কোথাও গেলে পাছে আপনার সেবার ত্রুটি হয়, সেই তার সর্বক্ষণের ভয়।

বিষ্ণুপ্রিয়ার এ মনোভাবের কারণ আরো অনেক গভীরে। গৌরাঙ্গের সহধর্মিনী গৌরপ্রিয়া সে। কৃষ্ণচিন্তায় গৌরাঙ্গের সাংসারিক কর্তব্যে যদি কিছু ত্রুটি ঘটে তবে তা সাধ্যমত পরিপূরণের চেষ্টা বিষ্ণুপ্রিয়াকেই করতে হবে। মাতৃসেবায় পুত্রের অংশও সম্পন্ন করতে হবে তাকেই—একা নিতে হবে দুজনার সেবার ভার।

শচীদেবী বললেন—তুই তো সবই জানিস কাঞ্চনা। সেই গঙ্গার ঘাটে দেখার পর থেকেই আমার বুকের সমস্ত স্নেহ ঢেলে দিয়ে তাকে আমি আশীর্বাদ করতুম। কিন্তু আমার আশীর্বাদে সে কি পেলে কাঞ্চনা ?

: আপনাকে সেবা করতে পেয়েছে—এ পাওয়া তো কম নয় জ্যাঠাই মা।

শচীদেবীর দুটি আঁখি সজল হয়ে এলো। তিনি বললেন—ওরে না না, তার মত দুঃখী আর নেই কাঞ্চনা। নিমাই-এর মনোভাব দেখে বিষ্ণুপ্রিয়ার ভবিষ্যতের কথা ভেবে আমার মনে একবিন্দু শান্তি নেই। শোন্ কাঞ্চনা, তোকে যে জন্য ডেকে পাঠিয়েছি। তুই রোজ এসে তোর সখীকে ভাল করে সাজিয়ে দিয়ে যাস্ তো মা। তাকে পরামর্শ দিস্ যাতে সে আমার বিবাগী নিমাইকে গৃহমুখী করতে পারে।

: জ্যাঠাইমা, প্রিয়াকে আপনি চেনেন না। আমরা যা ভাবি তার চেয়েও অনেক বেশী তলিয়ে ভাবে সে। অনেক বেশী বিবেচনা করে কাজ করে। তবু দেখি কি করতে পারি।

বিষ্ণুপ্রিয়া তখন তার স্বামীর বইপুঁথিগুলি ঝেড়ে-পুছে পরিষ্কার করে সাজিয়ে রাখছিল। কাঞ্চনা গিয়ে ভিতরে প্রবেশ করল। বিষ্ণুপ্রিয়া তাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে বলল—আয় সখি। তুই বরং ওই চৌকির পাশে বোস্।

কাঞ্চনা মেঝেতেই বিষ্ণুপ্রিয়ার পাশে বসল। আপাদ-মস্তক তাকে একবার দেখে নিয়ে বলল—সখি কি এলোচুলে জটা পাকিয়ে সন্ন্যাসিনী সাজতে চাস্ নাকি ?

বিষ্ণুপ্রিয়া ওষ্ঠে ঈষৎ হাসি ফুটিয়ে বলল—ক্ষতি কি ! শুনেছি স্বামীর নাকি সন্ন্যাসী হওয়ার সঙ্কল্প। আমি আগে থেকে সন্ন্যাসিনী সাজলে তার কাজ সহজ হবে সখি।

: হাসির কথা নয় প্রিয়া। নিজেকে নিয়ে কেন তোর এ হেলাফেলা। ধনীর ঘরের আদরিণী কন্যার একি বেশ। আয় তোর চুল বেঁধে দি—তোকে সাজিয়ে দি।

কাঞ্চনার দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বিষ্ণুপ্রিয়া বলল—কেন সখি? সাজ-সজ্জা করে তাঁর মন ভোলাবো? ছিঃ!

এই একটি কথার মধ্য দিয়েই প্রকাশিত হল বিষ্ণুপ্রিয়ার গভীর আত্মমর্যাদা-বোধ আর স্বামীর প্রতি তার অসীম শ্রদ্ধা।

কাঞ্চনা জানে বিষ্ণুপ্রিয়াকে বৃথা বলা, তবু সে বলল—না সখি, এত নির্লিপ্ততা ভাল নয়। তুই নির্লিপ্ত বলে তিনিও নির্লিপ্ত। কেন প্রশ্ন তুলিস্ নে? কেন জানাস্ নে অভিযোগ?

বিষ্ণুপ্রিয়া হাতের কাজ বন্ধ রেখে শান্তকণ্ঠেই বলল—সবাই তো সব কিছু পারে না কাঞ্চনা। আমি অভিযোগ জানাতে পারি নে—অভিমান করতে জানি নে। শুধু জানি নীরবে অপেক্ষা ক'রে থাকতে।

: কিন্তু দিনের তো শেষ আছে প্রিয়া। অপেক্ষা করে করে একসময় তো সন্ধ্যা হবে।

: তখনও সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বেলে আবার অপেক্ষা করে থাকব। চেষ্টা করব সে প্রদীপ যেন নিভে না যায়।

কাঞ্চনা বিষ্ণুপ্রিয়ার দিকে তাকিয়ে তার দুটি চোখের মধ্যে সন্ধ্যাপ্রদীপ দেখতে পেল। তেমনি শান্ত তেমনি করুণ পবিত্র। মনে মনে ভাবল, এ প্রদীপ কোনোদিন নিভতে পারে না। বলল—এ প্রদীপের আলোকে তাকে বাইরে থেকে ঘরে ফেরার পথ দেখা প্রিয়া।

বিষ্ণুপ্রিয়া করুণকণ্ঠে বলল—কিন্তু তিনি যে এ আলোকে ঘর থেকে বাইরে যাবার পথই সন্ধান করেন।

দৃঢ়কণ্ঠে কাঞ্চনা বলল—তবে এ প্রদীপ নিভিয়ে দে সখি।

কিন্তু কেমন করে তা পারবে বিষ্ণুপ্রিয়া। যদি গৌরসুন্দর বাইরে যাবার বেলা বাধা পান—আঘাত পান চরণে। যদি অন্ধকারে বিভ্রান্ত হন—পথ হারিয়ে ফেলেন। তাঁর অন্তরের সে-বেদনা কেমন করে সইবে বিষ্ণুপ্রিয়া। নিজে দুঃখ পাবার ভয়ে প্রিয়তমকে সে কেমন করে দুঃখ দিতে পারবে।

সংশয়বিহীন কণ্ঠে বলল—তার পথ যেদিকেই হোক, আমি প্রদীপ ধরব সে পথেই—নিজের ছায়া ফেলব না সেখানে।

বিষ্ণুপ্রিয়ার কথা শুনে কাঞ্চনা বুঝতে পারল, কাকে বলে যথার্থ অলৌকিক সেবা, আর তা কত কঠিন। মনে মনে সম্ভ্রম জাগল সখীর

প্রতি। তার চির-পরিচিত প্রিয়া কখন কি করে এই অসামান্য অন্তর-সম্পদের অধিকারী হল? ধনী রাজপণ্ডিতের কন্যা সুখ-বিলাসে অভ্যস্ত বিষ্ণুপ্রিয়া কোন্ মন্ত্রে এমন রূপান্তর লাভ করে সর্বত্যাগিনী গৌরপ্রিয়ায় পরিণত হল?

মনের ভাব গোপন রেখে সহজভাবেই কাঞ্চনা বলল—নিজের কথা যদি নাই ভাবিস্, জ্যাঠাইমার কথা একবার ভেবে দেখ প্রিয়া। বড় দুঃখিনী তিনি। একে একে ছটি সন্তান হারাবার পর তাঁর কোলে এসেছিল বিশ্বরূপ। মায়ের বুকে শেল দিয়ে সেও গৃহত্যাগ করল। এখন দুঃখিনীর একমাত্র সম্বল এই নিমাই। সেও যদি গৃহবাসী না হয় তবে এই বৃদ্ধার দুঃখের কি আর সীমা-পরিসীমা থাকবে। তাঁর কথা ভেবেই তোকে কাজ করতে হবে—করতে হবে সাজসজ্জা। শচীমাতাকে সুখী করাও যে তোর সেবার অঙ্গ সখি।

বিষ্ণুপ্রিয়া আর আপত্তি জানাল না। কাঞ্চনা তার সখীর কেশবিন্যাস করে খোঁপায় সাজিয়ে দিল রুপোর ফুল। মধ্য ললাটে পরালো উদিত সূর্যের মত সিন্দুর-বিন্দু। বাসন্তী-বসন পরিয়ে দিল নূতন ভঙ্গিতে। পায়ে আলতা পরিয়ে বেঁধে দিল লঘুভার নূপুর। কিন্তু পিতার দেওয়া বহুমূল্য অলঙ্কারগুলি কিছুতেই অঙ্গে ধারণ করতে চাইল না বিষ্ণুপ্রিয়া। কাঞ্চনার একান্ত অনুরোধে দুহাতে তুলল শুধু স্বর্ণসূত্রখচিত শঙ্খবলয়।

তাতেই মনোহারিণী বিষ্ণুপ্রিয়া। হয়তো শচীমাতা তার এ বেশ দেখে আনন্দিত হবেন, কিন্তু স্বস্তি পাচ্ছে না সে নিজে। স্বামী যদি গৃহে ফিরে তাকে এ বেশে দেখেন তবে তার কি অভিপ্রায় কল্পনা করবেন তিনি। হয়তো মনে মনে হাসবেন—ভাববেন, এমন ভঙ্গুর বাঁধনে আমায় বাঁধতে চায় বিষ্ণুপ্রিয়া। আমার মূল্য তার কাছে এটুকুমাত্র।

তাই সজ্জা আজ বিষ্ণুপ্রিয়ার কাছে লজ্জা হয়ে দেখা দিল।

অথচ দুঃখ দিতেও চায় না সে সখী কাঞ্চনার মনে—শচীমাতার মনে। এ যেন এক মহা সঙ্কট। শেষ পর্যন্ত বিষ্ণুপ্রিয়া ভাবল—আমি অসহায়। এ সঙ্কটে ত্রাণ করবেন আমায় বিপদভঞ্জন মধুসূদন।

আর একথা ভাবার সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ একটা হাওয়ার ঝাপ্‌টা এসে ঘরে ঢুকল। নিভিয়ে দিল প্রদীপ। বাইরে ঝড়ের তুমুল শব্দ শোনা গেল!

কাঞ্চনা বলল—হঠাৎ ঝড় উঠেছে।

বিষ্ণুপ্রিয়া নিভে-যাওয়া প্রদীপ জ্বালাবার চেষ্টা করতে লাগল বারবার। কিন্তু বারবার তা নিভে যেতে লাগল। হতাশ হয়ে বলল—বাইরের প্রবল ঝড়ের বাতাস ঘরে এসে ঢুকছে। এ হাওয়ায় প্রদীপ আর জ্বলবে না।

কাঞ্চনা বলল—জানালাগুলো সব বন্ধ করে দে প্রিয়া। নইলে এ ঝড়ের হাওয়ায় ঘরের সব-কিছু উড়িয়ে নিয়ে যাবে।

অতি ধীর শান্ত কণ্ঠে বিষ্ণুপ্রিয়া বলল—না সখি, ঝড়ের বেগ প্রচণ্ড হলে দরজা-জানলা সব খুলেই রাখতে হয়। নইলে যে ঘর ভেঙ্গে যায় সখি—ঘরই যে ভেঙ্গে যায়।

মনে মনে আশ্বস্ত হয়ে ভাবতে লাগল—এই ঝড়ের মধ্যে এই অন্ধকারে যদি তিনি আসেন আমার কাছে তবে মিথ্যা লজ্জার জন্য আমায় আর লজ্জা পেতে হবে না।

প্রণাম জানাতে চাইল বিপদভঞ্জন মধুসূদনকে। কিন্তু মনের মধ্যে গৌরচরণ ছাড়া আর কিছু খুঁজে পেল না।

"নেবে নিবুক প্রদীপ বাতাসে,
ঝড়ের কেতন উড়ুক আকাশে—
বুকের কাছে ক্ষণে ক্ষণে তোমার চরণ পরশনে
অন্ধকারে আমার সাধনা ॥"

—রবীন্দ্রনাথ ॥

ছয়

আর ভয় নেই অদ্বৈতাচার্যের।
সার্থক বোধন-মন্ত্রে আজ জেগেছে তার ভগবান।

মহাত্মা ঈশ্বর পুরী এই যজ্ঞের হোতা আর আচার্য নিজে তার উদ্গাতা। কিন্তু তার পূর্ণাহুতি হয়েছে কোন্ মন্ত্রে? সেই মন্ত্রের প্রথম সূক্ত বুঝি বিষ্ণুপ্রিয়ার নীরব অতল ভালবাসা, যে ভালবাসাকে ভক্তিসূত্রে নারদ বলেছেন—'মূকাস্বাদনবৎ'। এই পরমপ্রেমই ঘুচিয়েছে গৌরকৃষ্ণের আত্মবিস্মৃতি। যে-প্রেমরস আস্বাদনের জন্য এ নব-অবতাররূপ ধারণ, মনে জেগেছে তার স্মৃতির আভাস। ধন্য তুমি, বিষ্ণুপ্রিয়ার আত্মাহুত প্রেম।

তারপর এ দিব্যভাবের অভিব্যক্তিতে মধ্যসূক্ত হল গয়াধামে বিষ্ণুপাদপদ্ম-দর্শন।

মনে মনে সব কিছু বিশ্লেষণ করে দেখতে লাগলেন প্রভু অদ্বৈত।

বিষ্ণুপাদপদ্ম-দর্শনে যে এত ব্যাকুলতা—এমন আশ্চর্য ভাবান্তর, তা থেকেই বোঝা যায় গৌরাঙ্গের প্রকৃতস্বরূপ—প্রমাণিত হয় তার রাধাকৃষ্ণমিলিত বিগ্রহ। বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন দেখে একদিন বিহ্বল হয়েছিল শ্রীরাধা। আজ রাধারূপী গৌরের বিষ্ণুপদচিহ্ন দেখে সেই অতীত অনুভূতিই আবার জাগ্রত

হয়েছে স্মরণপটে। অথচ এ পদচিহ্ন কৃষ্ণরূপী গৌরের নিজেরই। তাই রাধা-কৃষ্ণের মিলিত বিগ্রহরূপে আপন পদচিহ্ন দেখে সে আপনি আত্মহারা।

আর এ দিব্য জাগরণের পূর্ণবিকাশে অন্ত্যসূক্ত হল ঈশ্বরপুরীর দীক্ষাদান। এই দীক্ষামন্ত্র ধীরে ধীরে তার লৌকিক বন্ধন ছিন্ন করে দিচ্ছে আর তা সম্ভব হচ্ছে শুধু এইজন্যে যে বিষ্ণুপ্রিয়ার নি স্বার্থ পবিত্র প্রেম প্রেমাস্পদকে মুক্তি দেয়—তাকে আবদ্ধ করে না।

ঈশ্বরপুরী সত্যই বুঝেছিলেন, এ শুধু বিষ্ণুপ্রিয়ার পক্ষেই সম্ভব। তার প্রেমেই শ্রীরাধার সেই কান্তাপ্রেমের প্রকাশ যার মধ্যে নেই 'আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিইচ্ছা', আছে শুধু 'কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিইচ্ছা'। যে-প্রেম অন্ধতম হয়ে দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে না, নির্মল ভাস্কর হয়ে উজ্জ্বল করে তোলে প্রিয়তমের শ্রেয়-পথ।

মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে, শুধু বাকী আছে যজ্ঞের ফলসিদ্ধি ৺ কেশবভারতীর কাছে সন্ন্যাস-গ্রহণ। তাহলেই এই 'ত্বিষাকৃষ্ণ' 'সুবর্ণবর্ণহেমাঙ্গ' পুরুষ 'সন্ন্যাসকৃৎ' হয়ে শাস্ত্রবাণী সার্থক করবে।

আর একটিমাত্র পদক্ষেপ। কিন্তু বড় কঠিন সে পদক্ষেপ। বিষ্ণুপ্রিয়াকে সেজন্য বুক পেতে দিতে হবে। তারই উপর দিয়ে প্রসারিত হবে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের চলার পথ। মথুরাগামী শ্রীকৃষ্ণের রথচক্র চলে গিয়েছিল শ্রীমতীর বক্ষ বিদীর্ণ করে। আজ সে রথচক্র এসে থেমেছে বিষ্ণুপ্রিয়ার বুকের কাছে। বিষ্ণুপ্রিয়া পারবে কি তার সামনে বুক পেতে দিতে? সারাজীবনের সুখ-হাসি-আনন্দকে পারবে কি গালিচার মত করে বিছিয়ে দিতে প্রিয়তমের চলার পথে?

অদ্বৈতাচার্যের মত অন্তর্দ্রষ্টার মনেও সংশয় জাগে।

কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়া বুঝি নিজেকেও নিজে অতিক্রম করে যেতে পারে অসাধ্য-সাধনের পথে।

কিছুদিন ধরে সংসারে মন দিয়েছে নিমাই। সংবরণ করেছে তার ভাবোচ্ছ্বাস—গৃহবিমুখতা। পূর্বেকার মতই যেন সংসারধর্ম পালন করছে হাসিমুখে। আশ্বস্ত হয়েছে আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব। পাড়া-প্রতিবেশীরাও আনন্দিত। এবার তাহলে বিষ্ণুপ্রিয়ার সেবা-যত্নে সে সত্যই বশীভূত হয়েছে। বুঝেছে তাহলে জননীর মর্মবেদনা।

তবু ভরসা পাচ্ছেন না শচীদেবী। বিশ্বাস করতে পারছেন না এ সৌভাগ্য।

নিভে যাবার আগে তো উজ্জল হয়ে ওঠে দীপশিখা। অস্তগামী সূর্য জাগায় অপূর্ব বর্ণসমারোহ।

বিষ্ণুপ্রিয়ার কাছে মনের আশঙ্কা প্রকাশ করেন শচীমাতা। স্মরণ করেন অতীতের অনেক অমঙ্গলসূচক কথা।

—জানো মা, একবার গঙ্গার ঘাটে এক ব্রাহ্মণ বড় রাগ করেছিল নিমাই-এর উপর। পৈতা ছিঁড়ে অভিশাপ দিয়েছিল নিমাই লক্ষ্মীছাড়া হবে বলে। সে-কথা মনে হলেই আমার প্রাণ কাঁপে।

বিষ্ণুপ্রিয়া বলল—কেন মা, আপনি সেসব পুরোনো কথা আবার মনে আনছেন।

শচীদেবী বিষ্ণুপ্রিয়ার এ কথায় কর্ণপাত করলেন না। বরং বললেন—আর একটা ঘটনাও কথাও না বলে পারছি না মা। এতদিন কাউকেই জানাই নি, কিন্তু তোমার কাছে আর গোপন করব না। হয়তো কাজটা আমার খুব অন্যায়ই হয়েছিল।

—থাক না মা ওসব কথা। তার চেয়ে আমি আপনাকে রামায়ণ পড়ে শোনাই।

—না বৌমা, আমায় বাধা দিও না। বেশ কিছুদিন আগেকার কথা। তখনও জানিনে বিশ্বরূপা আমায় ছেড়ে যাবে। একদিন একথা পুঁথি এনে সে আমার হাতে দিলে। বললে—মা, নিমাই বড় হলে এখানা তাকে পড়তে দিও। পুঁথিখানা ছিল কাপড়ে জড়ানো—ভাল করে বাঁধা। আমি তেমনিভাবে সেখানা রেখে দিলাম। কিন্তু বিশ্বরূপ যখন গৃহত্যাগ করল তখন ভাবলাম, যে-পুঁথি পড়ে সে গৃহত্যাগী হল সে পুঁথি নিমাইকে কিছুতেই পড়তে দেবো না। তাই একদিন—

বলতে বলতে অর্ধরুদ্ধকণ্ঠে থেমে গেলেন শচীমাতা।

বিষ্ণুপ্রিয়া করুণাভরা স্বরে বলল—আপনার যে বলতে কষ্ট হচ্ছে মা।

—তবু আমি বলব বৌমা। একদিন সেই পুঁথিখানি আমি জ্বলন্ত উনানে দিয়ে পুড়িয়ে ফেললাম। পাছে কোনোদিন তা নিমাই-এর হাতে পড়ে।

একটু থেমে চোখটা একবার আঁচলে মুছে নিয়ে শচীদেবী বললেন—জানিনে কি পুঁথি আমি পুড়িয়েছিলাম। আজ মনে হচ্ছে যেন বড় অপরাধ করেছি। হয়তো এ অপরাধের জন্য অনেক শাস্তি পেতে হবে।

বিষ্ণুপ্রিয়া সান্ত্বনা দিয়ে বলল—অপরাধ কেন হবে মা। আপনি তো

সন্তানের মঙ্গলের কথা ভেবেই একাজ করেছিলেন। তবু যদি কোনো অপরাধ হয়ে থাকে তবে আপনার হয়ে আমিই সে অপরাধ মাথা পেতে নিচ্ছি।

—ওকথা বোলো না মা। শচীদেবী প্রায় আর্তনাদ করে উঠলেন—আমার যাই হোক, তুমি সুখী হও—শান্তিতে থাকো।

মনে মনে হাসল বিষ্ণুপ্রিয়া। স্বামীর সুখেই যদি তার নিজের সুখ হয় তবে শচীমাতার আশীর্বাদ বার্থ হবে না। কিন্তু কে জানে সুখ কোথায়। কেউ বা হাসিতে সুখী, কেউ বা কান্নায়। বৃক্ষের সুখ অগণিত পুষ্পের সজ্জায় আর পুষ্পের সুখ আত্মনিবেদনে। সমুদ্রে বিলীন হয়ে সুখী হয় নদী, আর সমুদ্র সুখী হয় আপন বিস্তারে।

বিষ্ণুপ্রিয়াকে সুখী হতে হবে সুখের সমস্ত আশা বিসর্জন দিয়ে।

খাঁচার মধ্যে পাখিটা শান্ত নিশ্চুপ। বিষ্ণুপ্রিয়া এগিয়ে গিয়ে দেখল কখন যেন সে কেটে ফেলেছে পায়ের বন্ধন-শৃঙ্খল। এখন দ্বারের অর্গল মুক্ত করতে পারলেই সে আকাশে ডানা মেলবে।

শচীদেবী এসে বললেন—এমন শক্ত শেকলটা কেটে ফেলল। দেখছ বৌমা, ওর ঠোঁট দিয়ে রক্ত ঝরছে—পাও কেটে গেছে, তবু ভ্রূক্ষেপ নেই।

বিষ্ণুপ্রিয়া বলল—আহা, আমার বড় কষ্ট হচ্ছে মা। আমি ওকে ছেড়ে দেব। আর আবদ্ধ করে রাখব না।

—কাকে ছেড়ে দিবি প্রিয়া? পেছন থেকে কাঞ্চনার গলা শোনা গেল।

ফিরে তাকাল বিষ্ণুপ্রিয়া। দেখল সখি অমিতাও এসেছে কাঞ্চনার সঙ্গে। শচীদেবীও আনন্দিত হলেন তাদের দেখে। বিষন্ন বাতাসে যেন তারা বয়ে এনেছে আনন্দ-সুরভি।

বিষ্ণুপ্রিয়াকে বকলেন—যাও মা এদের নিয়ে ঘরে বসাও। আলাপ-আপ্যায়ন কর গিয়ে প্রাণভরে।

ঘরে গিয়ে কাঞ্চনা বলল—আয় প্রিয়া, তোকে আজ আমরা মনের মত করে সাজিয়ে দি।

বিষ্ণুপ্রিয়া হাসল। বলল—কার মনের মত করে সখি?

অমিতা বলল—নিমাই পণ্ডিতের ছাড়া আবার কার।

ঈষৎ গম্ভীর হয়ে বিষ্ণুপ্রিয়া বলল—তাঁর মন তো তোরা জানিস্‌নে। কেমন করে মনের মত সাজাবি ?

কাঞ্চনা বিষ্ণুপ্রিয়ার সর্বাঙ্গে একবার চোখ বুলালো। বলল—তবে কি বলতে চাস্‌ তোর এই মলিম বেশই তাঁর মনে ধরবে।

বিষ্ণুপ্রিয়া খানিকক্ষণ নীরব হয়ে কি কথা যেন ভাবতে লাগল। তারপর ধীরে বলল—তবে শোন্‌ সখি তিনি বলছেন আজ রাতে আপন হাতে আমায় সাজাবেন।

—এতদূর! অমিতা হেসে উঠল খিল খিল করে।

বিষ্ণুপ্রিয়া হাসল না। বলল—আমি জানি এ সাজানোর অর্থ কি। হয়তো আমাকে এই তাঁর শেষ উপহার।

—কি বলছিস্‌ তুই প্রিয়া!

—ঠিকই বলছি। এর পর সমস্ত জীবন যে-সাজে আমার আর আর সাজা হবে না, সে সাজেই তিনি শেষবারের মত সাজাবেন আমায়।

অমিতা বাধা দিয়ে বলল—সুখের মধ্যেও তুই দুঃখের ছায়া দেখতে পাস্‌ কেন প্রিয়া ?

কি করে সখিদের বোঝাবে বিষ্ণুপ্রিয়া। সে জানে তার জীবনে সত্য আসবে দুঃখের বেশেই। তার অনেক আভাস পেয়েছে বিষ্ণুপ্রিয়া মনের মধ্যে। গৌরসুন্দর যদি তাকে নীলাম্বরী দিয়ে সাজান, সে তো তাকে গভীর দুঃখ দিয়েই সাজানো। যে-মুক্তাহার তিনি বক্ষে তুলে দেবেন, সে যে বিষ্ণুপ্রিয়ার সমস্ত জীবনের জমাট-বাঁধা অশ্রুকণা। সিঁথিতে যে সিঁদুরের চিহ্ন আঁকা হবে সে তার আগামী জীবনের বিরহ-বেদনায় রক্তিন। দুচোখে কাজলের রেখায় ফুটে থাকবে অন্তহীন নিরাশার গাঢ় অন্ধকার। বিষ্ণুপ্রিয়া সব বোঝে। তবু যদি প্রিয়তমের ইচ্ছা হয়, এ সাজেই সে সাজবে।

যেন স্বগত বলল বিষ্ণুপ্রিয়া—দুঃখকে সুখের বেশে সাজিয়েই তাঁর খেলা।

কাঞ্চন বলল—তবে এ বড় নিষ্ঠুর খেলা সখি। পৃথিবীতে বুঝি একমাত্র তিনিই পারেন তার ভালবাসার জনকে এমন সাজে সাজাতে। আর শুধু তুই-ই পারিস্‌ এ সাজে সাজতে। অন্য কারু সাধ্য নেই—সাধ্য নেই।

বিষ্ণুপ্রিয়া স্থিরকণ্ঠে বলল—আমাকে যে পারতেই হবে কাঞ্চনা।

আর কোন পথ নেই বিষ্ণুপ্রিয়ার। জীবনে তার যে-রাত্রি আসছে তা

আর প্রভাত হবে না। সে রাত্রি বাদলের রাত্রি—ঝড়ের রত্রি। মনে তার স্বস্তি থাকবে না—চোখে থাকবে না ঘুম। সমস্ত রাত্রি ধরে জাগ্রত থেকে শিয়রের প্রদীপশিখাকে ঝড়ের হাওয়া থেকে আড়াল করে রাখতে হবে।

অমিতা ম্লন মুখে বলল—প্রিয়া, তোর কথা শুনে আমার বুক কাঁপছে।

প্রতিবাদের ভাষায় কাঞ্চনা বলল—বর্ষার মেঘে কি শুধু বৃষ্টিই থাকে, তাতে কি বজ্র-বিদ্যুৎ নেই? তুই একবার জলে ওঠ দেখি সখি। কোন্ পুরুষের এমন শক্তি আছে যে তাকে অবহেলা করতে পারে।

—আমি তাঁর ব্রতভঙ্গ করব না। বলল বিষ্ণুপ্রিয়া। সে জানে জীবনে জীবনে বিষ আছে—অমৃতও আছে। সবটুকু বিষ যদি গ্রহণ গ্রহণ করে বিষ্ণুপ্রিয়া তবেই গৌরসুন্দর সবটুকু অমৃত আস্বাদ করতে পারবে। বিষ্ণুপ্রিয়া প্রদীপ হয়ে জলবে আর গৌরাঙ্গ হবে সে-প্রদীপে মহিমার আলো। ধূপ হয়ে পুড়বে বিষ্ণুপ্রিয়া আর তার সুগন্ধ গৌরাঙ্গের যশোগাঁথা দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়বে।

অমিতা অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে রইল বিষ্ণুপ্রিয়ার দিকে—যেন এই তাকে প্রথম দেখছে। তারপর বলল—সখি, তুই যেন আজ আমাদের মনের নাগালের বাইরে। এসব আশ্চর্য কথা তুই কোথা থেকে কেমন করে শিখেছিস্ ভেবে পাইনে।

বিষ্ণুপ্রিয়া বলল—ভালবাসাই আমায় সব কিছু।

আর মনে মনে ভাবল—আমার দুঃখের মৃণালে যদি তোমার আনন্দের পদ্ম তবে আমি ধন্য হব—কৃতার্থ হব।

আমার বিরহের প্রদীপে যদি জলে জগতের কল্যাণশিখা, তবে হে আমার নিঠুর দরদী, তাই হোক্ তাই হোক্।

আমার অশ্রু-সাগর মন্থন করে যদি জাগে তোমার করুণার অমৃত-মাধুরী, হবে হে আমার দূরের আপন, তাই হোক্-তাই হোক্।

"কৃষ্ণ ত্বং দ্বাপরে শ্যামং কলৌ গৌরাঙ্গবিগ্রহং।
ধৃত্বাঽশেষ জনান্ প্রেমাভক্তিং যচ্ছসি লীলয়া॥"

—বাসুদেব সার্বভৌম॥

সাত

কৃষ্ণ তুমি দ্বাপরে শ্যামল কলিযুগে হলে গোরারায়।
প্রেমভক্তি অগণিতজনে বিতরণ করেছ লীলায়॥

পশ্চিমাকাশ বহু বর্ণসমাবেশে রঙীন।

হাতের সব কাজ শেষ করে অন্যমনে বসে বসে তাই দেখছিল বিষ্ণুপ্রিয়া।

তখনও দিনের অবসান হয় নি, সময় হয় নি সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালবার। ক্ষণিকের এ সমারোহের পানে তাকিয়েছিল বিষ্ণুপ্রিয়া আর ভাবছিল, এখনি সূর্য অস্তমিত হবে, রাত্রির আঁধার নেমে আসবে। এ বর্ণালীর চিহ্নমাত্র আর থাকবে না।

ঝঞ্ঝা-দুর্যোগ যত অন্ধকার নিয়েই আসুক, প্রকৃতি তাকে আপনার অঙ্গীভূত করে নেয়—তাকে বাধা দেয় না।

আর, প্রিয়তমের নিজের হাতে দেওয়া আঘাতের বেদনা—সে বেদনাও রমণীয়। সেই দুঃখের মাধুরীতে আমি আত্মহারা হব। বিপদের দিনে যাঁর পায়ে রাখতে পারি অন্তরের আর্ত আবেদন, তিনি স্বয়ংই যদি আসেন বিপদ হয়ে তবে আর কার কাছে অভিযোগ জানাব। ভয়হারী যদি স্বয়ং আসেন ভয়াল বেশে তবে আর নিজেকে সঁপে দেওয়া ছাড়া গতি কি।

তোমার হাতের বেদনার দান প্রত্যাখ্যান করে আমি চাই না আনন্দ—চাই না শান্তি-সুখ।

সত্যিই কি চায় না বিষ্ণুপ্রিয়া? পরীক্ষার মধ্য দিয়ে তারও নিপুণ নিরীক্ষা করেন অন্তর্যামী।

ঈশান চুপি চুপি এসে বলে—একটা কথা বলছিলাম বৌমা।

বিষ্ণুপ্রিয়া কৌতূহলী হল। ঈশানের আবার কি কথা থাকতে পারে তার কাছে। সে ভাব প্রকাশ হতে না দিয়ে বলল—কি কথা?

ইতস্তত করে ঈশান বলল—তাই বলছিলাম—মানে, ওই আমাদের শ্রীমন্ত গোয়ালার কথা।

: কি কথা তার?

: সে নাকি বৌমা অনেক রকম মন্ত্র-তন্ত্র জানে। তাই বলছিলাম যে—

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মনে মনে সঙ্কল্প স্থির করে নিয়ে বলল—তুমি তো সৌরভি দাসীকে চেনো। তার স্বামীকে মন্ত্র দিয়ে শ্রীমন্ত এমন ঘরমুখো করেছে যে—। কি বৌমা, তোমার বুঝি বিশ্বাস হচ্ছে না?

: তুমি যখন বলছ, বিশ্বাস কেন হবে না।

একথায় কিছুটা যেন ভরসা পেল ঈশান। বলল—আমি তোমাদের ছেলের মতই মা। তা তুমি যদি অনুমতি কর তাহলে শ্রীমন্তকে না হয় একবার ডেকে নিয়ে আসি।

বিষ্ণুপ্রিয়া ঈশানের মনের ভাব বোঝে। সে জানে এ পরিবারে সে আপন থেকেও আপন। সাধারণ ভৃত্যমাত্র নয়, কল্যাণকামী বান্ধব—পরামর্শদাতা সুহৃদ।

ঈশান যে-কথা বলতে চাইছে তাতে অনেক নারীরই সমর্থন মেলে। উদাসীন স্বামীর মন পাবার লোভ কোন্ স্ত্রীর না থাকে। কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়া জানে নারীর প্রকৃত আদর্শ। জীবনে মরণে সর্বক্ষেত্রে স্ত্রী-ই হবে স্বামীর অনুগামিনী।

কিন্তু ঈশানের মনে কষ্ট দিতেও সে চাইল না। তাই বলল—এসব কথার আমি কি জানি। মা-ই তো রয়েছেন।

ঈশান মাথা নেড়ে বলল—হ্যাঁ; তা তো বটেই। মাকে তো বলতেই হবে। তবু একবার তোমার মতটা—

বিষ্ণুপ্রিয়া অন্তর থেকে বলল—আমি মনে করি হরিনামের চেয়ে বড় মন্ত্র এজগতে আর কিছুই নেই।

বিষ্ণুপ্রিয়ার দিকে মুহূর্তকাল তাকিয়ে থেকে ঈশান ধীরে ধীরে সেখান থেকে সরে গেল। বিষ্ণুপ্রিয়াও চলে যাবার জন্য উঠে দাঁড়িয়েছিল, কার কণ্ঠস্বর শুনে সামনে তাকাল।

একটি বালিকা এসে দাঁড়িয়েছে আঙ্গিনার মাঝখানে। হাতে তার ফুলের সাজি। পরণে ডুরে শাড়ী, পায়ে মল, এলোচুল পিঠময় ছড়ানো।

উচ্চ মধুর কণ্ঠে বালিকা বলল—আমি এলাম গো মা। মালাকারদের মেয়ে।

আওয়াজ শুনে শচীদেবীও বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। বললেন—কেন এসেছ বাছা?

বালিকা হাসতে হাসতে বলল—বা রে, আসব না। তোমাদের জন্য ফুলের গয়না এনেছি যে।

অবাক হয়ে শচীদেবী বললেন—কিন্তু আমাদের তো এসব চাইনে।

বালিকা আবদারমাখানো স্বরে বলল—চাই না বৈকি! গোরাঠাকুর যে আমায় নিয়ে আসতে বললে। বললে—তোমার ফুলের গয়না সব আমি আজ কিনে নিলাম, তুমি গিয়ে আমার বাড়ি পৌছে দিয়ে এসো। তাই তো আমি এলাম গো।

শচীদেবী কিছুই বুঝতে পারছিলেন না। বিষ্ণুপ্রিয়ার দিকে তাকিয়ে বললেন—সেকি! কি হবে এসব গয়না দিয়ে? তুমি কিছু জানো বৌমা?

খিল খিল করে হেসে বালিকা বলল—রাধা সাজবে গো রাধা সাজবে। ফুলের সঙ্গে যে আমার বড়ো ভাব, তাই ফুলের ভাব দেখেই আমি সব বুঝতে পারি। আজ ফুল দিয়ে গয়না তৈরী করবার সময় দেখি সব ফুলই নূপুর হতে চায়। তাই আমি বললাম, ওগো ফুলেরা, আজ তোমরা সবাই কেন নূপুর হতে চাইছ? মুকুট, হার, কেয়ূর, কঙ্কণ—এসবের দিকে আজ কেন তোমাদের নজর নেই? ফুলেরা কি জবাব করলে জানো মা? ওরা বললে—আজ যে রাধারাণী সাজবে, তাই আমরা তার চরণ পেতে চাই।

শচীদেবী সস্নেহে বললেন—তুমি তো বেশ মিষ্টি কথা বল। তোমার নাম কি বাছা?

বালিকা কারু অভ্যর্থনার অপেক্ষা না রেখেই বারান্দার একধারে ফুলের সাজিটি রেখে দিল। নিজেও একধারে বসে বলল—আমার নাম পুষ্পময়ী।

কিন্তু গোরাঠাকুর আমায় ডাকেন পুষ্পমায়া বলে। ফুলের মায়া-ছলনা সব কিছু আমি জানি যে। ওরা যে আমার সঙ্গে অনেক কথা বলে।

সরল বালিকার ছেলেমানুষী কথাগুলি শুনতে বিষ্ণুপ্রিয়ার ভালই লাগছিল। ভাল লাগছিল শচীদেবীরও। তিনি বললেন—ফুলের কি কথা তুমি জান মা?

যেন খুব গোপন কথা বলছে এমনিভাবে বালিকা বলল—জান মা, ফুলের মধ্যে মায়া-মন্ত্র লুকানো থাকে। তাই এ গয়না যে পরে তাকে খুব সাবধানে থাকতে হয়।

শচীদেবী বিষ্ণুপ্রিয়ার দিকে তাকিয়ে বললেন—মেয়েটির কথাগুলি শুনতে বেশ। কিন্তু আবোল-তাবোল কি যে বলছে কিছুই বুঝতে পারছি নে।

শচীদেবীর কথা শুনে পুষ্পময়ী হেসে অস্থির। বলল—আবোল-তাবোল কেন হবে। তাহলে শোনো, ফুল আমাকে আরো কি বলেছে। কৃষ্ণকে রাধা সর্বক্ষণ নিজের কাছে ধরে রাখতে চাইত। কিন্তু পৃথিবীর আরো কতশত ভক্ত যে তাকে ডেকে ডেকে সারা হচ্ছে, তাদের কাছেও তো তাকে যেতে হবে। তাই কৃষ্ণ তখন রাধাকে ফুলের অলঙ্কারে সাজাতেন। ফুলের মায়ায় রাধার চোখে ঘুম নেমে আসত আর সেই সুযোগে চতুর কৃষ্ণ রাধাকে ছেড়ে পালাতেন।

একসঙ্গে এতগুলো কথা বলে বালিকা বিষ্ণুপ্রিয়ার দিকে তাকালো। বলল—কি গো ছোটমা, আমার কথা বুঝি বিশ্বাস হচ্ছে না।

বিষ্ণুপ্রিয়া বলল—হচ্ছে বৈকি। তুমি কি মিথ্যে বলতে পার।

শচীদেবী যেন এসব কথায় কেমন অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। বিষ্ণুপ্রিয়াকে জিজ্ঞেস করলেন—ও কি বলতে চায় বৌমা? এ সবের মানে কি?

বিষ্ণুপ্রিয়া মনে যাই অনুভব করুক মুখে বলল—ছেলেমানুষের সব কথার কি আর মানে থাকে মা:

পুষ্পময়ী হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে বলল—কথায় কথায় অনেক দেরী হয়ে গেল। আমি তাহলে এখন আসি মা। গোরাঠাকুরের ফুলগুলি এখানে রেখে গেলাম। ওকে বোলো পুষ্পমায়া রেখে গেছে।

তোমার হাতের স্পর্শে অমৃত যদি গরল হয়ে যায় তবে সে গরলই আমি জেনে-শুনে পান করব। বিচ্ছেদের সাগরে যদি পারাপারের খেয়া থেকেও থাকে তবু তুমি না চাইলে আমি পা রাখব না সেই খেয়ায়। আমার সব ইচ্ছা

অভিলাষ সেই অকূল বারিধির অতলে নীরবতার শুক্তিতে বেদনার মুক্তা হয়ে সংগোপন থাকবে।

তাই প্রভুর হাতের পুষ্পসজ্জা সে অবিচল হৃদয়ে দেহে তুলে নিল। সে জানে সন্ন্যাস-মাথুরের সব কিছু প্রস্তুত। কথার ছলে আপন মঙ্গল আর জীব-মঙ্গলের প্রার্থনা জানিয়ে শচীমাতার অনুমতিও গ্রহণ করেছেন তিনি। এখন শেষ বাধা এই কোমল ফুল-ডোরে ছিন্ন করে যাবেন।

বিষ্ণুপ্রিয়াও প্রস্তুত। সব কিছু মেনে নিতে প্রস্তুত। কিন্তু কি প্রয়োজন ছিল এ খেলার? কি প্রয়োজন ছিল বিষ্ণুপ্রিয়ার ঘুমের আড়াল দিয়ে চলে যাবার? রাত্রির আবরণে নিজেকে আবৃত করবার?

বিষ্ণুপ্রিয়ার শক্তির পরীক্ষা নিতে ভীত বুঝি স্বয়ং শক্তিধর।

ঠিকই বলেছিল বালিকা পুষ্পময়ী। ফুলের মায়ায় বুঝি ঘুম নেমে এসেছিল বিষ্ণুপ্রিয়ার চোখে। তারই ঘোরে বিষ্ণুপ্রিয়া যেন শুনতে পেল কার কণ্ঠস্বর—অতি আপন, চিরকালের পরিচিত।

: বিষ্ণুপ্রিয়া!

: কেন প্রভু?

: পাখিকে ছেড়ে দাও। খাঁচার দরজা খুলে দাও প্রিয়া।

: কেমন করে তা পারব। এতদিন ওকে ভালবাসা দিয়েছি—সেবা দিয়েছি।

: সেই ভালবাসার দাবিতেই পাখি আজ মুক্তি চায়। সত্যকার ভালবাসা তো কখনো পেছনে টানে না, সে তো এগিয়ে চলার প্রেরণা দেয়।

: প্রভু, আমার ক্ষুদ্র হৃদয়—ক্ষুদ্র ভালবাসা। যাকে ভালবাসি তাকে কাছে কাছে পেতে চাই।

: তোমার ভালবাসা ক্ষুদ্র নয় প্রিয়া। সে ভালবাসা উদ্বুদ্ধ করে অনন্ত-যাত্রায়—পরম প্রেমে। বেঁধে রাখতে চাইলেই তাকে হারাবে। পাবে শুধু নিষ্প্রাণ দেহ। তাই কি তুমি চাও?

: না না প্রভু, পাখিকে আমি মুক্তি দেব। খুলে দেব খাঁচার দরজা।

: তবে তুমি কথা দিলে?

: কথা দিলাম।

সঙ্গে সঙ্গেই ঘুম ভেঙ্গে চমকে উঠল বিষ্ণুপ্রিয়া। কাকে কথা দিলাম? কি কথা দিলাম?

উঠে বসল বিষ্ণুপ্রিয়া। ফুলের গন্ধ যেন চাপা কান্নার মত রুদ্ধশ্বাস। এক কোণে মৃদুশিখায় জ্বলছে গৃহপ্রদীপ। তার ম্লান আলোকে দেখা গেল উন্মুক্ত দ্বার—বাতাসের আন্দোলনে যেন বুক-ভাঙ্গা বেদনায় আর্তনাদ করে উঠছে। পাশে তাকিয়ে দেখল শয্যা শূন্য।

আপন দেহভার বহন করে বাইরে আসবার পথে একে একে ছিন্ন করে ফেলে দিল পুষ্পসজ্জা—পুষ্পহার, মুকুট, কেয়ূর, কঙ্কণ। মাটিতে তারা লুটাতে লাগল শোকাতুরের মত।

অন্যমনে শুধু পুষ্প-নূপুর খোলা হল না।

শচীদেবীর দ্বারে গিয়ে কম্পিত করে আঘাত করল বিষ্ণুপ্রিয়া। অবসন্ন দেহকে স্থির করে রাখল অতি সতর্কতায়।

শচীদেবী প্রদীপ হাতে দ্বার খুলে বাইরে এসে দাঁড়ালেন। বিষ্ণুপ্রিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে অস্ফুটে কি প্রশ্ন করলেন কর্ণগোচর হল না।

আর একটু অগ্রসর হলে প্রদীপের আলো গিয়ে পড়ল পাখীর খাঁচার বুকে। সেদিকে তাকিয়ে শচীমাতা আর্তকণ্ঠে চিৎকার করে উঠলেন। বিষ্ণুপ্রিয়াও তাকিয়ে থাকল নিশ্চল হয়ে।

খাঁচা শূন্য। উড়ে গেছে পাখি।

“সখি হে ! কেন গোরা নিঠুরহি মোহে।
জগতে করিল দয়া দিয়া যেই পদছায়া
বঞ্চল এ অভাগীরে কাহে॥”

—মুরারী গুপ্ত

আট

এখন আমার কি কর্তব্য ?

নিজের অন্তরের জমাট-বাঁধা কান্নাকে প্রকাশ করব চোখের জলের অজস্র ধারায় ? অথবা প্রবোধ দেব পুত্রহারা জীবন্মৃতা শচীমাতাকে ?

হয়তো সেবিকা বিষ্ণুপ্রিয়া আছে বলেই বৃদ্ধা জননীকে ত্যাগ করে সন্ন্যাস-পথে এগিয়ে যেতে ভরসা পেয়েছে গৌরসুন্দর। মনে মনে বিষ্ণুপ্রিয়ার হাতে মাতাকে সমর্পণ করে তবেই সে হতে পেরেছে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।

বিরহ-সাধন-সিদ্ধা বিষ্ণুপ্রিয়া অন্তর্লোকের আলোকে যেন ক্রমে ক্রমে ভেদ করে যাচ্ছে সব রহস্যের অন্ধকার।

আপন দুঃখের বিলাসিতা এখন আর আমাকে মানায় না। জগতের কাছে এই বিপুল বেদনার গৌরব প্রকাশের অহমিকাও আমায় ত্যাগ করতে হবে। গৌর যেন না ঢাকা পড়ে আমার গৌরবের আড়ালে।

তবে কি করে ভাব-গোপন করব আমি ? কি করে করব শোক-সংহরণ ?

বিষ্ণুপ্রিয়ার অন্তর থেকে ধ্বনিত হল বাণী—শরণাগত হও। আশ্রয় কর একান্ত শরণাগতির ছয়টি শীতল ছায়া।

অনুকূল হও সেবা-সঙ্কল্পের। বর্জন কর প্রতিকূল ভাবনা। তিনি রক্ষা করবেনই এ বিশ্বাস সুদৃঢ় রাখো। তাঁকেই তোমার একমাত্র প্রতিপালকরূপে বরণ করে নাও। তাঁরি পায়ে নিক্ষেপ করো অশান্ত চিত্তকে। দীন থেকে দীনতর হও—নিজেকে রাখো সকলের অন্তরালে।

তবেই এ দুঃখ-সাগরের তীরে উত্তপ্ত বালুকায় অবিচলিত স্থৈর্যে বসে থাকতে পারবে।

অন্নজল ত্যাগ করেছেন শচীমাতা। বিষ্ণুপ্রিয়ারও বিন্দুমাত্র স্পৃহা নেই পানাহারে। ক্ষুধাতৃষ্ণাই যেন সংকোচে দূরে সরে গেছে বিষ্ণুপ্রিয়ার করুণ অবস্থার কথা ভেবে।

কিন্তু তাহলে তো চলবে না। শচীমাতাকে তো বাঁচাতে হবে। প্রভু যা গচ্ছিত রেখে গেছেন তার কাছে, যথাসাধ্য রক্ষা করতে হবে তাকে। কিন্তু শচীমাতা অটল। শত অনুরোধেও তিনি অন্নজল স্পর্শমাত্র করছেন না তিনদিন ধরে।

নিজের বিবশ দেহকে তিরস্কার করে উঠে দাঁড়াল বিষ্ণুপ্রিয়া। রন্ধনশালায় গিয়ে নিজ হাতে প্রস্তুত করল অন্নব্যঞ্জন। শচীদেবীর সামনে এনে ধরে বলল—ওঠো না, একটু মুখে দাও। নইলে আমারও যে তোমার প্রসাদ পাওয়া হয় না।

বিষ্ণুপ্রিয়ার মুখ চেয়ে নামমাত্র আহার্য স্পর্শ করেন শচীমাতা। আর তার অবশেষ প্রসাদ বলে একান্তে মুখে তুলতে গিয়ে অশ্রুধারায় বিষ্ণুপ্রিয়ার বুক ভেসে যায়। মনে মনে মায়ের সে প্রসাদ গৌরসুন্দরকে নিবেদন করে উদ্দেশ্যে জলে ভাসিয়ে দেয়। কাউকে জানতে দেয় না কিছু।

গভীর সহানুভূতি বুকে নিয়ে নদীয়ার সকলেই আসে তাদের সান্ত্বনা জানাতে—আসেন নিত্যানন্দ, শ্রীবাস, বাসু ঘোষ। আসে বিষ্ণুপ্রিয়ার সখীরা। বিষ্ণুপ্রিয়া মুখ দেখাতে চায় না কাউকে। কারু সঙ্গে কথা বলতে চায় না সহজে। পাছে এত কঠিন আয়াসে তৈরী মনের বাঁধ ভেঙ্গে পড়ে। পাছে অপরের সমবেদনায় মন যায় দুর্বল হয়ে। নিভৃত গৃহকোণে নিজেকে নিজের মুখোমুখি বসিয়ে গৌরনাম স্মরণে শক্তি সঞ্চয় করে সে।

হঠাৎ অন্ধকারে দেখা গেল আলোর রেখা। নদীয়ায় সংবাদ এলো গৌরসুন্দর সন্ন্যাস নিয়ে বৃন্দাবনে যান নি। নিত্যানন্দ ভাবোন্মত্ত গৌরকে ভুলিয়ে নিয়ে এসেছে শান্তিপুরে। অদ্বৈতাচার্যের গৃহেই আছে সে।

শুধু তাই নয়। নিত্যানন্দ এসেছেন শচীদেবীকে গৌরাঙ্গের কাছে নিয়ে যেতে। প্রভুর আদেশেই এসেছেন।

বিষাদ-গম্ভীর নদীয়ায় হঠাৎ যেন আনন্দের প্লাবন জেগে উঠল। সকলেই যেন শচীমাতার সঙ্গে সঙ্গে গৌরাঙ্গদর্শনে যেতে উন্মুখ। এর মধ্যেই অনেকে দলে দলে ছুটে চলেছে শান্তিপুর অভিমুখে।

শচীদেবীর দেহে যেন প্রাণ ফিরে এসেছে—কণ্ঠে এসেছে বাণী। নিত্যানন্দের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন—তবে কি আমি তার দেখা পাবো ?

: আপনাকে সেখানে নিয়ে যাবার জন্যেই প্রভু আমায় পাঠিয়েছেন। বলল নিত্যানন্দ।

: আমি এখনি তার কাছে যাব। বলে উঠে দাঁড়ালেন শচীদেবী।

নিত্যানন্দ বলল—আমি আপনার জন্যে দোলা নিয়েই এসেছি মা।

সমাগত আরো অনেকেই যাবার অভিলাষ প্রকাশ করল। নিত্যানন্দ তাদের আশ্বস্ত করে বলল—আপনারা সকলেই যেতে পারেন তাঁর দর্শনে।

শচীদেবী প্রস্তুত হয়ে আসবার জন্য ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। একটু পরেই একখানা চাদর গায়ে জড়িয়ে নিয়ে যেমন ছিলেন তেমনি বেশে বেরিয়ে এলেন শচীদেবী। পেছনে অবগুণ্ঠিতা বিষ্ণুপ্রিয়া। প্রায় সর্বাঙ্গ তার চাদরে ঢাকা। দেখা যাচ্ছে না মুখ। বোঝা যাচ্ছে না, মনের অতল গভীরে লুকানো কোন্ দুঃখ-শোককে আবৃত করে জেগে উঠেছে কোন্ আশা-সান্ত্বনা।

নিত্যানন্দ শচীদেবীর মুখের দিকে তাকিয়ে ইতস্ততঃ করতে লাগল। যেন কি কথা বলতে গিয়েও বলতে পারছে না।

অসহিষ্ণু শচীদেবী বললেন—আর দেরী কিসের বাবা ? আমরা তো যাবার জন্যে প্রস্তুত।

: একটা কথা মা। বলে মাথা নত করে রইল নিত্যানন্দ।

: কি কথা বাবা ?

: শ্রীমতীর সেখানে যাবার আদেশ হয় নি।

কিছুক্ষণের জন্য সকলেই বজ্রাহত। পরিপূর্ণ নিস্তব্ধতা চারিদিকে।

হঠাৎ যেন বিক্ষোভে উদ্বেল হয়ে উঠলেন শচীদেবী। তীব্রকণ্ঠে বলে উঠলেন—সে কি! নদীয়ার সমস্ত মানুষের যেখানে যাবার অধিকার আছে, সেখানে অধিকার নেই শুধু আমার বিষ্ণুপ্রিয়ার। তার অপরাধ?

: সন্ন্যাসীর পক্ষে এ বিষয়ে বিধিনিষেধ বড় কঠোর। নিত্যানন্দ অস্ফুট কণ্ঠে বলল।

শচীদেবী তবু প্রশ্ন তুললেন—বেশ, স্ত্রীর দাবী নিয়ে সে যাবে না। নদীয়ার কত নারীই তো তাকে দর্শন করতে যাচ্ছে। তাদেরই একজন হয়ে দূর থেকে একবার সে দেখে আসবে।

নিত্যানন্দ বলল—মা, একথা আমিও প্রভুকে বলেছিলাম। কিন্তু তিনি বললেন—সাধারণ মানুষ একথা বুঝবে না। তারা দুর্নাম রটাবে। তাতে সন্ন্যাসধর্মের অমর্যাদা হবে।

শচীদেবী দুপা পিছিয়ে এলেন। বললেন—তবে আমিও যাবো না। তুমি ফিরে যাও নিত্যানন্দ।

নিত্যানন্দ বিভ্রান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। কি বলবেন কি করবেন, কিছুই স্থির করতে পারলেন না।

এতক্ষণ বিষ্ণুপ্রিয়া নির্বিকার ভাবে দাঁড়িয়েছিল। এবার সে মৃদু স্বরে কথা বলল—আমি না গেলেই ক্ষতি কি মা। আপনার কাছ থেকে তো সব কিছুই জানতে পারব। তাছাড়া আমি গেলে তুলসীমঞ্চে সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালবে কে? তার চেয়ে এই ভালো।

চোখের জল মুছে নিয়ে শচীদেবী বললেন—তোমাকে ফেলে আমি কোন্ প্রাণে যাবো মা।

শান্তকণ্ঠে বিষ্ণুপ্রিয়া বলল—আপনাকে যে যেতেই হবে। যান মা, সকলে আপনার জন্যে অপেক্ষা করে আছে।

বলেই আর দাঁড়াল না বিষ্ণুপ্রিয়া। সকলের বিস্মিত বেদনার্ত দৃষ্টির সামনে দিয়ে ধীরে ধীরে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল। সেখান থেকেই অনুমানে বুঝতে পারল শচীমাতাকে তুলে নিয়ে দোলা চলে গেল। মনে মনে বলল—মা গো, তোমার একার চোখ দিয়েই তুমি দুজনার দেখা দেখে এসো।

বিষ্ণুপ্রিয়া বসে রইল নীরব নিশ্চল হয়ে। কতক্ষণ কেটে গেছে কোনো

ধারণা নেই। চোখ থেকে নিঃসারে অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়ছে কিনা তাও বুঝতে পারছে না। মনে প্রশান্তি নেই, বিক্ষোভ ও নেই। নেই সৌভাগ্যের অভিনন্দন অথবা দুর্ভাগ্যের অভিযোগ। সব কিছু মাথা পেতে মেনে নিল বিষ্ণুপ্রিয়া।

তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক আমার জীবনে। বিরহ-সাগরের দুই তীরে দুজনে থাকব চিরকাল—এই যদি হয় তোমার অভিপ্রায়, তবে তাই হোক্। কৃষ্ণলীলায় যিনি মোহন মুরলীধর, গৌরলীলায় তাঁর বাঁশী হতে হবে বুঝি আমাকেই। তাই এ জীবনকে শত শত ছিদ্র করে তিনি যদি বাজাতে চান, তবে তাই হোক্।

শুধু এইটুকু প্রার্থনা—দুঃখের সুদীর্ঘ রাতে সমস্ত পৃথিবী যখন আমায় ত্যাগ করবে, তখন হে আমার প্রাণাধার, তুমিও যদি আমার হৃদয় ত্যাগ করে যাও, তবু যেন তোমার প্রেমে বিন্দুমাত্র সংশয় না জাগে।

দরজায় আঘাত করে বিষ্ণুপ্রিয়ার নাম ধরে ডাকল কাঞ্চনা। বিষ্ণুপ্রিয়া চিন্তা সংবরণ-করে উঠে দরজা খুলে দিল। ভিতরে এসেই রুদ্ধ কণ্ঠে কাঞ্চনা বলতে লাগল—সখি, এই কি গৌরহরির দেবত্ব? এই কি তাঁর মহত্ব? তোমায় তিনি চিনতে পারলেন না? তাঁর পথের বাধা বলে ভাবলেন?

বিষ্ণুপ্রিয়া ধীরে অতি ধীরে বলল—তাঁকে ভুল বুঝো না সখি। তিনি যে মনের অতল গভীরে দেখতে পান। ভাল করেই জানেন তিনি, আমি তাঁকে বাঁধতে আসিনি—ভোগের পথে আমি কোনোদিন তাঁকে টানব না।

: তবে তোমায় কেন এত দুঃখ দিলেন?

: অন্তরে আমায় তিনি ত্যাগ করেন নি। তাঁর কৃষ্ণপ্রেমে যে আমার প্রেম মিলিয়ে আছে। তাঁর কৃষ্ণসেবায় যে মিশে আছে আমারও সেবা-ভক্তি।

: তবু এত কঠোর হলেন কেমন করে?

: আমি বুঝেছি শুধু লোকশিক্ষার জন্যেই তাঁর এ ব্যবহার। নিজে আচরণ করেই যে তাঁকে ধর্মশিক্ষা দিতে হবে। সে-আচরণে কোনো ত্রুটী থাকলে তো চলবে না।

আর কোনো কথাই বলতে পারল না কাঞ্চনা। মনে মনে শ্রদ্ধা জানিয়ে বলল—তুমি মানবী নও—মানবী নও, তুমি দেবীরও দেবী। প্রতিমার মতই আবাহন আর বিসর্জনে সমান নির্লিপ্ত তুমি।

আজ থেকে তুমিই আমার প্রেমের গুরু।

"যথা বৃন্দাবনং ত্যক্ত্বা ন যযৌ নন্দনন্দনঃ।
নবদ্বীপং পরিত্যজ্য তথা যাস্যামি ন ক্বচিৎ॥"
—শ্রীচৈতন্যতত্ত্ব দীপিকা॥

নয়

বৃন্দাবন ত্যাগ করে নন্দের নন্দন কানু যায় না যেমন।
নবদ্বীপ ত্যাগ করে আমিও কোথাও কভু যাব না তেমন॥

যে-পথে দিবস চলে যায়, সে পথেই চলে যায় রাত্রি। দিনে দিনে কাটে মাস, মাসে মাসে বৎসর। বৎসরের পর আবার বৎসর।

সেবা আর ভজনে ডুবে থেকে বিষ্ণুপ্রিয়ার সময়-চেতনা হারিয়ে গেছে।

পুত্রের কথা ভেবে ভেবে শচীদেবী পাগলিনীপ্রায়। মাঝে মাঝে সব কিছু বিস্মরণ হয়ে যায়। বিস্মৃত হয়ে যান নিমাই-এর অনুপস্থিতি। বিস্মৃত হয়ে যান নিজেকে।

সর্বদা দৃষ্টি রাখতে হয় বিষ্ণুপ্রিয়াকে—সর্বদাই থাকতে হয় কাছে কাছে।

রাত্রির ঘোর না কাটতেই খুব ভোরে উঠে পড়ে বিষ্ণুপ্রিয়া। সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে হাত ধরে শচীমাতাকে নিয়ে যায় গঙ্গাস্নানে। তারপর পুষ্পচয়ন করে তাঁকে বসিয়ে দেয় ইষ্টপূজায়।

শচীমাতার রুচিশূন্য মুখে তৃপ্তি যোগাবার জন্য প্রস্তুত করে নানাবিধ ব্যঞ্জন। কাছে বসে থেকে অনুরোধ-উপরোধ করে যথাসাধ্য আহার করায়। তারপর তাঁর বিশ্রাম-শয়নের ব্যবস্থা করে নিজে এসে মায়ের ভুক্তাবশিষ্ট অন্নব্যঞ্জন প্রসাদজ্ঞানে নামমাত্র মুখে তোলে।

সেবা থেকে আসে ভজন, ভজন থেকে ভক্তি।

জন্মসিদ্ধা বিষ্ণুপ্রিয়ার অন্তরে আপনা থেকেই নববিধাভক্তি স্ফুরিত হয় দিনে দিনে ; উপাংশু-জপিত গৌরনামই যেন গুরু হয়ে তাকে নিয়ে চলেছে অগম পথে।

মনে মনে চলে স্মরণ, বন্দন। শচীমাতার সঙ্গে গৌরকথা আলোচনা-ছলে চলে শ্রবণ, কীর্তন। প্রকাশ্যে ভজন-পূজন না করলেও মনের পটে কল্পনার ছবি এঁকে তাঁর পায়ে রাখে অশ্রুপুষ্পাঞ্জলি। দাস্য, সখ্য, পাদসেবন আর আত্ম-নিবেদন—সব ভাবই বার বার ফিরে ফিরে আসে।

তবু মনে হয় যেন কোথায় থেকে যায় অপূর্ণতা। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে সে তো দর্শন করেনি তার প্রভুকে, তাই মনে জাগে শুধু গৌরাঙ্গরূপ। সঙ্গে সঙ্গে মনে সংশয় জাগে—গৌরাঙ্গরূপের চিন্তায় তাঁকে আকর্ষণ করলে যদি কোনো বাধা হয় প্রভুর সাধনপথে। মনে মনে ভাবে, একবার—শুধু একবার যদি দূর থেকেও তাঁর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রূপ দেখতে পেতাম তবে মনকে নিবিষ্ট করতাম সে-রূপেরই পদতলে।

আর বিষ্ণুপ্রিয়ার ইচ্ছা আশ্চর্যভাবেই পূর্ণ করেন অন্তর্যামী।

এর আগে এমনি এক আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়েছে বিষ্ণুপ্রিয়ার।

গৌরসুন্দর চৈতন্যরূপে ঘুরে বেড়াচ্ছেন দ্বারে দ্বারে। নামপ্রেমদানে চেতনা সঞ্চার করছেন আচণ্ডালে। দূরে দূরান্তরে ছড়িয়ে পড়ছে তার মহিমাগাথা। নবদ্বীপের ছোট গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ আরো ছোট গৃহগণ্ডীতে বিষ্ণুপ্রিয়ার কাছে কি করে পৌছাবে সে বার্তা। মাঝে মাঝে নীলাচল থেকে সংবাদ ভেসে আসে লোকমুখে। বহুদিন সংবাদ না পেলে শচীমাতা অস্থির হয়ে ওঠেন—সর্বংসহ মনেও দুর্বলতা আসে বিষ্ণুপ্রিয়ার।

এমনি এক দুর্বল মুহূর্তে সংশয় জেগেছিল বিষ্ণুপ্রিয়ার মনে। অগণিত ভক্তের কথা ভেবে ভেবে প্রভু আমার আকুল। তাঁর স্মৃতির পটে একটুও স্থান অবশিষ্ট আছে কি আমার জন্যে? অভাগিনীর কথা তাঁর কি আর মনে পড়ে?

আর কিছু তো প্রার্থনা নেই আমার। তোমার চরণে স্থান পাই নি, স্থান পাব না কি তোমার স্মরণেও? জলের আল্পনার মত সব চিহ্ন কি মুছে যাবে?

এ চিন্তা অসহ মনে হয় বিষ্ণুপ্রিয়ার কাছে। মনে হয় সে দুর্বল হয়ে পড়ছে—শক্তির প্রয়োজন তার। ভাবে, তিনি আমায় ভোলেন নি শুধু এই একটিমাত্র কথা যদি জানতে পেতাম, তাহলে সমস্ত কিছুই সহজ হত। শক্তি পেতাম দুঃসহ-সহনে, মর্মদাহী দহনে।

আর ঠিক তখনই নদীয়ায় এলেন দামোদর পণ্ডিত নীলাচল থেকে মহাপ্রভুর সংবাদ নিয়ে। প্রভু শীঘ্রই আসবেন জন্মভূমি দর্শন করতে। শুধু সংবাদ নয়, বিষ্ণুপ্রিয়ার জন্য আরো অমূল্য সম্পদ নিয়ে এসেছেন দামোদর পণ্ডিত। প্রভুর প্রেরিত পট্টবস্ত্র প্রিয়াকে দেবার জন্যে।

নির্জন কক্ষে সেই পট্টবস্ত্র বুকে চেপে ধরল বিষ্ণুপ্রিয়া। সে পেয়েছে তার জিজ্ঞাসার উত্তর। প্রভু জানতে পেরেছেন তার মনের প্রার্থনা, ইঙ্গিতে জানিয়েছেন তিনি তাকে ভোলেন নি—তাকে ভোলেন নি।

বিষ্ণুপ্রিয়া বুঝেছে প্রভু যতদূরেই থাকুন, তাঁর দৃষ্টি আছে অভাগিনীর প্রতি। বিষ্ণুপ্রিয়ার মনের প্রতিটি চিন্তা তিনি জানতে পারেন আর তার আকুল প্রার্থনাও পূর্ণ করেন যথাকালে।

এ কথার সত্যতাই প্রমাণিত হল, যখন পূর্ণ হল বিষ্ণুপ্রিয়ার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপ দর্শনের অভিলাষ।

এক উদার প্রসন্ন প্রভাতে সহসা দূরাগত আনন্দধ্বনি শোনা গেল। তার মধ্যে যেন মেশানো শ্রীগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি। শচীমাতা উৎকর্ণ হলেন। বিষ্ণুপ্রিয়াকে ডাকলেন কাছে।

সংবাদ পেতে দেরী হল না। শচীমাতার গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী পুত্র এসে উপনীত হয়েছেন নদীয়ার উপকণ্ঠে—গঙ্গার পরপারে কুলিয়া গ্রামে। দলে দলে নরনারী ছুটে চলেছে তাঁকে দর্শন করবার জন্যে। শচীদেবী বললেন—চল মা, আমরাও যাই। হয়তো সে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসবে না—দূর থেকেই হয়তো বা চলে যাবে বিদায় নিয়ে।

বিষ্ণুপ্রিয়া দ্বিধা করে বলল—কিন্তু মা, তিনি যদি না চান—

: লক্ষ লক্ষ মানুষের সঙ্গে মিশে তাকে আমরা দূর থেকে একবার দেখে আসব। তাতে তার কি ক্ষতি হবে মা।

বিষ্ণুপ্রিয়ারও বহুদিনের আকাঙ্ক্ষা একবার দেখবে তার প্রিয়তমের বিশ্বপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপ। তাছাড়া সে যদি সঙ্গে না যায় তবে যাওয়া হয় না বৃদ্ধা

অসহায়া শচীমাতার। অপরের হাতে সঁপে দিতেও ভরসা হয় না। অনেক ভেবে বিষ্ণুপ্রিয়া যাবার জন্যে প্রস্তুত হল।

এ এক আশ্চর্য দেখা! গঙ্গার অপর পারে দাঁড়িয়ে আছেন মহাপ্রভু আর অসংখ্য দর্শনার্থীর মধ্যে পরপারে দাঁড়িয়ে শচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়া। দুইতীরে দুইজন—মাঝখানে ব্যবধান রচনা করেছে গঙ্গা। কিন্তু অতি পবিত্র এ ব্যবধান। বিষ্ণুপ্রিয়া তাকিয়ে দেখল একবার—শুধু চোখ দিয়ে নয়, সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে। মনে পড়ল কৃষ্ণদর্শনাভিলাষের সেই খেদোক্তি—আহা, যে-রূপ সহস্র চক্ষে দেখেও সাধ মেটে না, তা দেখবার জন্যে বিধাতা দিয়েছেন মাত্র দুটি চোখ—সে চোখেও আবার নিমেষ।

তবু সেই পিপাসিত দৃষ্টির মধ্য দিয়েই বিষ্ণুপ্রিয়া ওই কৃষ্ণচৈতন্যরূপ তার অন্তর-মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করল। আজ থেকে এই রূপই তার আরাধ্য দেবতা—তার সেবা-বিগ্রহ।

বিষ্ণুপ্রিয়ার মনের আশা এতদিনে পূর্ণ হল।

শচীমাতার বক্ষে আশা-নিরাশার স্পন্দন-দোলা। নিমাই কি সন্ন্যাসের নিয়ম রক্ষার জন্য দূর থেকে জন্মভূমি দর্শন করেই বিদায় নেবে, না কি আসবে একবার জন্মভূমি-সমা জননীকেও দেখতে?

নিমাই আমার কাছে এলো কই? সে তো এলো না। তবে কি আসবে না সে? বিলাপের স্বরে বারবার প্রশ্ন করেন শচীমাতা। সেই করুণ আর্তি শুনে স্থির থাকতে চায় না বিষ্ণুপ্রিয়ার মন। কত কি ভাবে। ভাবে, তবে কি আমার জন্যই তিনি আসছেন না মাতৃদর্শনে। পুত্রকে কাছে পাবার পথে আমিই কি তবে একমাত্র বাধা? মুহূর্তের জন্য ধিক্কার আসে জীবনে। কি অর্থ তবে এই বেঁচে থাকার?

পরক্ষণেই লজ্জিত হয় নিজের এই চিন্তায়। আমার নিবেদিত জীবন নিয়ে কি করবেন না করবেন, তা তিনিই জানেন। মরা-বাঁচার কথা ভাববার আমি কে?

সংবাদ এলো মহাপ্রভু এসেছেন শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর গৃহে। বিষ্ণুপ্রিয়া শুনতে পেল সে সংবাদ—পৌঁছাল শচীদেবীরও কানে। কম্পিত দেহে দুর্বল চরণে তিনি ছুটে চললেন প্রাঙ্গণ পেরিয়ে বহির্দ্বারের দিকে। নিমাইকে দেখবার জন্য আর একমুহূর্তও বিলম্ব সয় না।

বিষ্ণুপ্রিয়া দেখতে পেয়ে ছুটে এসে বাধা দিল পেছন থেকে—এমনি করে কোথায় চলেছ মা। দাঁড়াও, কথা শোনো।

ফটক পেরিয়ে পথের দিকে ছুটে যেতে যেতে শচীমাতা বললেন—আমি আমার নিমাই-এর কাছে যাচ্ছি।

ব্যাকুল হয়ে নিষেধ জানাল বিষ্ণুপ্রিয়া—যেও না মা। পথ জানো না তুমি—দেহ দুর্বল। একটু অপেক্ষা কর। ঈশানকে পাঠাই তোমার সঙ্গে।

কিন্তু বিলম্ব সয় না শচীমাতার। ছুটে যেতে যেতে তিনি বললেন—পথ আমি জিজ্ঞাসা করে করে জেনে নেব।

বিষ্ণুপ্রিয়াও সাথে সাথে ছুটে গিয়েছিল কিছুদূর। তারপর সচেতন হয়ে থমকে দাঁড়াল। প্রভুর বিনা অনুমতিতে কোনমতেই যাওয়া চলে না তাঁর কাছে—দাঁড়ানো যায় না তাঁর সামনে গিয়ে। যদি তার অশুভ-দর্শনে প্রভুর সাধন-পথে বিঘ্ন ঘটে।

ভগ্ন বুকে চিন্তিত মনে ফিরে এলো বিষ্ণুপ্রিয়া। ঈশানকে ডেকে শচীমাতার সন্ধানে পাঠিয়ে দিল শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর গৃহে।

গৌরাঙ্গকে দর্শন করে ঈশানের সঙ্গে যখন ফিরে এলেন শচীমা, তখন তাঁর মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত—চোখে অশ্রুর প্লাবন।

এসেই তিনি জড়িয়ে ধরলেন বিষ্ণুপ্রিয়াকে। আনন্দ-বিধুর কণ্ঠে বললেন—বৌমা, সে আসবে। সে বলেছে কাল সকালে জন্মস্থান দর্শন করতে সে গৃহদ্বারে আসবে। তুমি প্রস্তুত থেকো মা।

বিষ্ণুপ্রিয়া কিভাবে প্রস্তুত থাকবে? কেমন করে কি দাবী নিয়ে সে যেতে পারবে সংসার-বিবাগী এই মহাসন্ন্যাসীর কাছে? যিনি অতি পরিচিত হয়েও আজ একান্ত অপরিচিত। অতি কাছে এলেও যিনি থাকবেন বহুদূরে।

বিষ্ণুপ্রিয়া স্মরণ করল গৌতমবুদ্ধের কথা।

গোপার তো ছিল পুত্র রাহুল। গোপা তাকে পাঠিয়েছিল নিজের প্রতিনিধি করে পিতৃধনপ্রাপ্তির প্রার্থনায়। কিন্তু কে হবে বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রতিনিধি? কেমন করে সে ভিক্ষা করবে স্বামীর দিব্য-সম্পদের অংশ?

না, কিছুই চাইব না—কোনো প্রার্থনাই আমি জানাব না তাঁর কাছে। অযাচিতভাবে সুখ দুঃখ যা কিছু দেবেন তিনি আমি মাথা পেতে নেব।

নিতে আসেনি বিষ্ণুপ্রিয়া, শুধু দিতে এসেছে। গৌর-অবতারে প্রভু

আচণ্ডালে নাম প্রেম বিতরণ করে যাবেন। লক্ষ লক্ষ নরনারী বিনামূল্যে পাবে এ অক্ষয় সম্পদের অধিকার; আর তাদের সকলের হয়ে এর মূল্য দেবে বিষ্ণুপ্রিয়া। অগণিত মানুষ যতই পাবে দিব্য আনন্দের আস্বাদন ততই তাদের সকলের দুঃসাধ্য সাধনার দায় একা বিষ্ণুপ্রিয়াকে বহন করতে হবে নিঃশব্দ দুঃখের মধ্য দিয়ে। মহাপ্রভুর সুদুর্লভ সঙ্গ লাভ করবে কতশত পতিত-তাপিত জীব আর তাদের সেই মিলনের মূল্য দেবে লোকমাতা বিষ্ণুপ্রিয়া অনন্ত বিরহের নিরন্তর প্রদাহে।

সারারাত জেগে বর্হিদ্বারে বসে রইলেন বার্ধক্যভার-পীড়িতা শচীদেবী। দ্বারের অন্তরালে বসে নিঃশব্দে রাত জাগল বিষ্ণুপ্রিয়া। রাতভোরে জেগে উঠল কীর্তনের ধ্বনি। মহাপ্রভুকে নিয়ে ভক্তবৃন্দ এগিয়ে আসছে। শেষবারের মত জন্মভূমি জন্মস্থান দেখে চলে যাবেন গৌরসুন্দর।

আনন্দ-কল্লোল জয়ধ্বনি যত এগিয়ে আসছে, ততই উৎফুল্ল হয়ে উঠছেন শচীমাতা। এইবার তাঁর নিমাই এসে দাঁড়াবে তাঁর সামনে। তাকে পাবেন তিনি বুকের কাছে।

আর বিষ্ণুপ্রিয়া! দ্বারের অন্তরালে বসে তার সব অনুভূতি যেন ধীরে ধীরে বিবশ হয়ে আসছে—চেতনা যেন বিলীন হতে চলেছে এক সীমাহীন গভীরতায়।

বিষ্ণুপ্রিয়ার সমাহিত দেহ যেন একসময় ভূলুণ্ঠিত হল একটি সমর্পিত প্রণামে। অতিমানস বোধিতে যেন উপলব্ধি করল মহাপ্রভুর অলৌকিক উপস্থিতি। যেন শুনতে পেল তাঁর অনুচ্চারিত বাণী—গৌরপ্রিয়া যদি হতে চাও তবে কৃষ্ণপ্রিয়া হও।

যখন মাথা তুলল বিষ্ণুপ্রিয়া তখন থেমে গেছে সব কল্লোল-কোলাহল। আঙিনা নির্জন। অর্ধমূর্ছিতা শচীদেবীর পায়ের কাছে বসে আছে চিরসেবক ঈশান।

অকারণ অশ্রুধারায় ঝাপ্‌সা হয়ে গিয়েছে বিষ্ণুপ্রিয়ার দৃষ্টি। আঙিনার ধূলি মাথায় তুলে নেবার জন্য সামনে হাত বাড়াল বিষ্ণুপ্রিয়া। কি যেন ঠেকল হাতে। সর্বাঙ্গে খেলে গেল বিদ্যুৎশিহরণ। চোখ মুছে তাকিয়ে দেখল সামনে রয়েছে যুগল-পাদুকা—মহাপ্রভুর পদচিহ্ন-অঙ্কিত।

বিষ্ণুপ্রিয়ার অযাচিত প্রার্থনা পূরণ করে গিয়েছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। এই প্রতীক-প্রদানের মধ্য দিয়েই প্রভু তাকে আজীবন সেবার অধিকার দিয়ে গেছেন।

"পতিধর্ম রক্ষা করে সেই পতিব্রতা।
নবদ্বীপে বিষ্ণুপ্রিয়া ভুমি কল্পলতা॥
আমার বচন সতী কর অবধান।
তোমার শাশুড়ী যেন দুঃখ নাহি পান॥"

—জয়ানন্দ॥ চৈতন্যমঙ্গল॥

দশ

প্রাঙ্গণে এক বৈষ্ণবী এসে খঞ্জনী বাজিয়ে গান ধরল। সেই গানের সুরে সুরে ঝরে পড়তে লাগল শ্রীরাধার প্রাণের আক্ষেপানুরাগ।

"সই, লোকে বলে কালা পরিবাদ।
কালার ভরমে হাম জলদ না হেরি গো
তেজিয়াছি কাজরের সাধ॥"

আপন ঘরে বসে একমনে চরণ-পাদুকা ফুলচন্দন দিয়ে সাজাচ্ছিল বিষ্ণুপ্রিয়া। গান শুনতে শুনতে ক্রমেই অন্যমনা হয়ে পড়ল। মন যেন আকর্ষিত হতে লাগল বহির্জগত থেকে অন্তর্জগতে।

বৈষ্ণবী গাইল—

"চণ্ডীদাস ইথে কহে সদাই অন্তর দহে
পাসরিলে না যায় পাসরা।
দেখিতে দেখিতে হরে তনুমন চুরি করে
না চিনি কালা কিম্বা গোরা॥"

চমকে উঠল বিষ্ণুপ্রিয়া। চণ্ডীদাসের রচিত গানে এ কার কথা? 'না চিনি কালা কিম্বা গোরা'—এ কথায় কিসের আভাস দিয়েছেন তিনি?

বারবার ঘুরে ফিরে মনে জাগে গানের শেষ কলিটি। বিষ্ণুপ্রিয়ার হাত

আপনা থেকে যেন শ্লথ হয়ে আসছে—চোখ যেন জড়িয়ে আসছে কি আবেশে। কি এক স্নিগ্ধ আলোর সাগরে যেন তিনি ডুবে যাচ্ছেন।

সহসা সেই আলোর কেন্দ্রস্থলে ফুটে উঠল এক ছবি—মুরলীধারী শ্যামসুন্দর কৃষ্ণ, মাথায় শিখিচূড়া, হাতে বাঁশী, গলায় কদম্বের মালা। ধীরে ধীরে সেই মূর্তি রূপান্তরিত হতে লাগল। শ্যামকান্তি হয়ে গেল গৌরকান্তি। মস্তকের শিখিপাখা হয়ে গেল ললাটের তিলকরেখা। বক্ষের কদম্বমালা ধীরে ধীরে হয়ে গেল কণ্ঠের তুলসীমালা। বাঁশী হয়ে গেল সন্ন্যাসীর দণ্ড।

এক অভূতপূর্ব আনন্দ-চেতনায় বহুক্ষণ কেটে গেল। হঠাৎ সম্বিত ফিরে এলে দেখল সে তেমনি বসে আছে চরণ-পাদুকার ওপরে হাত রেখে। কখন থেমে গেছে সঙ্গীত—ভিক্ষা নিয়ে চলে গেছে বৈষ্ণবী। ঘরে ঢুকতে গিয়ে দরজার কাছে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ঈশান।

বিষ্ণুপ্রিয়া ভাবল, কৃষ্ণ আর গৌর যদি অভেদ, তবে আমি কৃষ্ণপ্রিয়া না হয়ে গৌরপ্রিয়াই থাকব চিরকাল—করব গৌরনামকীর্তন। আর অমনি তার অন্তরের মধ্যে বসে কে যেন অস্ফুট মৃদুস্বরে গুঞ্জন করে উঠল—

"ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গের নাম রে
যে জনা গৌরাঙ্গ ভজে সে হয় আমার প্রাণ রে॥"

হর্ষ-বিস্ময়ে চিৎকার করে বলতে চাইল বিষ্ণুপ্রিয়া—আমি পেয়েছি, আমি পেয়েছি। কত অবলম্বন দিয়েই তিনি আমাকে আশ্বাস যোগাচ্ছেন। দিয়েছেন সেবার অবলম্বন শচীমাতাকে, পূজার অবলম্বন দিয়েছেন আপন চরণের পাদুকা। ধ্যানের অবলম্বন দিয়েছেন স্বরূপদর্শনে আর নামজপের অবলম্বন দিলেন এই কীর্তনমন্ত্র। কত বিচিত্র প্রভুর এই দানের লীলা।

বিষ্ণুপ্রিয়া নিজে কিছু ত্যাগ করছে না, কারণ মনে তার ত্যাগের স্পৃহাও নেই। অথচ আপনা থেকেই সব ত্যাগ হয়ে যাচ্ছে একে একে।

নিরন্তর বিরহের অন্তর্দহনে স্বর্ণাভকান্তি হয়ে গেছে মলিন—দেহ হয়েছে শীর্ণ, আর সেই শীর্ণদেহে গুরুভার হয়ে বহু অলঙ্কার খসে পড়েছে—শীত ঋতুর আগমনে যেমন একটি একটি করে খসে যায় বিরস বৃক্ষপত্র। জীর্ণ-বসন স্থানে স্থানে ছিন্ন হয়েছে—জটিল হয়ে উঠেছে অসংস্কৃত রুক্ষ কেশ। মাঝে মাঝে কাঞ্চনা অমিতা সখিরা আসে—বিষ্ণুপ্রিয়ার অবস্থা দেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলে। কিন্তু সাজসজ্জা নিয়ে কথা বলতে অভিরুচি হয় না কারু।

আর শচীমাতা। বয়সের ভারে তিনি স্থবির। তার ওপর শোকভার। জীর্ণক্লান্ত দেহ প্রায় উত্থানশক্তি-রহিত। দৃষ্টি ক্ষীণ হয়ে গেছে। সর্বক্ষণের সঙ্গী শুধু দীর্ঘশ্বাস আর চোখের জল। ভগ্ন বুকের প্রতি সম-বেদনায় কণ্ঠস্বর ও ভগ্ন—রুদ্ধপ্রায় বাক্‌শক্তি। অবরুদ্ধ ভাষা প্রকাশের চেষ্টায় মাঝে মাঝে আবেশ-কম্পিত হয়ে ওঠে ওষ্ঠাধর। এ বিষাদ-করুণ দৃশ্য যেন আর চোখে দেখা যায় না।

শচীমাতার জন্য বিষ্ণুপ্রিয়ার সর্বক্ষণ উৎকণ্ঠা—সর্বক্ষণ সতর্কতা। নিজের কথা ভুলে গিয়ে সে দেবীজ্ঞানে সেবা করে চলে শচীমাতার। কি করে তাঁকে একটু আরাম দেবে—কি করে করবে তাঁর একটু সুখবিধান—এই তার দিবারাত্রির চিন্তা।

সারারাত জেগে শিয়রে বসে থাকে বিষ্ণুপ্রিয়া—যেন জনচিহ্ন হীন সমুদ্রতীরের বাতিঘরে নিঃসঙ্গ সতর্ক প্রহরী। চোখ ঘুমে জড়িয়ে আসতে চাইলে স্মরণ করে সেই দারুণ রাত্রির কথা—যখন প্রভু চলে গিয়েছিল তার ঘুমের আড়াল দিয়ে। ঘুমকে তাই বিষ্ণুপ্রিয়া আর কিছুতেই অভ্যর্থনা জানাবে না। ম্লান আলোকের মধ্যে খুলে রাখে তার একাগ্র দৃষ্টি। শচীমাতার বিন্দুমাত্র প্রয়োজনেই যেন বাড়িয়ে দিতে পারে সেবার হস্ত।

এমনি করে রাত ভোর হয়। দিনের বেলা কাজের জটিলতা আরো বেশি। গঙ্গাজল আহরণ করে আনা, তুলসী-সেবা, চরণ-পাদুকা-অর্চন, অঙ্গন-মার্জনা, গৃহ-সংস্কার, রন্ধনকার্য—তারই মধ্যে অনবরত যেতে হয় শচীদেবীর পরিচর্যায়। সর্বক্ষণ বিষ্ণুপ্রিয়াকে যেন খুঁজে বেড়ায় তাঁর দুইটি চোখ। তাই অনুতাপে দগ্ধ হয় বিষ্ণুপ্রিয়ার মন। কত ত্রুটি যে থেকে যাচ্ছে সেবায়।

একমাত্র সহায় চিরসেবক ঈশান। কিন্তু বয়সের ধর্মে তার দেহও ক্রমে দুর্বল হয়ে আসছে—কমে আসছে শক্তি-সামর্থ্য। তবু সে অনলস পরিশ্রম করে চলে—কাজ করতে চায় ক্ষমতা ছাড়িয়ে।

ঈশানকে বেশী কাজের ভার দিতে আর মন চায় না বিষ্ণুপ্রিয়ার। দীর্ঘকাল ধরে বহু সেবা করেছে সে সকলের। এখন বিশ্রাম প্রয়োজন—প্রয়োজন যথেষ্ট অবসরের। এদিকে আবার ঈশানকে বিশ্রাম দিতে গেলে বিষ্ণুপ্রিয়ার আপ্রাণ চেষ্টায়ও গৃহের কর্তব্যকর্মে অথবা শচীমাতার সেবায় কিছু-না-কিছু অসম্পূর্ণতা থেকে যায়।

এই উভয়-সঙ্কটে বিচলিত হয়ে পড়েছে বিষ্ণুপ্রিয়া। ভেবে পায় না সে উদ্ধারের পথ। একদিকে পুত্রশোকাতুরা জীবন্মৃতা বৃদ্ধা শচীমাতা, অন্যদিকে দীর্ঘসেবাশ্রান্ত দুর্বল বৃদ্ধ ঈশান। কাউকেই দুঃখ দিতে তার মন চায় না। অথচ কেমন করেই বা করতে পারে উভয়ের সুখবিধান ?

অবশেষে একান্ত অসহায় হয়ে নিবেদন জানাল প্রভুর চরণ-পাদুকার কাছে—তোমার দাসীকে পথ বলে দাও। বলে দাও কি করে হবে এ জটিল সমস্যার সমাধান। অশ্রুরোধ করবার একান্ত চেষ্টা সত্ত্বেও দু এক ফোঁটা ঝরে পড়ল চরণ-পাদুকায়।

: মাগো, ছোট মা! ঈশানের ডাক শোনা গেল বাইরে থেকে। একবার বাইরে এসে দেখে যাও।

দ্বারের কাছে এসে দাঁড়াল বিষ্ণুপ্রিয়া—যেন পাণ্ডুর চন্দ্রলেখা মেঘের আড়াল থেকে মুখ বাড়াল।

বারান্দার একধারে বিনীত ভঙ্গিতে বসে আছে এক অপরিচিত বৈষ্ণব।

বিষ্ণুপ্রিয়াকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাতে দেখে ঈশান বলল—গৌরহরি আমাদের ভোলেনি মা। এই দেখ একে পাঠিয়ে দিয়েছে আমাদের কাছে।

আভূমি প্রণাম জানিয়ে আগন্তুক বলল—মা, আমার নাম বংশীবদন। আপনাদের সেবার জন্য কৃপা করে প্রভু আমায় পাঠিয়েছেন। প্রভুর আশীর্বাদে আমি যে-কোন কঠিন কাজ অক্লেশে সমাধা করতে পারি। শুধু আপনার আদেশের অপেক্ষা।

বিষ্ণুপ্রিয়া বিস্ময়ে আনন্দে স্তব্ধ হয়ে রইল কিছুক্ষণ। প্রাণের প্রার্থনাবাণী উচ্চারিত হতে-না-হতেই তা পূর্ণ করেছেন তার অন্তর্যামী। মৃদুকণ্ঠে বংশীকে বলল—প্রভুর ইচ্ছাই আমাদের ইচ্ছা।

আশ্চর্য কর্মকুশলতা বংশীবদনের। কষ্টসাধ্য বহুকাজ অল্পক্ষণের মধ্যে সাঙ্গ করে আবার এসে নূতন কাজ চায়। কাজের মধ্যেই যেন নিহিত আছে তার জীবনের সব আনন্দ। মহাপ্রভুর আপনজনদের সেবার মধ্য দিয়ে সে যেন মহাপ্রভুকেই সেবা করে চলে। মহাপ্রভুর আদেশ মনে করেই বিষ্ণুপ্রিয়ার কাছে নিরন্তর কাজের আদেশ প্রার্থনা করে।

ঈশানের দায়িত্বভার অনেকখানি হালকা হয়ে গেছে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারছে সে। বিষ্ণুপ্রিয়া যথেষ্ট অবকাশ পাচ্ছে তার আবশ্যিক কার্যগুলি

সম্পন্ন করেও। সে-সময়কে সার্থক করে তুলছে ভজন-সাধনায়। ক্রমশঃ ডুবে যাচ্ছে মনের অতল গভীরে।

শচীমাতা ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছেন মুক্তির মহাতীর্থপথে। ক্রমেই স্তব্ধতার অভিমুখী হচ্ছে তাঁর শিথিল দেহ। শিয়রের কাছে বসে থাকে বিষ্ণুপ্রিয়া। মাঝে মাঝে মৃদুমধুর কণ্ঠে শচীমাতার কানের কাছে কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করে শোনায়। মনে মনে কিন্তু জপ করে গৌরনাম। মহাপ্রভু অন্তরে কৃষ্ণ বাহিরে গৌর, আর বিষ্ণুপ্রিয়ার বাহিরে কৃষ্ণ অন্তরে গৌর।

মাঝে মাঝে ঈশান্ আর বংশী সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়ে বিষ্ণুপ্রিয়াকে বিশ্রাম করতে পাঠিয়ে দেয়। তখন আপন ভজন-মন্দিরের নির্জনতায় পাদুকা-যুগলের সামনে এসে বসে বিষ্ণুপ্রিয়া। এখানেই তার দেহমনের একান্ত বিশ্রাম। এখানেই তার আশ্রয়—তার আরাধনা। তার সব ভাবনার বিরাম—সব বেদনার মাধুরী।

ক্রমেই কঠোর আচার-আচরণ—কঠোরতর নিয়ম-নিষ্ঠার দিকে এগিয়ে চলেছে বিষ্ণুপ্রিয়া। একেই অতি পরিমিত আহার, তার উপর প্রায়ই নানা উপলক্ষে উপবাস-পালন—কখনো বা নিরম্বু প্রয়োপবেশন।

কৃষ্ণাতিথির চন্দ্রের ন্যায় ক্রমক্ষীয়মান দেহ—যেন যথার্থই দেহ-বল্লরী। অবলম্বনহীন, তাই যে-কোনো মুহূর্তে ভূলুণ্ঠিত হবে বলে শঙ্কা জাগে। কিন্তু দুচোখে অপূর্ব জ্যোতি—তার আভায় ললাট উদ্ভাসিত। মনে হয় তপঃক্লিষ্টা পার্বতী।

নিঃসঙ্গতাই আজ আনন্দ বিষ্ণুপ্রিয়ার। ভজন-প্রসঙ্গে সব সঙ্গ সে ত্যাগ করতে প্রস্তুত। দীর্ঘদিনের সুখ-দুঃখের সঙ্গিনী কাঞ্চনা ও অমিতা কিছুতেই তার সঙ্গ ত্যাগ করতে চায় না। সখীর প্রতি স্বাভাবিক প্রীতির সঙ্গে এখন ধীরে ধীরে এসে মিলেছে শ্রদ্ধা। সখীর অনন্যসাধারণ জীবন-যাপন তাদের মনে বিস্ময় ও ভক্তি জাগিয়ে তুলেছে।

তাই বিষ্ণুপ্রিয়াকে দর্শন যেন তাদের পক্ষে দেবীদর্শন। বিষ্ণুপ্রিয়ার অঙ্গনে পদার্পণ যেন তাদের কাছে তীর্থগমন।

নিঃশব্দে বিষ্ণুপ্রিয়ার কাছে বসে থাকলেও তাদের মন পূর্ণ হয়ে যায়। অন্তর যেন বলে—একটু সেবার অধিকার আমাদেরও দিও।

তোমার সেবাতেই হবে গৌরহরির সেবা, আর গৌরহরির সেবাই তো স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের সেবা।

"কোথায় আলো কোথায় ওরে আলো!
বিরহানলে জ্বালো রে তারে জ্বালো।
ডাকিছে মেঘ, হাঁকিছে হাওয়া, সময় গেলে হবে না যাওয়া—
নিবিড় নিশা নিকষঘনকালো।
পরাণ দিয়ে প্রেমের দীপ জ্বালো॥"

—রবীন্দ্রনাথ

এগার

এইবার ভেঙ্গে দাও এ জীর্ণ দেহের মৃন্ময় পাত্র।
ঘটাকাশ মিশিয়ে দাও পটাকাশে।

শচীমাতার শিয়রের কাছে বসে তাঁর বেদনা-রেখাঙ্কিত মুখের দিকে তাকিয়ে মনে মনে প্রার্থনা জানায় বিষ্ণুপ্রিয়া।

সন্তানহারা মাতারূপে গৌরজননীকে যুগে যুগে পেতে হয়েছে অনেক সন্তাপ। মানুষের কল্যাণের বেদীমূলে উৎসর্গ করতে হয়েছে ক্ষত-বিক্ষত জীবনের রক্তিম অর্ঘ্য।

নিজের দুর্ভাগ্যের কথা ভুলে গিয়ে বিষ্ণুপ্রিয়া তাই তার অন্তর্যামীর কাছে একান্ত মিনতি জানায়।

আর কেন? এইবার শোকসমুদ্র থেকে তুলে নাও তোমার সর্বশোকহারী শান্তিপুলিনে। মুছিয়ে দাও সমস্ত গ্লানি।

বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত শচীদেবীর শয্যাপার্শ্ব ছেড়ে আর যায় না বিষ্ণুপ্রিয়া। গৃহের যত কাজের ভার হাতে তুলে নিয়েছে কাঞ্চনা অমিতা। বাইরের কাজে রয়েছে ঈশান আর বংশীবদন।

অতি প্রত্যুষে জনপ্রাণী জাগবার আগেই ঈশানের সঙ্গে গঙ্গার ঘাটে যায় বিষ্ণুপ্রিয়া। স্নান সেরে গঙ্গাজল নিয়ে আসে। তারপর অশ্রান্ত অক্লান্ত সেবা। মনে হয় স্বয়ং সেবা-ই যেন রূপগ্রহণ করে বসে আছে শচীদেবীর শিয়রে।

মাঝে মাঝে কাঞ্চনা এসে অনুরোধ জানায়—যাও সখি, একটু বিশ্রাম নাও। আমি ততক্ষণ বসছি এখানে। কোনো ত্রুটি ঘটবে না সেবা-যত্নে।

বিষ্ণুপ্রিয়া সম্মত হয় না। বলে—মায়ের চোখদুটি যে সারাক্ষণ আমাকে খুঁজে বেড়ায়। আশ্বস্ত হয় আমায় দেখে। তাঁর দৃষ্টি থেকেই আমি বুঝে নিতে পারি সব মনোভাব—সমস্ত প্রয়োজন। এখানে বসে থাকতে আমার আর কষ্ট কি সখি।

বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রার্থনা বুঝি গিয়ে পৌঁছেছে তার অন্তর্যামী প্রভুর কাছে। তাই আজকাল মাঝে মাঝে শচীমাতার মুখে সে দিব্য আনন্দের ভাব লক্ষ্য করে। অর্ধবাহ্যচেতনায় যেন কার উপস্থিতি অনুভব করেন তিনি। কার সঙ্গে যেন আলাপ করেন মনে মনে। কম্পিত হয় ওষ্ঠ—হাসি ফুটে ওঠে অধরে। কখনো বা অস্ফুটে উচ্চারিত হয় গৌরনাম।

বিষ্ণুপ্রিয়া অনুমানে বুঝতে পারে, পুত্রহারা জননীর অন্তশ্চেতনা আজ অনুক্ষণ কাছে কাছে পাচ্ছে তাঁর স্নেহের দুলালকে—তারই সঙ্গে কুশলবার্তা বিনিময় হচ্ছে মনে মনে। যেন বহুদিন পরে ঘরে ফিরে এসেছে তাঁর প্রবাসী পুত্র।

দুঃখ-শোকের রেখাঙ্কিত মুখ দিনে দিনে উজ্জ্বল হচ্ছে এক আনন্দিত আভায়। বিষ্ণুপ্রিয়া প্রতিমুহূর্তে নিরীক্ষণ করে চলেছে সবকিছু। উপলব্ধি করতে পারছে প্রতিটি সূক্ষ্ম সংবেদন—মুখরেখার প্রতিটি সূক্ষ্মতম পরিবর্তন। দেহ এপারে থাকলেও শচীমাতার মন আজ শোকসমুদ্র উত্তীর্ণ হয়ে গেছে।

সেই অব্যক্ত আনন্দে বিষ্ণুপ্রিয়ার মনও আজ আনন্দিত। চোখে তার কৃতজ্ঞতার অশ্রু। ধন্য তুমি প্রভু। জন্ম-দুঃখিনী জননীর শেষ যাত্রার পথখানি মধুময় শান্তিময় করে দিলে।

নবদ্বীপের নরনারী প্রত্যহ-ই এসে শচীমাতার সংবাদ নিয়ে যায়।

প্রতিবেশীরা আসে সর্বদাই। দূর-দূরান্তর থেকেও আসে বহু ভক্তসেবক। দরজার পাশে দাঁড়িয়ে শচীমাতাকে দর্শন করে যায়—সঙ্গে সঙ্গে মেলে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়ারও দর্শন। যেন লজ্জা-ভয়-দুঃখহীন একখানি ছবি—কোন্ মহান্ শিল্পীর হাতে আঁকা।

সীমায়িত রেখায় অসীম ব্যঞ্জনা।

অল্পাক্ষর কবিতায় যেন ভাব-ভূমার অচিন্ত্য প্রকাশ।

শচীমাতার মুখের পানে তাকিয়ে যেন জন্ম-জন্মান্তরের কত ছবি দেখতে পায় বিষ্ণুপ্রিয়া। তার দৃষ্টির সম্মুখ থেকে সরে যায় তিমির-আবরণ।

সে দেখতে পায কপিল-অবতারে পুত্রহারা মাতা দেবহূতির বেদনা। গৃহবৈরাগী ব্রহ্মচারী কপিলের মায়ামোহহীন প্রজ্ঞা, আর তাকে স্নেহভরা বুকে বেঁধে রাখবার জন্যে দেবহূতির ব্যর্থ ব্যাকুলতা। দেখতে পায় জননী কৌশল্যার প্রতিচ্ছবি। দণ্ড-মুকুট-সিংহাসন ত্যাগ করে শ্রীরামচন্দ্র চলে গেছেন বনবাসে, আর শূন্যগৃহে শূন্যহৃদয়ে নীরবে অশ্রুবর্ষণ করছেন রামহারা কৌশল্যা।

আবার কারারুদ্ধ দেবকীর শোকসন্তপ্ত মুখের ছবি ফুটে ওঠে বিষ্ণুপ্রিয়ার দৃষ্টির সামনে। আপন নন্দনকে অপরের বুকে তুলে দিয়ে নিজে ভগ্নবুকে বিচ্ছেদ-বেদনায় দিনযাপন করছেন।

বেদনাক্লিষ্ট পুত্রশোকাতুর সমস্ত যুগের সমস্ত জননীর মুখছবি যেন এসে একাকার হয়ে যায় শচীদেবীর অবসন্ন মুখ-পটে।

কোন্ আদি জননীর অতৃপ্ত বাৎসল্যের এ অপরূপ দুঃখলীলা! কিন্তু হে ঈশ্বর, সেই অনাদিলীলার এ অভিনয়ই যেন দুঃখের শেষ অভিনয হয়।

দুঃখের আঁধারে ঘেরা সুদীর্ঘ জীবনের পটভূমিকায় মৃত্যু যখন আসে তখনই ফুটে ওঠে তার প্রকৃত মহিমা। শচীমাতারও জীবন সুন্দর হল মৃত্যুর মাধুরীতে।

গঙ্গাতীরের সেই অন্তিম ক্ষণের দৃশ্য। মুমূর্ষুর মুখে সেই আনন্দের সহাস দীপ্তি। চারিদিকে ভক্তবৃন্দের কণ্ঠে সুমধুর সংকীর্তনের সুর। শতশত নদীয়া-বাসীর সেই শ্রদ্ধাপূর্ণ জয়ধ্বনি, সবই যেন বিষ্ণুপ্রিয়ার কাছে স্বপ্ন বলে মনে

হয়েছিল। মুক্তির আনন্দে পূর্ণ অথচ স্মৃতিবেদনাময়। হৃদয়গ্রাহী, অথচ স্থায়িত্ববিহীন।

তারপর এলো নিঃসঙ্গ নিঃশব্দ দিনগুলি। যে স্নেহছায়া তাকে প্রখর দুঃখতাপ থেকে সর্বদা আড়াল করে রাখতে চাইত, সে ছায়া আজ আর নেই। এখন শুধু অনাবৃত সূর্যালোকে দগ্ধ মরুময় প্রান্তর।

শচীমাতার সুদীর্ঘ জর্জর জীবন যেন এক মহাকাব্যের ছিন্ন পাণ্ডুলিপি। সে-কাব্যের যে-পৃষ্ঠা প্রথম পাঠ করেছিল বিষ্ণুপ্রিয়া, মনে পড়ে যায় তার বিবরণ। গঙ্গাতীরে সেই প্রথম দর্শন, সস্নেহ সম্ভাষণ—তারপর সেই প্রথম প্রশ্ন—কে তুমি মা?

শচীমাতার সেই প্রথম প্রশ্ন যেন বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রতি সমগ্র জগতের চিরন্তন প্রশ্ন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের স্বরূপ তবু বা জানা যায় বোঝা যায় ভক্ত ভাবুকদের উপলব্ধি-অনুভূতির আলোকে—জ্ঞানী তত্ত্বদর্শীর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে। বিষ্ণুপ্রিয়া সম্বন্ধে সবকিছু জেনেও মনে শুধু থেকে যায় প্রথম উচ্চারিত সেই একই প্রশ্ন—কে তুমি মা?

মাঝে মাঝে বিষ্ণুপ্রিয়া নিজেও ভাবে—আমি কে? কি আমার পরিচয়? স্বামী যার গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী—প্রকৃতি-সম্ভাষণে বিমুখ, কি সেই নারীর পরিচয়? যার কাছে নেই মাতৃসমা শচীদেবীর আশ্রয়-অঙ্ক, নেই পুত্র-কন্যার কোনো অভিজ্ঞান, কি সেই রমণীর পরিচয়?

এই নিঃসঙ্গ নিরালম্ব অনাড়ম্বর জীবনে সর্বত্যাগিনী ছাড়া সে আর কি হতে পারে? কি হতে পারে কর্মসন্ন্যাসিনী ছাড়া?

বিষ্ণুপ্রিয়া তার কঠোর জীবনকে কঠোরতর করে তোলে। সখীদের অনুনয় ঈশানের অশ্রুজল—কিছুই তাকে সঙ্কল্পচ্যুত করতে পারে না।

পিত্রালয় থেকে লোক এলো বিষ্ণুপ্রিয়াকে নিয়ে যাবার জন্য। শচীমাতা পরলোকগতা হয়েছেন—এখন একা বধূ কেমন করে থাকতে পারে এই শূন্য ভবনে।

কিন্তু লোক ফিরিয়ে দিলে বিষ্ণুপ্রিয়া। স্বামী-শ্বশুরের এই ভিটা—এই তুলসীমঞ্চ এই গৃহসেবা পাদুকা-অর্চন ত্যাগ করে কোথাও কোনো স্বর্গেও যাবে না সে। বিশেষতঃ পিতৃগৃহ এখন মাতাপিতাশূন্য—ইতিপূর্বে উভয়েই পরলোকগত। তাই সুখের গ্লানি অপেক্ষা দুঃখের মাধুরীই তার কাছে অনেক বেশী স্পৃহণীয়।

কিন্তু দিন চলবে কি করে? জীবন ধারণের জন্য অন্ততঃ কিছু সম্বল ও তো প্রয়োজন। পিতৃগৃহ থেকে এবার এলো অর্থসাহায্যের প্রস্তাব। এ প্রস্তাব ও প্রত্যাখ্যান করল বিষ্ণুপ্রিয়া। তার যেটুকু প্রয়োজন প্রভুই তা পূর্ণ করবেন। আর প্রভু যে-প্রয়োজন মেটাবেন না, তা মেটাতে পারে এমন শক্তি কার?

কয়েকদিন পরে এলো প্রচুর খাদ্যসম্ভার। পিতৃগৃহ থেকে দুজন মানুষ তা বয়ে এসেছে। এবারে বিষ্ণুপ্রিয়া একটু চিন্তা করল। কারু প্রাণে আঘাত দিতে তার মন চায় না। তাই অপর্যাপ্ত খাদ্যসম্ভার থেকে প্রভুর ভোগের জন্য সামান্য কিছু ফল-মূল তুলে রেখে বাকী সব ফিরিয়ে দিল বিষ্ণুপ্রিয়া। বলে পাঠাল—তেমন কোনো অভাব-অভিযোগ নেই আমার। রয়েছেন সহৃদয় প্রতিবেশীরা, আছে আমার, প্রিয় সখীগণ। গৃহে আছে অক্লান্ত সেবকেরা। আর সকলের ওপরে রয়েছেন আমার প্রাণের প্রভু।

আর মনে মনে ভাবল, একমাত্র আমার প্রভুর সেবা অবলম্বন করে আমি একাই থাকতে চাই—হতে চাই সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ নিষ্কিঞ্চন।

ভক্তসাধকদের মনে এভাব ধীরে ধীরে জাগে দীর্ঘ সাধনপ্রভাবে। বিষ্ণুপ্রিয়া স্বরূপে নিত্যসিদ্ধা, তথাপি লৌকিক জীবনকে স্বীকার করেছেন বলে সাধনার স্তরগুলি একে একে অতিক্রম করছেন লোক-প্রত্যয়ের জন্য। ফুটে ওঠাই ফুলের আপন স্বভাব, তবু দীর্ঘ রাত্রি ধরে সে যেন করে ফোটার সাধনা। চন্দ্রের স্বভাবই জ্যোৎস্না-বিতরণ, তবুও কৃষ্ণাতিথিব্যাপী যেন তার তিমির-সাধনা। তটিনী স্বভাবতঃই সাগরাভিমুখী, তবু কতশত নগর বন্দর গ্রাম প্রান্তর ছুঁয়ে ছুঁয়ে যেন তার পথ-সাধনা।

বিষ্ণুপ্রিয়ার জীবনে তেমনি ফুটে উঠছে সাধনার নির্দিষ্ট ক্রমগুলি। গঙ্গাতীরে গৌরাঙ্গদর্শনে প্রথম শ্রদ্ধা জেগেছিল তার মনে। তারপর মিলনে পেল গৌরহরির দুর্লভ সঙ্গ, বিচ্ছেদে সুরু হল ভজনক্রিয়া। বিরহ-দুঃখময় জীবনে যখনি যে অনর্থ-বিপদ এসেছে, তার নিবৃত্তি হয়ে গেছে গৌরসুন্দরের কৃপায়।

তারপর নিষ্ঠা ও রুচির স্তর পেরিয়ে নামাসক্তির পর্যায়ে এসে পৌঁছেচে বিষ্ণুপ্রিয়া। তাই নিরন্তর চলছে নামকীর্তন নামস্মরণ।

নারদভক্তিসূত্রে বর্ণিত ভক্তিলক্ষণের সঙ্গেও মিলে যাচ্ছে ক্রমে বিষ্ণুপ্রিয়ার ভাবলক্ষণ—'তদ্‌বিস্মরণে পরমব্যাকুলতা'। মুহূর্তের জন্যও তাঁকে ভুলে গেলে—তার নামগ্রহণে বিস্মৃতি এলে পরমব্যাকুল হয়ে ওঠে বিষ্ণুপ্রিয়া।

বংশীবদন বেশ কিছুদিন মহাপ্রভুর সঙ্গলাভ করেছে। তাঁর মুখ থেকে শুনেছে ভজন-কীর্তনের অনেক মহিমা-বর্ণন। তাই বংশীর কাছ থেকে মাঝে মাঝে সে-সব প্রসঙ্গ শ্রবণ করে বিষ্ণুপ্রিয়া।

বংশীবদন বলে—তুমি এত কঠোরতা কেন পালন করছ মা? প্রভু বলেছেন কলিতে শুধু নাম-কীর্তনেই সব সাধনার ফল হবে।

: কি বলেছেন তিনি নাম-কীর্তনের কথা? জানতে চায় বিষ্ণুপ্রিয়া।

: সব কথা কি আর আমি গুছিয়ে বলতে পারি। নামে চিত্তদর্পণের মার্জনা হয়, সংসারের মহাদাবাগ্নি নির্বাপণ হয়, লাভ হয় সব কল্যাণ সব বিদ্যা-বুদ্ধি। হৃদয়ে আনন্দ-সাগর উথলে ওঠে, তারপর হয় পূর্ণ অমৃতের আস্বাদন।

মহাপ্রভু বলেছেন, নাম আর নামীতে কোনো ভেদ নেই। যেখানে তাঁর নাম উচ্চারিত হয় সেখানে তৎক্ষণাৎ তাঁর আবির্ভাব হয়। বলেছেন, কলিযুগে একমাত্র সাধনা কেবল হরিনাম—কেবল হরিনাম। অন্য কোনো গতি নেই—অন্য কোনো গতি নেই।

নামের মাহাত্ম্যসূচক এসব কথা হৃদয়ে গেঁথে রাখল বিষ্ণুপ্রিয়া। যেন মহামূল্য মুক্তাহার কণ্ঠে ধারণ করেছে সে, তাই তা দুলছে বক্ষতলে—হৃদয়ের কাছাকাছি।

এই নামের মালা কণ্ঠে নিয়েই তাকে জীবনের পথে চলে যেতে হবে। নামের সুরে সুর মিলিয়েই রচনা করতে হবে কান্নাহাসির রাগ-রাগিনী। উত্তাল তরঙ্গ-চঞ্চল ভবজলধি উত্তীর্ণ হতে হলে আশ্রয় করতে হবে এই নামেরই সুদৃঢ় ভেলা।

নামাসক্তির ফলে আপনা থেকেই নামের সব মহিমা প্রকাশিত হতে লাগল বিষ্ণুপ্রিয়ার হৃদয়ে।

তার নামগ্রহণই দান-যজ্ঞ, নামই শতজন্মাবধি বাসুদেব অর্চনার পুণ্যফল, নামই ধর্ম, নামই যোগ। বিভিন্ন শাস্ত্র-পুরাণে নামের যে-মাহাত্ম্য নানাভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, তা শাস্ত্রপাঠ না করেও বিষ্ণুপ্রিয়ার মনে স্ফুরিত হতে লাগল।

ভাগবতে রয়েছে পদানুকীর্তনে কর্মবন্ধন থেকে মুক্তি ঘটে—হয় মোক্ষপ্রাপ্তি। রজস্তম গুণের দ্বারা মন আর আবৃত হয় না।

পদ্মপুরাণে বলছে 'হরি' অক্ষরদুটি একবারমাত্র উচ্চারিত হলেই মোক্ষধামে গমনের পথ খুলে যায়।

গরুড়পুরাণে আছে, গোবিন্দ-কীর্তনেই লাভ করা যায় পরমজ্ঞান এবং পরমপদ।

প্রভাসখণ্ডে বলছে আরো আশ্চর্য কথা,—অবহেলা করেও যদি কৃষ্ণনাম একবারমাত্র গ্রহণ করা যায়, তাহলেও মানুষমাত্রই ভবসিন্ধু উত্তীর্ণ হতে পারে।

এই নামানুরক্তি অবলম্বন করেই সুরু হল বিষ্ণুপ্রিয়ার পরবর্তী বিস্ময়কর ভজন-সাধনা।

"যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্বং গোবিন্দ-বিরহেণ মে ॥"

—শিক্ষাষ্টক ॥ ৭

বার

যুগায়িত প্রতিটি নিমেষ, দুনয়ন বর্ষামেঘময়।
শূন্য মোর সমগ্র জগৎ গোবিন্দ-বিরহে মনে হয় ॥

নামজপে ভাববিভোর বিষ্ণুপ্রিয়া। ঈশান বহুক্ষণ ধরে দরজার বাইরে অপেক্ষা করে আছে। ব্যাঘাত ঘটাতে সাহস পায় নি তার তন্ময় সাধনায়।

তিন প্রহর বেলা প্রায় অতিক্রান্ত হলে নামজপে সাময়িক বিরতি দিয়ে চোখ খুলে তাকাল বিষ্ণুপ্রিয়া। সুযোগ বুঝে ঈশান কাছে এগিয়ে এলো। বলল—নীলাচল থেকে গৌরহরির সংবাদ নিয়ে এক ভক্ত এসেছেন। তিনি তোমার দর্শন চান।

: সংবাদ তুমি সব জেনে নাও। তোমার মুখ থেকেই আমি শুনব।

ঈশান বলল—তুমি যে কাউকে সহজে দেখা দিতে চাও না সেকথা আমি কি আর তাঁকে জানাই নি। কিন্তু তিনি বললেন যে এই বিশেষ সংবাদ তোমার কাছেই নাকি নিবেদন করা দরকার। গৌরহরির সেইরূপ অভিপ্রায়।

বিষ্ণুপ্রিয়া মনে মনে হাসল। এতদিন পরে কি বিশেষ বার্তা দিয়ে তিনি পাঠাতে পারেন দূত। মনে হল ভাগবতের কাহিনী। উদ্ধব এসেছিলেন কৃষ্ণের কাছ থেকে বার্তা নিয়ে বিরহিনী রাধিকার কাছে গোপীদের কাছে। বলেছিলেন, কৃষ্ণ তো সর্বত্র আছেন, ধ্যানযোগে তোমরা তাকে মনের মধ্যে পাবে।

গোপীগণ বলেছিল—মন থাকলে তো মনের মধ্যে তাঁর ধ্যান করব। মন তো আমাদের একটি মাত্রই ছিল। তা নিয়ে গেছে সেই মনচোর।

তেমনি কোনো বৃথা সান্ত্বনাবাণী নিয়ে নীলাচলের দূত আসে নি তো তার কাছে ?

বিষ্ণুপ্রিয়াকে নীরব দেখে ঈশান বলল—তাহলে কি নির্দেশ ভক্তের প্রতি ? বহুক্ষণ থেকে সে অপেক্ষা করছে। সামান্য প্রসাদ ছাড়া আর কিছুই গ্রহণ করে নি।

বিষ্ণুপ্রিয়া সম্মতি জানাল—বেশ, তাকে আমার সামনে নিয়ে এসো।

দ্বারের এপাশে ভক্তকে বসবার জন্য আসন দেওয়া হল, আর ওপাশে পাদুকা-সিংহাসনের কাছে পটাবৃতা দেবীর ন্যায় বসল বিষ্ণুপ্রিয়া। কাছাকাছি রইল ঈশান।

নীলাচলাগত ভক্ত শ্রদ্ধাভরে বিষ্ণুপ্রিয়াকে প্রণাম জানিয়ে বললেন—মা, আপনার কঠোর ভজনের কথা লোকমুখে প্রচারিত হয়ে নীলাচলে মহাপ্রভুর কানে গিয়ে পৌছেছে। শচীমাতার মৃত্যুসংবাদ পেয়ে ইতিপূর্বেই তিনি বিচলিত ছিলেন, আপনার কঠোরতার কথা শুনে মনে খুবই বেদনা পেয়েছেন।

ধীরকণ্ঠে বিষ্ণুপ্রিয়া বলল—জনশ্রুতি অনেক সময়ই অতিশয়োক্তি হয়ে থাকে। আমি আমার কর্তব্যই করছি। তার বেশি কিছু নয়।

ভক্ত বললেন—মা, প্রভু বলে পাঠিয়েছেন, শুধুমাত্র কৃষ্ণনামকীর্তনেই সকল অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। আপনার এত কঠোরতার কোনো প্রয়োজন নেই।

মনে মনে ভাবল বিষ্ণুপ্রিয়া—এ যে প্রায় দ্বিতীয় উদ্ধবের মতই কথা। আমার কঠোরতা কি সত্যই তাঁর বুকে বাজে, না কি এ শুধু দাসীকে পরীক্ষা।

মুখে বলল—সন্ন্যাসী হয়ে তিনি যে কঠোরতা পালন করছেন তার তুলনায় আমার কঠোরতা কিছুই নয়। বরং তাঁর চরণে নিবেদন করবেন তাঁর দাসীর এই প্রার্থনা—'যত কঠোরতা তিনি নিজে পালন করবেন তার চেয়ে বেশী কঠোরতা যেন তিনি আমাকে দেন।

চোখের জল মুছে উঠে দাঁড়াল ভক্ত। বিদায় নিয়ে যাবার সময় বলল—আপনার কথা তাঁর চরণে অবশ্য নিবেদন করব। আজকাল অধিকাংশ সময়ই তিনি গম্ভীরায় ভাব-বিভোর হয়ে থাকেন। কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে উন্মত্ত হয়ে ছুটে যান মন্দিরে—সমুদ্র জলে। মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে যান পথে-বিপথে। অন্তরঙ্গ ভক্তগণ অতি সতর্কভাবে তাঁর প্রতি সর্বদা দৃষ্টি রাখছে। মনে হয় যেন তাঁর মধ্যে তিনি আর নেই।

বিষ্ণুপ্রিয়া প্রণাম জানাল এই দিব্যভাবময় মূর্তিকে স্মরণ করে। সহসা যেন মনের মধ্যে প্রকাশিত হল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের আনন্দময় মূর্তি। সেই মূর্তি স্মিত হেসে বলল—প্রিয়া, এ দেহে তোমায়-আমায় এই শেষ ভাব-সম্মেলন।

মূর্তি মিলিয়ে গেল। বিষ্ণুপ্রিয়া অস্ফুট আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়ল চরণ-পাদুকার উপরে।

কিছুদিন পরেই নদীয়ায় এসে পৌছালো নিদারুণ সংবাদ। তিরোহিত হয়েছেন-গৌরাঙ্গ-মহাপ্রভু। সমস্ত নগরে নেমে এলো বিষাদের ছায়া। সকলেরই চক্ষে জলধারা—কণ্ঠে বুকভাঙ্গা হাহাকার। যারা ছিল শ্রীগৌরাঙ্গের প্রিয় পার্ষদ-সহচর তারা অপরিসীম বেদনা ভুলবার জন্য অহোরাত্র নামকীর্তনের আশ্রয় নিল। শচীর আঙ্গিনায় এসে ভিড় করল শোকার্ত মানুষের দল। বিষ্ণুপ্রিয়াকে দর্শন করে যেন এই হারানোর বেদনা কিছুটা ভুলে যেতে চায় তারা।

বহুকাল ধরে বিষ্ণুপ্রিয়া নিজেকে লোকচক্ষুর অন্তরালে রেখেছিল। আজ শত শত মানুষের বেদনার কাছে নিজের একান্ত বেদনাকে প্রাধান্য দিতে পারল না বিষ্ণুপ্রিয়া। অন্য সব অনুভূতি যেন তার লুপ্ত হয়ে গেছে, জেগে আছে শুধু এক করুণার অনুভূতি। তাই আজ সকলের পরিতৃপ্তির জন্য অসম্ভবকেও সম্ভব করল বিষ্ণুপ্রিয়া। একবার দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়ে দেখা দিল শোকার্ত জনতাকে। দীর্ঘকাল বাদে তারা দেখল বিষ্ণুপ্রিয়াকে। আর তাকে দেখে জল ভরে এল সকলের চোখে।

সেই সোনার প্রতিমাখানি আজ মলিন হয়ে গেছে। কৃষ্ণা-একাদশীর চন্দ্রকলার মত ক্ষীণ হয়ে গেছে দেহ। প্রলয়ের ঝড়ে আশ্রয়শাখাচ্যুত ভূলুন্ঠিত লতাকে কেউ যেন জোর করে তুলে ধরে রেখেছে।

নদীয়াবাসীর কণ্ঠে বিষ্ণুপ্রিয়ার জয়ধ্বনি হাহাকারের মত শোনালো। অর্ধদণ্ডের জন্য একবারমাত্র দেখা দিয়ে গৃহদ্বার রুদ্ধ করল বিষ্ণুপ্রিয়া। কাউকেই আর আসতে দিল না ভিতরে। এমন কি সবচেয়ে অন্তরঙ্গ সখী কাঞ্চনাকেও না।

স্বল্পালোকিত গৃহকোণে বসে বহুক্ষণ ধরে অবিরাম নাম জপ করে নিজেকে কিছুটা সংযত করল বিষ্ণুপ্রিয়া। তারপর প্রভুর পাদুকার সামনে নতজানু হয়ে ডুবে গেল একান্ত চিন্তার গভীর অতলে।

প্রভুর লীলাসাঙ্গ হবার সাথে সাথে তবে তো সাঙ্গ হল আমারও লীলা।

আর কেন বৃথা জীবনধারণ। লীলাময়ের অন্তর্ধান হলে কি প্রয়োজন আর লীলাসঙ্গিনীর। আমি তো তারই পূর্ণতম শক্তির ক্ষুদ্রতম অংশ, এবার তবে অংশ মিলিয়ে যাক্ পূর্ণের সাথে—অল্প মিলিয়ে যাক ভূমায়। তটিনী লীন হয়ে যাক মহাসাগরে।

স্মরণ করল দক্ষসুতা সতীর কথা। তারই মত আত্মজ্যোতির ধ্যানে দেহত্যাগের সঙ্কল্প করল বিষ্ণুপ্রিয়া। প্রয়াণ করতে চাইল সেই দিব্যলোকে যেখানে মর্ত্যের দুঃখগুলি ফুল হয়ে ফুটে ওঠে—এক একটি অশ্রুবিন্দু হয়ে যায় এক একটি মুক্তাবিন্দু। বেদনা যেখানে সুর হয়ে জাগে আশাবরী রাগনীতে। হৃদয়ের সমস্ত রক্তিম যন্ত্রণা যেখানে রক্তশতদল হয়ে তাঁর পায়ে স্থান পায়।

বিষ্ণুপ্রিয়ার হৃদয়ক্ষেত্রে সঙ্কল্পের যজ্ঞবেদীতে জ্বলে উঠল আত্মজ্যোতির কোমল শিখা। ধীরে ধীরে তা উজ্জ্বলতর হতে লাগল।

সহসা বিষ্ণুপ্রিয়া শুনতে পেল এক অতি পরিচিত মধুর বাণী, মহাপ্রভুর কণ্ঠস্বর—থামো প্রিয়া, একি করতে চলেছ। তোমার মধ্য দিয়ে আমার লীলা যে এখনো অনেক বাকী।

যেন স্বপ্নঘোরে বিষ্ণুপ্রিয়া কথা বলল—আর কেন প্রভু, আর কেন? তুমিহারা হয়ে আমি জগতের কি কাজে লাগব? সুরহারা সঙ্গীতের কি মূল্য আছে এ পৃথিবীতে—কি সার্থকতা আছে ছন্দহারা কবিতার, দৃষ্টিহারা নয়নের? কি হবে শিখাহীন মৃৎপ্রদীপে গৃহ সাজিয়ে?

: প্রিয়া, আমার সঙ্গীতে তুমিই যে সুর। সঙ্গীত শেষ হলেও জেগে থাকে তার সুরের অনুরণন। আমি ফুল, তুমি তার সুরভি। ফুল ঝরে গেলেও তার সুরভি মধুময় করে রাখে সমীরণকে। আমি যেখানে শেষ করেছি তোমার সুরু সেখান থেকেই।

: ভাল করে বুঝিয়ে দাও প্রভু, কি তোমার ইচ্ছা।

: শোনো প্রিয়া, তোমার জীবনের মধ্য দিয়েই ভাগবত-জীবনকে সাধারণ মানুষের গ্রহণযোগ্য করে তুলতে হবে। রাগময়ী ভক্তির আদর্শ যে শ্রীরাধা, তার অপ্রাকৃত জীবন প্রাকৃত মানুষের পক্ষে অনুকরণসাধ্য নয়। শ্রীরাধা যেন বহুদূর আকাশের অনির্বাণ তারকা, যে মাটির পৃথিবী থেকে শতলক্ষ যোজন ব্যবধানে। শুধু এসে পৌছায় তার আলোকের আভা। তাই তো শ্রীরাধার ভাব-কান্তি নিয়ে আমি এসেছিলাম, সেই সর্বসাধ্যসার অনুভবকে মানুষের আরো

কাছাকাছি এনে দেবার জন্যে। তবু থেকে গেছে বহু ব্যবধান। আমি অবলম্বন করেছি সন্ন্যাসজীবন, তাই আমার নামপ্রেমের মন্ত্র নির্বিচারে তাদের বিতরণ করলেও নিজেকে মিলিয়ে দিতে পারি নি তাদের জীবনধারার সঙ্গে। কারণ আমার সন্ন্যাসজীবন তো গার্হস্থ্যজীবনের পথপ্রদর্শক হতে পারে না।

তাই তোমাকে পৃথিবীর আরো প্রয়োজন। তুমি যে আমারই বিলাস-মূর্তি—রাধাশক্তিরই অপর প্রকাশ।

: প্রভু, তবে আরো কতদিন কিভাবে তোমার বিরহ-বেদনা বুকে নিয়ে আমায় বেঁচে থাকতে হবে ?

: মানুষের মঙ্গলের জন্যই নিবেদিত তোমার জীবন, যা আমার জীবনেরই পরিশিষ্ট আর নিত্যসিদ্ধ রাধাজীবনের ভজনসাধ্য সরল ভাবভাষ্য। তোমাকে রেখেছি গৃহজীবনে, যাতে গৃহবাসী অতি সাংসারিক মানুষও এপথে চলবার আশ্বাস পায়। তোমাকে করেছি সর্বহারা নিঃস্ব, যাতে এই পৃথিবীর দীনতম মানুষেরও মন ভরসা না হারায়।

নিজের জন্য প্রয়োজন না থাকলেও তোমাকে দেখাতে হবে ভজনের চরম আদর্শ, যাতে প্রতিটি মানুষ ভজনের অধিকার, ভজনের মূল্য অনুভব করতে পারে। তোমার জীবন হবে অতি অসাধারণ, অথচ সাধারণ জীবনের সম্পূর্ণ আয়ত্বের মধ্যে—সকলের অতি কাছাকাছি।

এই আন্তর-বাণী শুনতে শুনতে এক বেদনাময় মধুর আনন্দে পূর্ণ হতে লাগল বিষ্ণুপ্রিয়ার অন্তর। মনে মনে নিবেদন করল—যদি এই অনন্ত পরিকল্পনায় আমাকেও স্থান দিয়ে থাকো প্রভু, তবে ধন্য আমি—ধন্য আমার জীবন।

এ জীবন সম্পূর্ণ তোমারই। যেভাবে যতদিন খুশী একে নিয়ে তুমি খেলা কর।

খেলা যে এত শীঘ্র সুরু হবে ভাবতে পারেনি বিষ্ণুপ্রিয়া। পরদিন অতি প্রত্যুষে স্নানাহ্নিক সমাপন করে প্রভুর পাদুকার সামনে জপে বসেছে বিষ্ণুপ্রিয়া, এমন সময় হঠাৎ বংশীবদন এসে তার পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ল।

সদ্য স্নান করে এসেছে বংশী গঙ্গা থেকে। ললাটে তিলক-রেখা। বক্ষে বাহুতে নামচিহ্ন অঙ্কিত। চক্ষে জলধারা।

বিষ্ণুপ্রিয়া বিস্মিত হল। নামজপের সময় কেউ তাকে বিরক্ত করে না। আজ কি হল বংশীবদনের ?

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালো বিষ্ণুপ্রিয়া।

বংশীবদন বলল—আমায় আপনি মন্ত্রদীক্ষা দিন।

: কি বলছ তুমি বংশী! আমি ও-সবের কি জানি! তুমি বরং শান্তিপুরে অদ্বৈতপ্রভুর কাছে যাও।

: না মা, আপনিই আমার গুরু। আমি আদেশ পেয়েছি।

কিছুই বোধগম্য হচ্ছে না বিষ্ণুপ্রিয়ার।

কার আদেশ? কি আদেশ?

বংশীবদন উঠে বসল। চোখের জলে ভেসে বলতে লাগল—যখন মহাপ্রভুর চরণাশ্রয়ে ছিলাম, তখন একদিন তাঁর কাছে আমি দীক্ষামন্ত্র ভিক্ষা করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন, নাম-সাধন করে যাও—যথাকালে দীক্ষালাভ হবে। কিন্তু মহাপ্রভুর সহসা তিরোহিত হবার সংবাদ শুনে আমি বড় হতাশ হয়েছিলাম। কাল সারাদিন ধরে আমি এই ভেবে কেঁদেছি যে দীক্ষালাভ আমার ভাগ্যে আর হল না। কিন্তু—

কিন্তু কি বংশী?

একবার চোখের জল মুছে নিয়ে বংশীবদন বলল—কাল রাতে আমি স্বপ্নে মহাপ্রভুকে দেখলাম। পাশে দেখলাম আপনাকে—নামজপে মগ্ন। মহাপ্রভু যেন আমায় ডেকে বললেন, বংশী, সময় হয়েছে, এবার দীক্ষা নাও। বলেই তিনি আপনার হৃদয়ে মিলিয়ে গেলেন।

: কিন্তু বংশী, তবু আমার অধিকার নেই—

বংশীবদনের দুচোখ ছাপিয়ে আবার অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়তে লাগল। আকুল হয়ে সে বাধা দিল—ওকথা বলবেন না মা। আপনার মধ্য দিয়ে স্বয়ং মহাপ্রভুই যে দীক্ষা দেবেন।

তবে আর অধিকারের প্রশ্ন আসে না—আসে না যোগ্যতার প্রশ্ন। বিষ্ণুপ্রিয়া অনেকক্ষণ ধরে ভাবলেন নীরবে। প্রভুর অভিপ্রায় পূর্ণ করবার জন্যই তো তার জীবন-ধারণ।

আর এই যদি প্রভুর অভিপ্রায় তবে তার অন্যথা সে কেমন করে করবে?

মৃদুকণ্ঠে বললেন—বেশ, তবে এই পাদুকার সামনে তাঁর প্রতিনিধি হয়ে তাঁরই নামে আমি তোমায় দীক্ষা দেব। তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হবে। কিন্তু গোপন রেখো এ কথা।

বংশীবদনের মুখে এতক্ষণে হাসি ফুটল। সে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হয়ে বিষ্ণুপ্রিয়ার চরণে মাথা রাখল।

"যা গোকুলশ্রীঃ বৃষভানুপুত্রী যস্যাশ্চ সখ্যৌ ললিতাবিশাখে।
সা কৃষ্ণকান্তা স্বয়মাবিরাসীৎ বিষ্ণুপ্রিয়াসৌ ব্রজভক্তিরূপা ॥"
—শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াষ্টক ॥

তের

গোকুলের শোভা যিনি বৃষভানুসুতা
ললিতা-বিশাখা সখী স্বীয়া।
সেই কৃষ্ণকান্তা নিজে হলেন উদয়
ব্রজভক্তিরূপা বিষ্ণুপ্রিয়া ॥

বিষ্ণুপ্রিয়ার ভজন-কক্ষের দ্বার রুদ্ধ। যেন রুদ্ধ করে দিয়েছে বহিরিন্দ্রিয়ের দ্বার।

বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত কাউকে দর্শন দেয় না। দ্বার খোলে না তৃতীয় প্রহরের আগে। তারপর মধ্যাহ্নস্নান সেরে অতি সামান্য ভোগ দেয় প্রভুর প্রতীক-পাদুকার সামনে। ভোগরাগ সম্পন্ন হলে সকলের জন্য প্রসাদ রেখে অবশিষ্ট সামান্যতম কিছু নিজের মুখে তুলে দেয়। তাতেই কোনমতে হয় দেহরক্ষা।

ঈশানও বৃদ্ধ। জীর্ণ শরীর নিয়ে জীবনের সায়াহ্নে এসে পৌঁছেছে। বিষ্ণুপ্রিয়ার কঠোরতা দেখে সে চোখের জল ফেলে।

কেন এমন কঠোরতা? একি জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা, না জীবন-বিধাতার প্রতি অভিমান? ঈশান মনে মনে স্থির করে অন্ততঃ আমি যে-কটা দিন বেঁচে আছি কিছুতেই এমন চলতে দেব না। মাঝে মাঝে সে নিজেও উপবাসে থাকবে বলে ভয় দেখায়। তখন বাধ্য হয়ে সাময়িকভাবে আত্মসমর্পণ করে বিষ্ণুপ্রিয়া।

সেদিন সবকিছু সমাধা করে প্রসাদ পেতে পেতে প্রায় অপরাহ্ণ গড়িয়ে এলো। অর্ধমুষ্টি অন্ন নিয়ে সবে মুখে তুলতে যাচ্ছে, হঠাৎ অর্ধপথে হাত থেমে গেল বিষ্ণুপ্রিয়ার। উপবাস-ক্লিষ্ট কার কিশোর-মুখছবি যেন ভেসে উঠল মনের মধ্যে। যেন কার আকুল কান্নার সুর-তরঙ্গ এসে ধরা দিল অন্তরে। মনে হল সেই কান্নার সঙ্গে মিশে আছে গঙ্গার জল-কল্লোল। কে কাঁদে গঙ্গাতীরে বসে? কিসের বেদনা তার? বুঝি বা সারাদিন উপবাসী সে।

এক কণা প্রসাদও মুখে তুলতে পারল না বিষ্ণুপ্রিয়া। সযত্নে সব রেখে দিয়ে অসময়ে এসে কক্ষের দ্বার খুলল। ছুটে এসে কাছে দাঁড়াল ঈশান। বিষ্ণুপ্রিয়া তাকে বলল—তুমি এখনি একবার গঙ্গার ঘাটে যাও। খুঁজে দেখ সেখানে বসে আছে কিনা কোনো দুঃখী-উপবাসী। জেনে এসো তার পরিচয়—সম্ভব হলে নিয়ে এসো সাথে করে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই গঙ্গার ঘাট থেকে ফিরে এলো ঈশান। বিস্মিতভাবে বলল—তুমি সত্যই বলেছ মা। কোথা থেকে এক অপরিচিত বালক এসে গঙ্গার ঘাটে বসে আছে কয়েকদিন ধরে। গৌরহরির নাম নিয়ে অনবরত কাঁদছে। অন্নজল কিছুই মুখে দেয় নি।

: তুমি তাকে সঙ্গে করে নিয়ে এলে না কেন?

: আসবার জন্য অনেক করে বললাম, কিন্তু সে কিছুতেই রাজি হল না। মা, তাকে দেখলেই মায়া হয়।

বিষ্ণুপ্রিয়ার মাতৃহৃদয় কেঁদে উঠল। কেন উপবাসী এই বালক? কি তার দুঃখ? তবে কি অন্নজল ত্যাগ করে সে আত্মবিসর্জনের সঙ্কল্প করেছে?

একথা মনে হতেই বিষ্ণুপ্রিয়া ব্যস্ত হয়ে উঠল। ঈশানকে বলল—আমায় তুমি সেখানে নিয়ে চল। আমি নিজে গিয়ে সবকিছু জেনে তাকে ডেকে আনব।

তার আগে রাত আর একটু এগিয়ে যাক্। নীরব হোক্ নবদ্বীপের পথঘাট। সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে বিষ্ণুপ্রিয়া তখন গঙ্গাতীরে গিয়ে মায়ের মত স্নেহে তাকে গৃহে ডেকে আনবে। এই উপবাসী বালকের মুখে প্রসাদ তুলে দিয়ে তবেই সে নিজে কিছু গ্রহণ করতে পারবে।

গঙ্গার ঘাট তখন জনশূন্য হয়ে এসেছে। জলের কাছাকাছি এক সোপান-পীঠে মুখ গুঁজে বসে আছে সেই অস্নাত অভুক্ত বালক। মাঝে মাঝে অব্যক্ত

ক্রন্দনবেগে তার দেহ স্পন্দিত হচ্ছে। বিষ্ণুপ্রিয়া কাছে গিয়ে দাঁড়াল। সস্নেহে হাত রাখল তার মাথায়।

বালক চমকে উঠে মাথা তুলে তাকাল আর এই অপ্রত্যাশিত দর্শনে বিস্মিত হয়ে তাকিয়েই থাকল কিছুক্ষণ। কে ইনি? তবে কি স্বয়ং গঙ্গাদেবী তার দুঃখে বিচলিত হয়ে সামনে এসে আবির্ভূত হলেন? অথবা কি পরম শান্তিদায়িনী নিদ্রা মাতৃরূপে এসে দাঁড়িয়েছে তার সামনে?

স্নেহ-কোমল স্বরে বিষ্ণুপ্রিয়া বলল—কে তুমি বাবা? কি তোমার দুঃখ?

সহানুভূতির স্পর্শে বালকের অনুপম দুটি নয়ন থেকে আবার অশ্রুধারা প্রবাহিত হল। অতিকষ্টে কয়েকটি কথামাত্র সে বলল—আমি শ্রীনিবাস। আমার মত হতভাগ্য আর এ সংসারে কেউ নেই।

বিষ্ণুপ্রিয়া বলল—তোমার সব কথা আমি শুনতে চাই। আমার সঙ্গে চল—আমি তোমায় নিয়ে যেতে এসেছি।

শ্রীনিবাস বলল—গঙ্গাতীর ছেড়ে আমি কোথাও যাব না

বিষ্ণুপ্রিয়া দেখল বালক তার সঙ্কল্পে অটল। সহজে তাকে সঙ্কল্পচ্যুত করা যাবে না। তাই বলল—তাহলে আমাকেও এখানে থাকতে হয় বাবা। আমার সঙ্গে এসে তুমি যতক্ষণ না প্রসাদ গ্রহণ করবে ততক্ষণ আমারও কিছু গ্রহণ করা হবে না।

শ্রীনিবাস একথায় যেন একটু বিচলিত হল। তথাপি আগ্রহশূন্য কণ্ঠে প্রশ্ন করল—আমাকে আপনার সঙ্গে কোথায় যেতে হবে?

বিষ্ণুপ্রিয়া ঈষৎ হেসে বলল—মহাপ্রভুর গৃহে।

মহাপ্রভুর নাম উচ্চারিত হওয়া মাত্র শ্রীনিবাস অকস্মাৎ উঠে দাঁড়াল। বিষ্ণুপ্রিয়ার দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল—কে আপনি?

: আমি তাঁর সেবিকা।

ঈশান এতক্ষণ কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে দাঁড়িয়েছিল। এবার এগিয়ে এসে বলল—বালক, কে বলে তুমি হতভাগ্য। তোমার সামনে গৌরজায়া বিষ্ণুপ্রিয়া স্বয়ং দাঁড়িয়ে আছেন।

শ্রীনিবাস অস্ফুট কণ্ঠে কি যেন বলবার চেষ্টা করল। পরক্ষণেই ছিন্ন তরুশাখার মত বিষ্ণুপ্রিয়ার চরণতলে লুটিয়ে পড়ল।

বাড়ি ফিরে শ্রীনিবাসের সেবাযত্নের ভার বংশীর হাতে সঁপে দিয়ে বিষ্ণুপ্রিয়া ভজন-কক্ষে গিয়ে দ্বার রুদ্ধ করল। সে রাতে আর তার দর্শন পাওয়া গেল না।

আপন কক্ষের মধ্যে একান্তে বসে বসে বিষ্ণুপ্রিয়ার মনে নানা বিচার শুরু হল। কেন তার মন এই কিশোরের প্রতি স্নেহে পরিপূর্ণ হচ্ছে? তার মাতৃহৃদয়ের কাছে বাৎসল্যরসের এই আকর্ষণ উপস্থিত করে প্রভু কি তাকে নূতন করে পরীক্ষা করছেন?

বংশীর মুখে বিষ্ণুপ্রিয়া শুনল, গঙ্গার ঘাটে কদিন ধরে এই অপূর্বদর্শন ব্রাহ্মণ বালককে দেখে ভক্তবৈষ্ণবেরা নাকি নানা কথা প্রচার করছে। কেউ কেউ বলছে শ্রীনিবাস মহাপ্রভুর দ্বিতীয় কলেবরস্বরূপ। কেউ বা বলছে এ বালক মহাপ্রভুর প্রকাশমূর্তি। কিন্তু না, প্রভুর অদৃশ্য সত্বা আমার এই হৃদয়াকাশই আছন্ন প্লাবিত করে জেগে রয়েছে। বাইরে অন্য কোথাও আমি আর তাঁকে খুঁজব না।

তবু, তার আগে এই বালকের দুঃখের কাহিনী আমায় শুনতে হবে—জানতে হবে সব কথা। তারপর অবিচলিত চিত্তে তাকে পরিচালিত করতে হবে শ্রেয়লাভের পথে।

একমাত্র ভজন ছাড়া আর কোনো আকর্ষণ—আর কোনো অবলম্বন রাখব না আমি।

বিচিত্র কাহিনী শ্রীনিবাসের।

শৈশবকাল থেকেই মহাপ্রভুকে দর্শনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা ছিল শ্রীনিবাসের মনে। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সে আকাঙ্ক্ষা তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠেছিল। তারপর এক সময় মাতুলালয় যাজিগ্রাম থেকে পদব্রজে নীলাচল অভিমুখে যাত্রা করল—উদ্দেশ্য মহাপ্রভুকে দর্শন।

দীর্ঘ দুর্গম পথ অতিক্রম করে বহু আয়াসে যখন নীলাচলে গিয়ে উপস্থিত হল, তখন মহাপ্রভু অপ্রকট হয়েছেন। এ সংবাদে যেন বজ্রাহত হল শ্রীনিবাস, জীবনের সমস্ত আকর্ষণ যেন হারিয়ে ফেলল। ভাগ্যক্রমে মহাপ্রভুর একান্ত ভক্ত পণ্ডিত গদাধর গোস্বামীর আশ্রয় লাভ করল সে। স্থির করল পণ্ডিত গোস্বামীর কাছে ভাগবত পাঠ করে হৃদয়ের শোক প্রশমিত করবে।

কিন্তু এখানেও প্রতিবন্ধক। পণ্ডিত গোস্বামীর কাছে যে ভাগবতের পুঁথি

ছিল তা অশ্রুজলে সিক্ত হয়ে অনেক অক্ষর অস্পষ্ট হয়ে গেছে। গোস্বামীজী শ্রীনিবাসকে বললেন গৌড়ে ফিরে গিয়ে নূতন ভাগবতের পুঁথি সংগ্রহ করে আনতে।

গদাধরপণ্ডিত তখন অতিবৃদ্ধ আর গৌড়ে যাতায়াত দীর্ঘসময়সাপেক্ষ। ফিরে এসে আর তাঁকে দেখতে পাবে কি না, মনে মনে সন্দেহ ছিল শ্রীনিবাসের। তথাপি তাঁর আজ্ঞা শিরোধার্য করে বালক গৌড়যাত্রায় প্রস্তুত হল। যাত্রার পূর্বে পণ্ডিত গদাধর গোস্বামী শ্রীনিবাসের মুখে একটি সংবাদ পাঠালেন নবদ্বীপে গদাধর দাসকে জানাবার জন্যে।

গৌড়ে এসে নূতন ভাগবত পুঁথি সংগ্রহ করে আবার নীলাচল অভিমুখে যাত্রা করল শ্রীনিবাস। কিন্তু কিছুপথ অগ্রসর হয়েই সংবাদ পেল পণ্ডিত গোস্বামী দেহরক্ষা করেছেন। শোকাহত বিমূঢ় বালক আবার ফিরে এলো নবদ্বীপে। একে তো মহাপ্রভুর অদর্শনজনিত বেদনা, তারপর আবার দীর্ঘ-পথযাত্রার ক্লান্তির উপর এই দুঃসংবাদ—এই অপরিসীম হতাশা। সব কিছু মিলে শ্রীনিবাস বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল। পণ্ডিত গোস্বামীর প্রেরিত সংবাদের কথা তার আর মনে রইল না।

নবদ্বীপে সহসা একদিন গদাধর দাসের সঙ্গে সাক্ষাত হতেই সংবাদের কথা তার মনে পড়ল। সে লজ্জিত হল। নিজের ভুল স্বীকার করে সংবাদটি নিবেদন করল গদাধর দাসের কাছে।

কিন্তু তখন অনেক বিলম্ব হয়ে গেছে। পণ্ডিতগোস্বামী শ্রীনিবাসের মুখে ইঙ্গিতে জানিয়েছিলেন তাঁর দেহত্যাগের সংবাদ—গদাধরদাসের সঙ্গে শেষ সাক্ষাতের অভিপ্রায় জড়িত ছিল তাতে। এখন আর কোনো উপায় নেই।

গভীর শোকে ক্ষুব্ধ হলেন গদাধর দাস। বালকের এই বিভ্রান্তি তিনি সহ্য করতে পারলেন না। ক্রুদ্ধ স্বরে বললেন—যাও আমার সামনে থেকে। তোমার মুখ আর দর্শন করতে চাই না।

শ্রীনিবাস জানত বৈষ্ণবের প্রতি অপরাধ বড় ভয়ঙ্কর অপরাধ। তাই গঙ্গাতীরে অনাহারে প্রাণবিসর্জনের সঙ্কল্প করে বসেছিল শ্রীনিবাস।

তারপর বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর সাথে সে রাতে তার সাক্ষাত।

পরদিন প্রভাতে সব কথা শুনে সহানুভূতিতে বিষ্ণুপ্রিয়ার মন ভরে গেল। স্নেহনেত্রে একবার ভাল করে তাকালো তার দিকে। সত্যই যেন মহাপ্রভুর কৈশোরকাল আবার রূপ ধারণ করেছে।

শ্রীনিবাস তার কাহিনী শেষ করে বলল—বৈষ্ণব-অপরাধের এই বোঝা মাথায় নিয়ে আমি আর বেঁচে থাকতে চাই না।

বিষ্ণুপ্রিয়া তাকে অভয় দিয়ে বলল—কোনো চিন্তা নেই। এর উপায় আমি করব। তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে স্নানাহার কর।

গদাধর দাসকে ডেকে পাঠাল বিষ্ণুপ্রিয়া। তাকে জানাল—এই বালক শ্রীনিবাস আমার আশ্রিত। দুঃখ-শোক-ক্লান্তিতে অভিভূত হয়ে অপরাধ করে ফেলেছে। এর সমস্ত অপরাধ আমি গ্রহণ করেছি।

অতি বিনীতভাবে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে বন্দনা করে গদাধর দাস বলল—ওকথা বলে আমায় অপরাধী করবেন না। আপনার ইচ্ছাই আমার পক্ষে মহাপ্রভুর আদেশ। বিশেষতঃ প্রিয়াজীর আশীর্বাদ যে লাভ করেছে সে আমার পরম আদরের পাত্র।

শ্রীনিবাসকে আলিঙ্গন করল গদাধর দাস। দুজনারই চোখে অনর্গল জলধারা।

শ্রীনিবাসের প্রতি আমার কর্তব্য শেষ হয়ে গেছে। মনকে আর জড়াতে দেবো না কোনো বন্ধনে। যদি তা সাত্ত্বিক বন্ধনও হয়, তবুও না। সমস্ত দিন গভীর ভজনে মগ্ন রইল বিষ্ণুপ্রিয়া। গৌরাঙ্গসুন্দরের কাছে নির্দেশ প্রার্থনা করল।

পরদিন বিষ্ণুপ্রিয়াকে দর্শন করে শ্রীনিবাস করজোড়ে বলল—এখন আমার প্রতি মাতার কি আদেশ?

বিষ্ণুপ্রিয়া বলল—তুমি বৃন্দাবনে যাও। সেখানেই গুরুকৃপা লাভ হবে তোমার। পূর্ণ হবে মনের সব আকাঙ্ক্ষা।

শ্রীনিবাস বলল—মহাপ্রভুকে দর্শন করতে না পেরে আমার মনে বড় খেদ ছিল। কিন্তু আপনার অযাচিত দর্শনে আমার সে খেদ মিটে গেছে। আর একটিমাত্র প্রার্থনা আছে। আপনার পবিত্র পদধূলি।

বিষ্ণুপ্রিয়া মুহূর্তকাল চিন্তা করল। তারপর কখনো যা করেনি সেই আশ্চর্য কাজ করল। শ্রীনিবাসের অবনত মস্তকে তার পদাঙ্গুলির পবিত্র স্পর্শ রাখল। সমস্ত বিষাদ-সন্দেহ-ভ্রান্তি দূর হয়ে গেল শ্রীনিবাসের মন থেকে।

মাতৃশক্তিতে শক্তিমান হয়ে সে ভবিষ্যৎ কর্মযজ্ঞের সাধনায় যাত্রা করল বৃন্দাবনের পথে।

শ্রীনিবাসের প্রতি বিষ্ণুপ্রিয়ার এই অসামান্য কৃপার কথা ছড়িয়ে পড়ল সমগ্র নবদ্বীপে। যাঁর অনুগ্রহে বৈষ্ণব-অপরাধ থেকে মুক্ত হয়ে শ্রীনিবাস আবার নূতন জীবন ফিরে পেল তাঁর মহিমা স্মরণ করে সকলেই প্রণাম জানাল মনে মনে।

শত-সহস্র মানুষের অসীম শ্রদ্ধা লাভ করে বিষ্ণুপ্রিয়া আজ দেবীপদে অভিষিক্ত হলেন।

প্রভুর বিচ্ছেদে নিদ্রা তেজিল নেত্রেতে।
কদাচিত নিদ্রা হৈলে শয়ন ভূমিতে॥
কনক জিনিয়া অঙ্গ—সে অতি মলিন।
কৃষ্ণ চতুর্দশীর শরীর প্রায় ক্ষীণ॥

—ভক্তিরত্নাকর॥ ৪র্থ তরঙ্গ॥

চৌদ্দ

এতদিন গৌরনাম ছিল জীবন-সাধনের উপায়, এবার তাকে প্রাণ-ধারণের উপায় করে তুলতে হবে।

এমন ভাবে নামকে যুক্ত করতে হবে জীবনের সঙ্গে, যাতে বেঁচে থাকবার জন্যেই নাম হয় একান্ত অপরিহার্য। প্রাণধারণ যেন হয়ে ওঠে নামগ্রহণেরই নামান্তর। নামময় জীবন যেন জীবনময় নামের মধ্য দিয়ে প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে।

উপায় ভাবতে লাগলেন বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী।

মহাপ্রভুর তিরোধানের পর থেকেই অতি সুকঠোর জীবনযাপন করে চলেছেন বিষ্ণুপ্রিয়া। তার কঠোরতা দেখে বহু অনুনয় করেছে ঈশান, ফেলেছে অনেক চোখের জল। তাতে যখন কোনো ফল হয় নি তখন সংবাদ তুলেছে শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্যের কানে। অদ্বৈতাচার্য তার পুত্রপ্রতিম সেবক ঈশান নাগরকে পাঠালেন স্বচক্ষে সব দেখে প্রকৃত সংবাদ নিয়ে আসার জন্য।

নবদ্বীপে এলেন ঈশান নাগর। কিন্তু কেমন করে পাবেন বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর দর্শন। অনুমতি ছাড়া কারু অধিকার নেই অন্তঃপুর-প্রবেশের। বহু চেষ্টায়

অদ্বৈতপ্রভুর নাম করে অবশেষে তিনি কয়েকজন অন্তরঙ্গ ভক্তের সঙ্গে অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন।

সামনে তাকিয়ে দেখলেন এক অভাবিত দৃশ্য। বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী বসে আছেন, যেন মনোলীনা প্রতিমা। সর্বাঙ্গ আচ্ছাদিত মলিন জীর্ণ বস্ত্রে। বস্ত্রের ফাঁকে দেখা যাচ্ছে শুধুমাত্র রক্তিমাভ চরণ দুখানি। যেন সূর্যাস্তশেষের ম্লান কমল। তথাপি আশীর্বাদী কুসুমের মতই ললাটে বক্ষে স্পর্শের যোগ্য।

নিজেকে কৃতার্থ মনে হল এই দুর্লভ দর্শনে।

কিন্তু প্রভু অদ্বৈত যে-সংবাদ জানবার জন্য তাঁকে পাঠিয়েছেন সে-সংবাদ পাবেন কার কাছে ? বংশীবদন বলে দিল দেবীর সখী কাঞ্চনার কথা। একমাত্র সেই জানে বিষ্ণুপ্রিয়াজীর একান্ত ভজনের অনেক রহস্য।

কাঞ্চনার কাছে সেই কঠোর ভজনের বিবরণ শুনলেন ঈশান নাগর। শুনে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেলেন।

অতি প্রত্যুষে প্রাতঃস্নানাদি সেরে নামজপে বসেন প্রিয়াজী। এক একবার নামজপের সঙ্গে সঙ্গে একটি করে তণ্ডুল রাখেন পার্শ্বস্থ পাত্রে। এমনি ভাবে তিন প্রহর পর্যন্ত চলে অবিচ্ছিন্ন নামজপ। নামসংখ্যা অনুযায়ী যে কয়েক মুষ্টি তণ্ডুল সঞ্চিত হয় পাত্রে, তাই দিয়ে তিন প্রহরের পর প্রভুকে ভোগ নিবেদন করেন তিনি। ভোগশেষে সকলের জন্য প্রসাদ রেখে অবশিষ্ট সামান্য মাত্র গ্রহণ করেন প্রিয়াজী। উপকরণহীন লবণহীন সেই মুষ্টিমাত্র অন্নে কেমন করে দেহরক্ষা হয় তা প্রভুই জানেন।

শুনতে শুনতে হাহাকার করে উঠল ঈশান নাগরের হৃদয়। অতি বিষণ্ণ দুঃখিত মনে তিনি শান্তিপুরে ফিরে গেলেন অদ্বৈত প্রভুকে সব সংবাদ জ্ঞাপন করবার জন্যে।

অদ্বৈতাচার্য এ সংবাদে একদিকে আনন্দিত হলেন, অন্যদিকে দুঃখিত হলেন ততোধিক। আনন্দিত হলেন বিষ্ণুপ্রিয়ার ভজন-নিষ্ঠায়, আর দুঃখিত হলেন তাঁর এই সুকঠোর আত্মনিপীড়নে। তিনি তো জানেন বিষ্ণুপ্রিয়ার অলৌকিক শক্তির উৎস কোথায়, তথাপি লৌকিক মন যে মানে না।

পত্নী সীতাদেবীকে সব বিবরণ জানিয়ে তিনি বললেন—শচীদেবী বর্তমান নেই, কে আর বাধা দেবে তাকে। এখন তুমিই তার মাতৃস্থানীয়া। যদি তুমি একবার তাকে অনুরোধ করতে পার হয়তো কিছু ফল হতে পারে।

কয়েকদিনের মধ্যেই বিষ্ণুপ্রিয়ার কাছে সংবাদ এলো সীতাদেবী তার সঙ্গে সাক্ষাতে অভিলাষী। বৈষ্ণব সমাজে অতি শ্রদ্ধেয়া তিনি। বিষ্ণুপ্রিয়া সানন্দে সাক্ষাত করতে সম্মত হলেন।

বহিরাঙ্গন পার হয়ে অন্তঃপুরের দিকে চলেছেন সীতাদেবী। শ্রদ্ধা যেন চলেছে বাহির থেকে অন্তরপানে। পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে বৃদ্ধ ঈশান। যেন বিনীত বুদ্ধি নির্দেশ করে দিচ্ছে শ্রদ্ধার পথ।

অন্তঃপুরে বিষ্ণুপ্রিয়ার ভজন-মন্দিরের বহির্দ্বারে বসে আছে কাঞ্চনা ও অমিতা। যেন সেবা ও প্রণতি। তারা ভজন-মন্দিরের দ্বার খুলে সীতাদেবীকে নিয়ে গেল অভ্যন্তরে। সেখানে অর্ধবাহ্যদশায় বসে আছেন প্রিয়াজী। অঞ্চল লুণ্ঠিত, কেশ বিস্রস্ত। চোখে জলধারা, মুখে মৃদুহাসি। যেন নাম-মালিকা কণ্ঠে ধারণ করে বসে আছে প্রেমভক্তি।

সীতাদেবী দর্শনমাত্রই আকুল হয়ে ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরলেন বিষ্ণুপ্রিয়াকে। শ্রদ্ধা এসে মিলিত হল প্রেমভক্তির সাথে। অন্তঃপুর পর্যন্ত পৌছে দিয়ে বিদায় নিয়েছে বুদ্ধি। পাশে দাঁড়িয়ে আছে এখন শুধু সেবা ও প্রণতি।

সীতাদেবী ভাল করে দেখলেন বিষ্ণুপ্রিয়াজীর ভজন-মন্দির। গৌরাঙ্গ-সুন্দরের শয়ন-কক্ষই এখন ভজন-মন্দিরে পরিণত হয়েছে। একদিকে সজ্জিত আছে শয়ন-পালঙ্ক—তার উপর বিন্যস্ত কোমল শয্যা। পালঙ্কের নিম্নে ভূমিতলই বিষ্ণুপ্রিয়ার শয়নস্থল। শয্যার পার্শ্বে সিংহাসনে স্থাপিত মহাপ্রভুর পাদুকাযুগল—বহুবিধ সেবাচিহ্ন বক্ষে ধারণ করে আছে। অপূর্ব সুগন্ধে সমস্ত কক্ষ পরিপূর্ণ।

এতক্ষণ পরে বাহ্যচেতনা লাভ করে বিষ্ণুপ্রিয়াজী সীতাদেবীকে প্রণাম করলেন। বললেন—বহু সৌভাগ্যে আজ আপনার চরণ-দর্শন করলাম।

সীতাদেবী বিষ্ণুপ্রিয়াকে আশীর্বাদ করে বললেন—শচীদেবী আজ নেই, কিন্তু আমি আছি। আমারও একান্ত স্নেহের পাত্রী তুমি মা। তাই আজ তোমার এ কঠোর যোগিনীব্রত দেখে আমার হৃদয় দুঃখে বিদীর্ণ হচ্ছে। দেহ-ই ভজনের সহায়, তাই একে রক্ষা করা উচিত।

বিনীতভাবে বিষ্ণুপ্রিয়া বললেন—আমার প্রতি আপনার কিরূপ আদেশ?

: তোমার দ্বারা নামের মহিমা ও ভজনের মাহাত্ম্য সর্বত্র প্রচারিত হবে। তাই জীবনের প্রতি অনাসক্ত হয়েও তোমাকে জীবন-মুখী হতে হবে। মা,

এত কৃচ্ছ্রতার কি প্রয়োজন? নাম-সংখ্যা তণ্ডুলের অতি সামান্ত প্রসাদে কি করে তোমার দেহরক্ষা হবে?

বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী নতমস্তকে বললেন—আমার প্রতি আপনার স্নেহের অন্ত নেই। তাই অকারণে শঙ্কিত হচ্ছেন। প্রভুর কৃপায় যে-নামামৃত আমি পান করে থাকি তাতে ক্ষুধা তৃষ্ণা সব দূর হয়ে যায়। মা, আমার মত সামান্যা নারী নামের মাহাত্ম্য কি করে প্রকাশ করবে। নাম তার আপন মহিমায়ই প্রকাশিত।

সীতাদেবী বললেন—মা, তুমি সামান্যা নও তোমার সুকঠোর জীবন-যাপনের কথা আজ নদীয়া ছাড়িয়ে শান্তিপুরেও গিয়ে পৌঁছেছে। তোমারি আদর্শের প্রেরণায় ঘরে ঘরে আজ জেগে উঠেছে ভজন-কীর্তনের সুর। স্বতন্ত্র ঈশ্বরী তুমি, তোমার ইচ্ছায় বাধা দেয় কার সাধ্য।

সীতাদেবীর এ কথার উত্তরে কিছু বলতে গিয়েই বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী যেন সহসা অর্ধবাহ্য দশায় উপনীত হলেন। আপন মনে অস্ফুট স্বরে কি যেন বলতে লাগলেন। দুনয়নে অবিরাম জলধারা। অভিজ্ঞা সীতাদেবী বুঝতে পারলেন এখনি বিষ্ণুপ্রিয়া ভাবমগ্না হয়ে অন্তর্দশা প্রাপ্ত হবেন। তাই তৎক্ষণাৎ ইঙ্গিতে পার্শ্বস্থ কাঞ্চনা ও অমিতাকে বললেন নামগান করতে। তারা মিলিতকণ্ঠে কীর্তন করতে লাগল—

"জয় শচীনন্দন জয় গৌরহরি
বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণধন নদীয়া-বিহারী।"

এই মনোহর ধ্বনি শুনে ধীরে ধীরে ভাবসংবরণ করলেন প্রিয়াজী। ফিরে এলেন আবার বাহ্যদশায়। তারপর একটি মৃদু দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে সীতাদেবীকে বললেন—আপনার স্নেহের উপদেশ আমি স্মরণ রাখব। কিন্তু জীবন অপেক্ষা ভজন অনেক বড়।

বিদায় নিয়ে যাবার আগে সীতাদেবী কাঞ্চনা ও অমিতাকে ডেকে বিশেষ একান্ত কথা তাদের কাছে বললেন। শ্রীমতী রাধার মধ্যে যে তিনটি ভাবাবস্থা হত, যা হত গৌরাঙ্গসুন্দরের জীবনে তা তিনি বিষ্ণুপ্রিয়ার মধ্যেও দেখতে পেয়েছেন। এ তিনটি প্রেমের অবস্থা হচ্ছে অন্তর্দশা, অর্ধবাহ্যদশা আর বাহ্যদশা। অন্তর্দশায় ভাবমগ্ন মন আরো গভীরে চলে যেতে চায়—যেতে চায় দেহসীমা অতিক্রম করে। তাই ইষ্টগোষ্ঠির প্রয়োজন, যারা তার মনকে বাহ্যদশায় ফিরিয়ে আনতে পারে। আর এই ফিরিয়ে আনার শ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে

প্রিয়প্রসঙ্গ আলোচনা—তাঁর লীলাকীর্তন। এমনি করে শ্রীরাধার মনকে বাহ্যজগতে ধরে রাখত ললিতা-বিশাখা। গম্ভীরায় মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ সঙ্গে রস-আস্বাদনও তাই। আর বিষ্ণুপ্রিয়ার এই ভজন গৃহ-ই তার গম্ভীরা। এখানে নিভৃত-ভজনে ক্রমেই বিষ্ণুপ্রিয়ার ভাবমগ্নতা এগিয়ে যাবে মহাভাবের দিকে।

তাই সীতাদেবী কাঞ্চনা ও অমিতাকে উপদেশ দিলেন সর্বদা প্রিয়াজীর কাছে কাছে থাকতে। গৌরাঙ্গকথা আলোচনা করে—গৌরাঙ্গ গুণগান করে তাঁর মনকে বাহ্যজগতে ধরে রাখতে।

প্রয়োজন হলে বহিরাঙ্গনে অষ্টপ্রহর নামসংকীর্তনের ব্যবস্থা করতেও তিনি উপদেশ দিলেন। নইলে জল স্বভাবতঃই মিলিয়ে যেতে চাইবে জলাধারে—জ্যোতি মিলিয়ে যেতে চাইবে জ্যোতিষ্কে—গৃহাকাশ মিলিয়ে যেতে চাইবে মহাকাশে।

কাঞ্চনা অমিতা সবই বুঝতে পারল। অনুমান করতে পারল প্রিয়াজীর লীলারহস্য। নিত্যসিদ্ধ রাধাভাবকেই আজ ভজনসাধ্য ভাবের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করছেন বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী। দীনতম মানুষের মনেও আশার সঞ্চার করছে তাঁর ভজনময় জীবন।

বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর জীবনে বিভিন্ন স্ববিরোধী ভাবের আশ্চর্য সমন্বয়—লীলাবৈচিত্র্যের অভূতপূর্ব প্রকাশ। রাগময়ী ভক্তির আধার হয়েও বৈধী ভক্তির সাধনায় আদর্শস্থল। সিদ্ধা হয়েও তাই সাধিকা।

আবার স্বকীয়া হয়েও পরকীয়া। নদীয়া-নাগর গৌরাঙ্গের পত্নীরূপে স্বকীয়া, অথচ সন্ন্যাসী শ্রীচৈতন্যের পক্ষে পরকীয়াতুল্য। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-অবতারের বিলাসমূর্তিরূপে তাঁর সঙ্গে নিত্যমিলন প্রিয়াজীর। আবার স্বামী-পরিত্যক্তারূপে তাঁর সঙ্গে অনন্ত বিরহ-বিচ্ছেদ।

আর এই পরম-রহস্য-লীলার সঙ্গে যুক্ত থেকে ধন্য কাঞ্চনা ও অমিতার জীবন।

সঙ্গীত-নিপুণা কাঞ্চনার ভাণ্ডারে আছে অনেক মহাজনপদগীতি—আছে অনেক ভজন-কীর্তন। সীতাদেবীর উপদেশ অনুযায়ী প্রিয়াজীর ঊর্ধ্বমুখী চেতনাকে বাহ্যজগতে ধরে রাখার পক্ষে এই সব ভজন-কীর্তনই একান্ত সহায়।

সঙ্গীত প্রবাহিত করবে যে অশ্রুধারা তারই পথ বেয়ে মন নেমে আসবে রোদনের বাহ্যদশায়।

আর এই রোদন-ই সর্বশ্রেষ্ঠ ভজন।

"উপরে চমকে শুদ্ধ সোনার বরণ।
দশ নখ দশ চন্দ্র প্রকাশে কিরণ॥
চরণের তল অরুণের পরকাশ।
মধুরিমা সীমা কিবা সুধার নির্যাস॥
—মনোহর দাস॥ অনুরাগবল্লী॥"

পনের

যোগিনী সাজিয়েও বুঝি আশা মেটে নি প্রভুর।
যোগিনীকে তিনি আজ মহাযোগিনী সাজাতে চান।

হেমন্তের রিক্ততাকে নিয়ে আসতে চান শীতের সর্বশূন্যতায়। ভাবকে নিয়ে আসতে চান মহাভাবে।

নিঃসঙ্গতা ক্রমে গভীর হয়ে আসছে বিষ্ণুপ্রিয়াজীর জীবনে। দীর্ঘ কালের অনন্য সেবক ঈশানও আজ আর নেই। শূন্য হয়ে গেছে গৌরাঙ্গ গৃহ। শূন্য হয়ে গেছে বাহির-প্রাঙ্গণ আর অন্তঃপুর-প্রাঙ্গণ। ঈশানের জন্য সকলেই অসহ শোকে মুহ্যমান। বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর বেদনা অন্তঃস্রোতা ফল্গুর মত। তবু অমিতা কাঞ্চনা সবই অনুভব করতে পারে। নিজেরাও তারা শোকের আঘাতে যেন বাক্যহারা।

সবচেয়ে বেশী আঘাত পেয়েছে বংশীবদন। তার দুচোখে অবিশ্রাম কান্না। কিন্তু সেবায় কোনো ত্রুটি নেই। বরং ঈশানের কাজগুলিও তাকেই হাতে তুলে নিতে হয়েছে।

অন্য সব দিনের মত তৃতীয় প্রহর নামজপের পরেও আজ আর ওঠেন নি বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী। জপের মালা নামেনি হাত থেকে। বসে আছেন একই

আসনে। উপাংশু জপে ওষ্ঠ কম্পিত হচ্ছে। কাঞ্চনার বহু অনুরোধে শুধু দুটি চরণতুলসী আর একটু জল গ্রহণ করেছেন তিনি।

রাত্রি যতই এগিয়ে যাচ্ছে ততই প্রিয়াজীর অন্তর আলোড়িত হচ্ছে। হৃদয়-সাগর মন্থিত হয়ে যেন একে একে জেগে উঠছে সব অতীত স্মৃতি। ঈশানের স্মৃতির সূত্র ধরে গৌরসুন্দরের সমস্ত জীবন-লীলা যেন ফুটে উঠছে অন্তরপটে। অমৃত-গরলে মেশানো সেই স্মৃতি-নির্যাস পান করে দেবী যেন আজ বিপ্রলম্ভ-প্রতিমা।

কাঞ্চনা প্রিয়াজীর অবস্থা বুঝতে পেরে তার মনকে বাহ্যজগতে ধরে রাখবার জন্যে খঞ্জনি বাজিয়ে শ্রীরাধাভাব কীর্তন করতে লাগল। প্রথমে গাইল আক্ষেপানুরাগের একটি পদ—

"তোমারে বুঝাই বঁধু তোমারে বুঝাই।
ডাকিয়া শুধাই মোরে হেন জন নাই॥"

কাঞ্চনার সুধাকণ্ঠের মধুস্বর যেন সুগন্ধ ধূপের মত ভজন-মন্দিরে ঘুরে বেড়াতে লাগল। প্রিয়াজীর নিমীলিত আঁখি বেয়ে নেমে এলো দুটি জলধারা।

তারপর কাঞ্চনা গাইল মাথুরের একটি পদ—

"হরি গেও মধুপুর হাম কুলবালা।
বিপথে পড়ল যৈছে মালতীর মালা॥"

এ গানে কাঞ্চনার সঙ্গে ধীরে ধীরে কণ্ঠ মিলালো অমিতা। অর্ধনিমীলিত চোখে প্রিয়াজী একটি মৃদু নিঃশ্বাস ফেললেন।

অবশেষে কাঞ্চনা গাইল—

"ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারী
ধৈরজ ধর চিত্তে মিলব মুরারী।"

'মিলব মুরারী' এই কথাটি বারবার ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে লাগল প্রিয়াজীর মনে। শ্রীরাধার প্রতি উচ্চারিত এই আশ্বাসবাণী যেন বহুযুগ পার হয়ে প্রিয়াজীর হৃদয়দ্বারে এসে আঘাত করল।

সত্যই তিনি এলেন। এলেন প্রিয়াজীর অর্ধনিদ্রাঘোরে। কি অপূর্ব সেই আবির্ভাব—সেই বাক্যহীন নিঃশব্দ বাণী!

চমকে উঠে বসলেন প্রিয়াজী। সেই মৃদু শব্দেই তন্দ্রা বিগত হল কাঞ্চনা ও অমিতার। সদা সতর্ক তারা। এসে বসল প্রিয়াজীর দুপাশে।

অতি মৃদু অর্ধস্ফুট স্বরে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী বললেন—আধতন্দ্রাঘোরে আমি কি দেখলাম সখি। তিনি এসেছিলেন। ওই পালঙ্কে বসে বললেন—

- বলতে বলতে আবেগে কণ্ঠ রুদ্ধ হল প্রিয়াজীর।

কাঞ্চনা প্রিয়াজীর কম্পিত করপল্লব সযত্নে হস্তে ধারণ করে প্রশ্ন করল—গৌরহরি কি বললেন সখি ?

: তিনি বললেন, আমি অর্চ্চা-বিগ্রহ অবলম্বন করে নদীয়ায় প্রকাশ হতে চাই। যে-নিমগাছের তলায় আমার জন্ম হয়েছিল তারই কাষ্ঠে আমার মূর্তি নির্মাণ করে প্রতিষ্ঠা কর। কিন্তু—একি শুধু স্বপ্নই, অথবা সত্যই প্রভুর নির্দেশ।

কাঞ্চনা বলল—বৃথা সন্দেহ ত্যাগ কর সখি। তমোগুণ বা রজোগুণজাত স্বপ্নই অলীক হয়ে থাকে। কিন্তু তোমার শুদ্ধ সাত্ত্বিক মনের কাছে মিথ্যা কখনো স্বপ্নের বেশ ধরে আসতে পারে না। এ স্বপ্ন নয়, দিব্য-দর্শন।

পরদিন প্রভাতেই প্রমাণ পাওয়া গেল, যে-বাণী প্রিয়াজী শুনেছেন তা অবচেতনার চিন্তাবাণী নয়, অধিচেতনার দৈববাণী।

বংশীবদন এসে কেঁদে লুটিয়ে পড়ল প্রিয়াজীর চরণে। সেও ঠিক ওই একই স্বপ্ন দেখেছে—পেয়েছে সেই একই নির্দেশ। আশ্চর্য কৃপা মহাপ্রভুর। বিষ্ণুপ্রিয়া আর বংশীবদনকে উপলক্ষ্য করে শোকাতুর মানুষের মনে শান্তিদানের জন্যই করুণাময়ের এ পরিকল্পনা।

বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী তাঁর সেবক-শিষ্য বংশীবদনের উপরেই মূর্তিনির্মাণ ও প্রতিষ্ঠার সমস্ত ভার অর্পণ করলেন।

নিজেকে ধন্য মনে করল বংশীবদন। মনে মনে প্রার্থনা জানাল প্রিয়াজীর কাছে—আমি তোমার হাতের পুতুল। তোমার ইচ্ছা অনুযায়ী আমাকে চালিত করে সব কিছু সুসম্পন্ন করিয়ে নাও।

মূর্তিনির্মাণ শেষ হয়ে গেল। কিন্তু অন্য কেউ দেখার আগে সর্বপ্রথম বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর অনুমোদন প্রয়োজন। মূর্তি নিয়ে আসা হল বাহির অঙ্গনে বংশীবদনের ভজনগৃহে। রাত্রিবেলা সখীদের সঙ্গে এসে মূর্তিদর্শন করবার জন্যে প্রস্তুত হলেন প্রিয়াজী। মনে পড়ল তার শ্রীমতী রাধার শ্যাম-অভিসারের কথা। ঠিক তেমনি করে তিনিও যেন আজ চলেছেন অভিসারে।

অভিনব তার অভিসার-সজ্জা। অর্ধজটাময় কেশভার যেন সর্পিল বেণীবন্ধন। ললাটের তিলকরেখা যেন মৃগমদচন্দনলেখা। কণ্ঠের তুলসীমাল্য

যেন হরিদ্রাভ মুক্তাহার। রাত্রির তিমির যেন তার কৃষ্ণাম্বরী—মনের গভীর অনুরাগ তাতে আরক্তিম প্রান্তরেখা। করলগ্ন জপমালা যেন লীলাকমল।

সখীদের কাঁধে দেহভার রক্ষা করে অতি ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে আসছেন প্রিয়াজী—অতিক্রম করছেন অন্তঃপুর-প্রাঙ্গণ। ললিতা-বিশাখার সঙ্গে যেন শ্রীমতী রাধা গোপন-অভিসারে চলেছেন লঘুপদসঞ্চারে, পাছে কৃষ্ণবিমুখ কারু ঘুম না ভেঙ্গে যায়।

যেতে যেতে কাঞ্চনা গুণগুণ স্বরে গান ধরল—

"ভাগে মিলয়ে হেন প্রেম-সঙ্গতি।
ভাগে মিলয়ে এহ সুখময় রাতি॥"

অন্তঃপুরদ্বার অতিক্রম করে বহিঃপ্রাঙ্গণ পার হয়ে বংশীর ভজন-গৃহে দারুমূর্তির সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন প্রিয়াজী। একপাশে জ্বলছে একটি ঘৃতদীপ। তার অস্পষ্ট আলোকে অপূর্ব রহস্যময় মনে হচ্ছে সে মূর্তি। ঊর্ধ্বোত্থিত দক্ষিণ হস্ত যেন অন্তরের পানে অঙ্গুলি-নির্দেশ করে ঈশ্বরের স্বরূপ-শক্তির ইঙ্গিত দিচ্ছে, আর বাম বাহু নিম্নপানে প্রসারিত হয়ে নির্দেশ করছে এ জগতের মায়াশক্তিকে। এ দুয়ের মাঝখানে অধিষ্ঠিত গৌরাঙ্গসুন্দর যেন তটস্থাশক্তির প্রকাশ জীবপ্রতীকরূপে নিজেকে বিজ্ঞাপিত করছেন। দেখাচ্ছেন ঈশ্বর ও জীবতত্ত্বে একই কালে ভেদ আছে, আবার অভেদও আছে। তাই এর নাম অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্ব।

মূর্তির হাস্যময় ওষ্ঠাধরের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর মনে হল যেন সে মুখে সত্যিকারের হাসি ফুটে উঠল। মূর্তির নির্বাক কণ্ঠ যেন সবাক হয়ে প্রিয়াজীর কানে কানে বলল—এই যে আমি এসেছি প্রিয়া।

কাঞ্চনাও এতক্ষণ নীরব-বিস্ময়ে তাকিয়েছিল সেই জীবিতকল্প দারুমূর্তির পানে। এখন প্রিয়াজীর ভাব বুঝে মৃদুকণ্ঠে গান ধরল—

"বহুদিন পরে বঁধুয়া এলে।
দেখা না হইত পরাণ গেলে॥"

প্রিয়াজীর চোখের সামনে কি এক আশ্চর্য দ্যুতি প্রকাশিত হল। লুটিয়ে পড়লেন তিনি গৌর-বিগ্রহের পদতলে। কাঞ্চনার কণ্ঠের মৃদু সঙ্গীত যেন হাহাকার হয়ে বলে উঠল—

"এতেক সহিল অবলা বলে।
ফাটিয়া যাইত পাষাণ হলে॥"

কিন্তু প্রিয়াজীর অচেতনকণ্ঠ যেন অশ্রুতস্বরে গেয়ে উঠল—

"সব দুখ আজি গেল হে দূরে।
হারানো রতন পেলাম কোরে॥"

ভক্ত-বৈষ্ণব-মহান্ত সকলকেই পত্র পাঠালো বংশীবদন। গৌরাঙ্গভবনে গৌরসুন্দরের দারুমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হবে—তারই নিমন্ত্রণ। হবে মহা-মহোৎসব—প্রসাদ-বিতরণ।

আমার আর কতটুকু সাধ্য। যার কাজ তিনিই করিয়ে নেবেন কেশে ধরে। এই ভাব মনে জাগিয়ে বংশীবদন এই দুষ্কর কাজে এগিয়ে গেল সেবাবুদ্ধি নিয়ে। অযাচিতভাবে বংশীর সহায়তায় অনেকেই পাশে এসে দাঁড়াল। একে একে সুসম্পন্ন হতে লাগল সব কাজ—মন্দির-সংস্কার, সিংহাসন-নির্মাণ, অষ্টপ্রহর নামকীর্তন, অধিবাস। তারপর বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা, শত শত মানুষকে প্রসাদ-বিতরণ—সবই নির্বিঘ্নে সমাপন হল।

ভজনমন্দিরে বসে সব অনুষ্ঠানই সারাদিন ধরে লক্ষ্য করলেন বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী। তারপর এক সময় প্রভুর আদেশ পেলেন হৃদয়ের মধ্যে—আজ এই সমবেত জনমণ্ডলীকে তুমি শেষবারের মত দর্শনদান কর। তারপর নির্জনে সুরু হবে তোমার নিঃসঙ্গ মহাযোগিনীর অনন্য ব্রত।

সখীদের তিনি জানালেন একথা। কিভাবে দর্শন দেবেন তাও বুঝিয়ে দিলেন। বংশীবদনের দ্বারা এ কথা প্রচারিত হল। আজ সকলেই প্রবেশাধিকার পেল অন্তঃপুর-প্রাঙ্গনে। ভজন-গৃহের উচ্চ বারান্দার উপর একটি বস্ত্র-মণ্ডপ নির্মিত হল। তার অন্তরালে সখীদের সঙ্গে বসলেন বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী। সমবেত জনতা বস্ত্রাচ্ছাদনীর মধ্যে উপবিষ্ট প্রিয়াজীকে অস্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল আর তাঁর নামে উচ্চ কণ্ঠে জয়ধ্বনি করে উঠছিল।

ভক্তগণ অনেকেই দেবীর চরণ-দর্শনের দাবী জানাচ্ছিল। তাদের ইচ্ছা পূর্ণ করবার জন্য সেবিকারা মাঝে মাঝে মণ্ডপ-আচ্ছাদনীর নিম্নস্থ বস্ত্র কিছুটা উচ্চে তুলে ধরছিল, আর তার ফাঁকে দেবীর কমল-বিনিন্দিত পবিত্র চরণ-যুগল দেখা যাচ্ছিল। অগণিত নরনারী ধন্য হচ্ছিল সেই চরণদর্শনে।

এমনি করে উৎসব-আনন্দের মধ্যে সমস্ত দিন কেটে গেল। ধীরে ধীরে

কমে যেতে লাগল জনতার ভিড়। সমস্ত দিন উপবাস করে আছেন প্রিয়াজী। এবার সখীরা অনুরোধ করলো একটু প্রসাদগ্রহণের জন্য। কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী সম্মত হলেন না। মন্দিরে গিয়ে নব প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ দর্শন না করে কিছুই গ্রহণ করবেন না তিনি।

কিন্তু বিগ্রহদর্শনে কখন যাবেন প্রিয়াজী ?

যখন সকলের দর্শন সমাপ্ত হবে—মন্দির-প্রাঙ্গণ হবে জনশূন্য তখনই নিভৃতে যাবেন তিনি। যতক্ষণ তা না হয় ততক্ষণ অপেক্ষা করে থাকবেন।

অনেক রাত্রি হল মন্দির-প্রাঙ্গণ জনশূন্য হতে। তারপর ভবনের বহির্দ্বার রুদ্ধ হলে প্রিয়াজী তার নামজপ স্থগিত রেখে উঠে দাঁড়ালেন। সখীদের সঙ্গে গৌরাঙ্গ-মন্দিরে এসে প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ দর্শন করলেন প্রাণভরে।

বিগ্রহের সেবা-পূজায় নিযুক্ত হয়েছেন প্রিয়াজীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা যাদবচন্দ্র। তিনি একগাছি প্রসাদী মালা এনে পরিয়ে দিলেন প্রিয়াজীর কণ্ঠে। প্রিয়াজীর মনে হল যেন আবার নূতন করে তাঁকে গ্রহণ করলেন গৌরসুন্দর। দুই চোখ তাঁর জলে ভরে এল।

ওগো মহা সন্ন্যাসী, আমিও যে আজ সন্ন্যাসিনী। তাই বুঝি সহজেই গ্রহণ করতে পারলে আমাকে। অথবা হে নদীয়া-নাগর, তুমি বুঝি ছদ্ম-সন্ন্যাসী, তাই আবার নদীয়ায় ফিরে এসে গ্রহণ করেছ আমায়।

আনন্দিত বেদনায় জ্ঞান হারিয়ে প্রিয়াজী লুটিয়ে পড়লেন অর্চ্চা-বিগ্রহের পদতলে।

সব আকাঙ্ক্ষা আশায় তোমার নামটি জ্বলুক শিখা,
সকল ভালোবাসায় তোমার নামটি রহুক লিখা।
সকল কাজের শেষে তোমার নামটি উঠুক ফলে,
রাখব কেঁদে হেসে তোমার নামটি বুকে কোলে।
জীবনপদ্মে সঙ্গোপনে রবে নামের মধু,
তোমায় দিব মরণ-ক্ষণে তোমারি নাম বঁধু॥

—রবীন্দ্রনাথ

ষোল

কিছুদিন পরেই ডাক এলো বংশীবদনের।

মনের মধ্যে সে যেন তার চির-আরাধ্য মহাপ্রভুর ডাক শুনতে পেল।

উভয়-সঙ্কটে পড়ল বংশীবদন। একদিকে মাতৃসমা বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী আর অন্যদিকে প্রভু ও পিতা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। একদিকে সেবা ও আত্মনিবেদন অন্যদিকে প্রার্থনা ও প্রেমভক্তি।

কাকে ছেড়ে কাকে গ্রহণ করবে সে ?

অবশেষে মনের মধ্যে কে যেন ধরিয়ে দিল সমাধানসূত্র। প্রিয়াজী তো গৌরাঙ্গসুন্দরেরই বিলাসমূর্তি। সুতরাং গৌরাঙ্গকে পেলেই উভয়কে পাওয়া যাবে চিরকাল—চিরযুগ ধরে।

তাই বংশীবদন সাড়া দিল মহাপ্রভুর আন্তর আহ্বানে।

বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর পদধূলি মাথায় নিয়ে বিষ্ণুপ্রিয়াবল্লভের পদযুগল ধ্যান করতে করতে মহাপ্রয়াণ করল সে। গুরু-প্রদর্শিত পথ ধরে যাত্রা করল ইষ্ট-সকাশে।

জীবনে পরম কর্তব্য সম্পন্ন করেছে বংশীবদন। নবদ্বীপে প্রকটিত করেছে গৌরাঙ্গসুন্দরের দিব্য বিগ্রহ। আকাশকে যেন এনে দিয়েছে ধরণীর বুকের

কাছে। আর কেন এখানে? কিসের আর প্রয়োজন? কি অভাব আর পূর্ণ হতে বাকী আছে?

চল এবার রূপলোক হতে রূপাতীত লোকে—ব্যক্ত-লীলা হতে গুপ্ত-লীলায়।

বংশীবদন বিদায় নেবার সাথে সাথে বন্ধ হয়ে গেল ভজন-প্রাঙ্গণের বহির্দ্বার। প্রিয়াজী ডুব দিলেন নাম-ভজনের নিঃসঙ্গ গভীরে—গম্ভীরায়। বিশেষ প্রিয়-পরিচিত ভক্ত বৈষ্ণবদের কাছেও প্রিয়াজীর দ্বার মানা। মাত্র দু-একজন চিহ্নিত ভক্তই বিশেষ প্রয়োজনে অন্তঃপুর প্রবেশের অনুমতি পেয়েছেন। ভজন-মন্দিরের দ্বারে বসে থাকে অমিতা ও কাঞ্চনা। তাদেরও সর্বদা ভিতরে প্রবেশের অধিকার নেই। শুধু বাইরের সংবাদ প্রয়োজনবোধে প্রিয়াজীর কাছে পৌঁছে দেয় তারা। ভজন-বিঘ্ন না ঘটিয়েও সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখে প্রিয়াজীর দিকে।

কঠোর থেকে কঠোরতর ভজনে আত্মনিয়োগ করছেন বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী। ষোলো নাম বত্রিশ অক্ষর জপ করে একটি মাত্র তণ্ডুল রক্ষা করেন। তৃতীয় প্রহর পর্যন্ত নাম জপে এখন আরো স্বল্প-সংখ্যক তণ্ডুল সঞ্চিত হয় পাত্রে। তারই প্রসাদ-অবশিষ্ট নামমাত্র গ্রহণ করেন প্রিয়াজী।

যে শোনে সে-ই বিস্ময়-বিমূঢ় হয়ে যায়। কি জানি কেমন করে দেহরক্ষা হয় দেবীর। বুঝি গৌরহরির নামামৃতপানেই জীবনধারণ করে আছেন তিনি।

এক একদিন নামজপ করতে করতে সময়চেতনা হারিয়ে ফেলেন প্রিয়াজী। সেদিন আর তণ্ডুলরক্ষা হয় না নিয়ম-অনুসারে—হয় না প্রসাদ-গ্রহণ। সখীরা গৌরাঙ্গমন্দির থেকে নিয়ে আসে চরণ-তুলসী আর প্রসাদ-কণিকা। বহু অনুনয়ে গঙ্গাজলসহ হয়তো কিঞ্চিৎ গ্রহণ করেন তিনি।

দেহমনপ্রাণে আজ নামময় বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী। নামই তার শয়ন-আসন। নামই অন্ন-পানীয়। নামই নিদ্রা-জাগরণ সুখদুঃখ হাসি-কান্না। নামই তাঁর জীবন-মরণ।

তবু নামের মর্যাদা বৃদ্ধি করবার জন্যেই নিরন্তর নামজপ করে চলেন তিনি। নামের শক্তিকে পূর্ণপ্রকাশিত করে তোলেন আপন জীবনে।

ষোলোনামযুক্ত মহামন্ত্রের প্রথম হরিনাম হরণ করে নিয়েছে তাঁর ভোগাসক্তি, প্রথম কৃষ্ণনাম তাঁকে আকর্ষিত করেছে গৌরানুরাগে। দ্বিতীয়

হরিনাম হরণ করে নিয়েছে তাঁর লজ্জা, ভয়, দ্বিতীয় কৃষ্ণনাম আকর্ষণ করে নিয়েছে গৌরসেবায়। তৃতীয় ও চতুর্থ কৃষ্ণনাম তাঁর মনকে আকর্ষণ করেছে গৌরনামে আর গৌরভজনে। তৃতীয় ও চতুর্থ হরিনাম হরণ করেছে যথাক্রমে তাঁর বাহ্যিক ও আন্তরিক ভজনবিঘ্ন। পঞ্চম হরিনামে হৃত হয়েছে তাঁর ক্ষুধা-তৃষ্ণা, প্রথম রামনামে লাভ হয়েছে প্রাণারামের দিব্যানুভব। ষষ্ঠ হরিনাম হরণ করে নিয়েছে তাঁর নিদ্রা-মোহ, দ্বিতীয় রাম নাম দিয়েছে তাঁকে চিত্তের বিরাম। তৃতীয় ও চতুর্থ রামনামের শক্তি তাঁকে অবিরাম আনন্দ দিয়ে করেছে আত্মারাম। শেষ দুটি হরিনাম নিঃশেষে হরণ করে নিয়েছে তাঁর দেহাসক্তি ও ভোগাসক্তি।

এমনি করেই নামশক্তি জাগ্রত হয়েছে প্রিয়াজীর ভজনপ্রভাবে।

তবু প্রিয়াজী এগিয়ে চলেছেন আরো আগে—আরো আগে। দৃশ্যমান পথ যেখানে শেষ হয়ে গেছে সেখানেও তিনি প্রস্তুত করে নিচ্ছেন অদৃশ্য পথ।

এরপর এক অসম্ভব পরীক্ষায় অগ্রসর হলেন বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী। বাইরের সঙ্গে সমস্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করবার জন্য অন্তঃপুরের চতুর্দিক উচ্চপ্রাচীরে বেষ্টিত করতে আদেশ দিলেন। বন্ধ করে দিলেন গমনাগমনের সমস্ত পথ। নদীয়াবাসী সকলেই বিস্ময়ে স্তব্ধ হলেন। এমন কঠিন জীবনধারণ মানুষের পক্ষে কি করে সম্ভব!

কিন্তু প্রত্যেকদিন অন্ততঃ একবার করে সংবাদ নিতে না পারলে কি করে নিশ্চিন্ত থাকে অন্তরঙ্গ ভক্তেরা—কি করে স্বস্তি পায় সখীরা। তাছাড়া প্রত্যহ স্নানপানের জন্য গঙ্গাজলও পৌছে দেওয়া প্রয়োজন অন্তঃপুরে। অথচ যতদিন প্রিয়াজী পুনরায় সম্মতি না দেবেন ততদিন খোলা যাবে না অন্তঃপুরের রুদ্ধদ্বার।

তাহলে উপায়?

শেষ পর্যন্ত বিশেষ অনুরোধে প্রিয়াজীর সম্মতি নিয়ে একটা উপায় উদ্ভাবন করল অমিতা-কাঞ্চনা। প্রস্তুত করা হল কাষ্ঠ-নির্মিত সিঁড়ি। নির্দিষ্ট সময়ে সেই সিঁড়ি প্রাচীরে সংলগ্ন করে অন্তঃপুরে প্রবেশ করত অমিতা আর কাঞ্চনা। ওই একই উপায়ে গঙ্গাজলপূর্ণ কলসী নিয়ে যাওয়া হত ভিতরে।

শুধুমাত্র অতি গুরুতর প্রয়োজনে কখনো কখনো সিঁড়ি বেয়ে অন্তঃপুরে যাবার অনুমতি পেতেন অতিবৃদ্ধ গদাধর দাস, শ্রীরাম পণ্ডিত, দামোদর পণ্ডিত কিম্বা শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী। অন্য সকলের কাছেই সম্পূর্ণ অনধিগম্য ছিল প্রাচীর-বেষ্টিত এই নির্জন নিবাস।

যেন এ জগতের মধ্যে থেকেও বিষ্ণুপ্রিয়াজী অন্য এক জগতের অধিবাসী। বহির্লোকে থেকেও অন্তর্লীন আপন মানসলোকে।

অলৌকিক ভজনপ্রভাবে প্রিয়াজীর জৈবদেহ যেন ধীরে ধীরে রূপান্তরিত হচ্ছে দৈব দেহে। মৃণ্ময়ী প্রতিমা যেন হয়ে যাচ্ছে চিন্ময়ী প্রতিমা। তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালে সসম্ভ্রমে মাথা নত হয়ে আসে কাঞ্চনা-অমিতার। আপনা থেকেই জিহ্বায় স্ফুরিত হয় গৌরবিষ্ণুপ্রিয়া নাম। অন্য সব কথা ভুল হয়ে যায়। সাধ যায় প্রিয়াজীর জ্যোতির্ময় চরণ-যুগল বক্ষে ধারণ করতে।

কাঞ্চনা একদিন নিবেদন করল—গৌরপ্রিয়া, আমায় আর তুমি সখী বলে ডেকো না। আমি তোমার দাসী হতে চাই।

স্নেহপূর্ণ নয়নে কাঞ্চনার দিকে তাকিয়ে প্রিয়াজী বললেন—কাঞ্চনা, আমরা সকলেই যে গৌরদাসী। তাই পরস্পর আমরা সখী ছাড়া আর কি ?

কাঞ্চনা বলল—তুমি যদি গৌরাঙ্গের দাসী হও আমি তবে তোমার দাসীরও দাসী হবার যোগ্য নই।

প্রিয়াজী ধীরে ধীরে বললেন—যে নিজেকে যত বেশী অযোগ্য মনে করে তার যোগ্যতা তত বেশী কাঞ্চনা। তারই সেবা সবচেয়ে আগে স্বীকার করেন প্রভু। আমি কিছুই জানিনে তাঁর সেবা—তাঁর ভজন। তোমরা আমায় দয়া করে শিখিয়ে দাও সখি।

বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর দিব্যদ্যুতিময় দুই চোখ থেকে জলধারা গড়িয়ে পড়তে লাগল। হাত থেকে খসে পড়ে গেল জপমালা। সহসা অন্তর্দশায় প্রবেশ করে তিনি মধুর হাসি হাসলেন।

অনির্বচনীয় প্রিয়াজীর সে মূর্তি। একাধারে হাসির সঙ্গে মেশানো কান্না—মিলনের সঙ্গে মেশানো বিরহ। যেন অতল বেদনার পাত্রে রাখা অতুল আনন্দ-মাধুরী।

সেই ভাব-প্রতিমার দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে নাম করতে লাগল সখীরা। জপের মালা ঘুরে যেতে লাগল করাঙ্গুলিতে। অপূর্ব সুগন্ধে ভজন-মন্দির পূর্ণ হল।

অমিতা-কাঞ্চনা অনুভব করল তারাও যেন ধীরে ধীরে তলিয়ে যাচ্ছে কোন্ এক অমিয়-সাগরে—আলোক-পারাবারে।

কাঞ্চনা আকুল হয়ে উচ্চকণ্ঠে বলে উঠল—না, গৌরপ্রিয়া, না—তোমার ওই অতল করুণা-সাগরে আমায় ডুবিয়ে দিও না। আমি তোমার সেবা করতে চাই। সেই চেতনাটুকু যেন আমার চিরকাল জেগে থাকে।

"সর্বসদ্‌গুণপূর্ণাং তাং বন্দে ফাল্গুন পূর্ণিমাম্।
যস্যাং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোঽবতীর্ণঃ কৃষ্ণনামভিঃ ॥"

—চৈতন্যচরিতামৃত ॥

সতের

সর্বগুণ পরিপূর্ণ ফাল্গুনের পূর্ণিমাকে
শ্রদ্ধায় বন্দনা করি মনে।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এসে হয়েছেন অবতীর্ণ
যার মাঝে কৃষ্ণনাম সনে ॥

ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথি।

রজত-শুভ্র জ্যোৎস্নাধারায় পরিপূর্ণ নিখিল ধরণী। সেই পূত ধারায় পরিস্নাত নদীয়ানগর—পরিপ্লাবিত গৌরভবন।

আজ গৌরাঙ্গমন্দিরে মহা আনন্দোৎসব। এই শুভ তিথিতেই শচীর আঙিনায় জন্ম নিয়েছিলেন শচীদুলাল। মর্ত্যের মাটিতে আবির্ভূত হয়েছিলেন স্বর্গের দেবতা। গঙ্গাতীর আচ্ছন্ন করে জেগে উঠেছিল সংকীর্তনের জয়ধ্বনি।

সেকথা স্মরণ করে নদীয়াবাসী আজ প্রভাত হতেই নাম সংকীর্তনে বিভোর হয়েছে। গৌরাঙ্গমন্দিরেও দলে দলে কীর্তনীয়া এসে গৌরগুণগানে প্রাঙ্গণ মুখরিত করে তুলছে। দূর-দূরান্ত থেকে এসেছে বহু ভক্ত-বৈষ্ণব-গোস্বামী। মৃদঙ্গধ্বনির সাথে সাথে জেগে উঠেছে সঙ্গীতরাগ—

"জয় শচীনন্দন জয় গৌরহরি।
বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণনাথ নদীয়া-বিহারী ॥"

সেই সমবেত সঙ্গীতের মধুর নাদ বহিঃপ্রাঙ্গণ অতিক্রম করে অন্তঃপুর-প্রাঙ্গণ

পার হয়ে ভজন-মন্দিরে এসে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর হৃদয় স্পর্শ করল। নামজপরত প্রিয়াজী সহসা চোখ মেলে যেন মুগ্ধ হয়ে গেলেন। চারিদিকে কি যেন এক সুধাধারা ক্ষরিত হচ্ছে। মধুময় মনে হচ্ছে সব কিছু। গৃহ, দ্বার, কুটীর, অঙ্গন সব যেন এক অলৌকিক জ্যোতিতে উদ্ভাসিত। দ্বারদেশে উপবিষ্ট অমিতা-কাঞ্চনা যেন ঘনীভূত আনন্দের প্রতিমা।

বাইরের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন প্রিয়াজী। আশ্চর্য! তাঁর দৃষ্টি আজ আর কোন বস্তুতেই প্রতিহত হচ্ছে না। গৃহ, প্রাচীর, প্রাঙ্গণ, প্রাকার সবকিছু ভেদ করে তাঁর অবারিত দৃষ্টি গিয়ে প্রবেশ করল গৌরাঙ্গমন্দিরের অভ্যন্তরে। স্বচ্ছ স্ফটিকের মধ্য দিয়ে যেন তিনি দেখতে পাচ্ছেন সমস্ত কিছু। গৌরসুন্দরের আরতি করছেন যাদব মিশ্র আর রুদ্ধদ্বার ভজন-মন্দিরে বসে পরিষ্কার তা দেখতে পাচ্ছেন প্রিয়াজী। পঞ্চপ্রদীপে আরতি শেষ করে এবারে যাদব মিশ্র ক্রমে শ্বেতচামর হাতে তুলে নিলেন। মন্দিরে জ্বলছে উজ্জ্বল ঘৃতদীপশিখা। পুড়ছে ধূপ-ধুনা-গুগ্‌গুল। অপরূপ পুষ্পালঙ্কারে সজ্জিত হয়েছে গৌরাঙ্গ-বিগ্রহ।

মন্দির অতিক্রম করে আরো দূরে দৃষ্টি পাঠিয়ে দিলেন বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী। গঙ্গাতীরে গঙ্গার ঘাটও স্পষ্ট দেখতে পেলেন। দেখতে পেলেন স্নানরত নর-নারী বালক-বালিকাদের—আহ্নিক-তর্পণরত ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবদের। দেখতে পেলেন সংকীর্তনরত ভক্তমণ্ডলীকে—শুনতে পেলেন তাদের প্রভাতী কীর্তন—

"উঠ গো নদীয়ানাথ রজনী পোহাল।
উঠ সখি গৌরপ্রিয়া প্রভাত হইল॥"

নদীয়াবাসী আজ গৌরাঙ্গকীর্তনে গৌরাঙ্গনামের পাশে আমার মত সামান্যার নামকেও স্থান দিয়েছে। এ বড় লজ্জার কথা। আমার মর্যাদা এমন করে কেন বাড়ালে প্রভু!

বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী গঙ্গাতীর থেকে আবার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে এলেন গৌরাঙ্গ-মন্দিরে গৌরচরণে। চরণ-কমল থেকে পিপাসু দৃষ্টি ক্রমে ক্রমে উর্ধ্বদিকে আরোহণ করতে লাগল। সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পার হয়ে অবশেষে এসে স্থির হল বদন-মণ্ডলে।

সহসা দারুমূর্তি যেন জীবন্ত হয়ে উঠল।

প্রিয়াজীর দিকে তাকিয়ে মধুর হেসে বলল—এসো প্রিয়া এসো, আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা করে আছি।

নিবিড় আনন্দ-পুলকে আঁখি নিমীলিত হল প্রিয়াজীর। আর সঙ্গে সঙ্গে

তাঁর কানে ভেসে এলো বহুদূরাগত অপূর্ব বংশীধ্বনি। ভাবনেত্রে প্রিয়াজী দেখতে পেলেন গৌরাঙ্গমন্দিরের দারুমূর্তি গৌরাঙ্গরূপেই বংশীধারণ করেছে। সেই মোহন-মুরলী মধুর অধরে তুলে নিয়ে তার রন্ধ্রে রন্ধ্রে জাগিয়ে তুলছে বিশ্ববিমোহন সুরলহরী। সেই সুর যেন অনুভবগম্য ভাষায় ডেকে বলছে—এসো এসো বিষ্ণুবল্লভা—এসো গৌরবল্লভা।

সেই অন্তরপ্লাবী পটমঞ্জরী রাগের পটভূমিকায় পরক্ষণেই জেগে উঠল প্রাঙ্গণের সুগম্ভীর কীর্তনধ্বনি—

"আজু কে গো মুরলী বাজায়।
এ তো কভু নহে শ্যামরায়॥
ইহার গৌরবরণে করে আলো।
চূড়াটি বাঁধিয়া কেবা দিল॥"

প্রেম-সমাধি-মগ্না প্রিয়াজীর ভাবদৃষ্ট মূর্তির সঙ্গে এই পদগীতির বর্ণনা অদ্ভুতভাবে মিলে গেল। যেন প্রিয়াজীর চোখদুটিও শুনতে পাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছে যেন কানদুটিও। দেখা আর শোনা একাকার হয়ে যাচ্ছে—

"ইহার রূপ দেখি নবীন আকৃতি।
নটবর বেশ পাইল কথি॥
বনমালা গলে দোলে ভাল।
এ না বেশ কোন্ দেশে ছিল॥"

কীর্তনের সুরতরঙ্গে তরঙ্গিত হতে হতে প্রিয়াজীর ভাবদৃষ্ট মূর্তি যেন আরো স্পষ্ট—আরো জীবন্ত হয়ে উঠছে। তেমনি নবীন আকৃতি নটবর বেশ—তেমনি গলায় দুলছে বনমালা। এ রূপের সঙ্গে যেন তাঁর যুগ-যুগান্তের পরিচয়। বংশীধ্বনি-অভিষিক্ত সেই কীর্তন-গানের সুর সমাপ্তির দিকে এগিয়ে এলো—

"চণ্ডীদাস মনে মনে হাসে।
এরূপ হইবে কোন্ দেশে॥"

ভাবঘোরে প্রিয়াজীও হাসলেন মনে মনে। তিনি আজ অন্তর্দশায় যে-রূপ দর্শন করেছেন সাধক-কবি চণ্ডীদাস তাঁর কল্পনা নেত্রে সে রূপ দর্শন করেছেন বহুবর্ষ আগে। রাধাশ্যামমিলিত-বিগ্রহ গৌর-সুন্দরের আবির্ভাবের পূর্বাভাস তিনি বুঝি প্রত্যক্ষ করছিলেন তাঁর ভক্তিপরিভাবিত হৃদয়-সরোজে।

সেই গৌরকৃষ্ণমূর্তি এবার কানে কানে কথা বলল—শ্রীমতী বিরহবিদ্ধা

আর তুমি বিষ্ণুপ্রিয়া নিত্যবিরহসিদ্ধা। ভক্তির কঠিনতম প্রকাশ পরমবিরহাসক্তির জীবন্ত প্রতিমা তুমি। রাধার যে-প্রেমের ঋণ শোধ করবার জন্য আমি শ্যামকান্তি ত্যাগ করে গৌরকান্তি ধারণ করেছিলাম, সে-ঋণ আমার আর শোধ হল না। তোমার কাছে থেকে গেল আরো—আরো বেশী ঋণ।

বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর চেতনার সম্মুখ থেকে যেন খসে গেল সমস্ত আবরণ।

তাঁরই অনন্তলীলার সঙ্গিনী আমি। তাঁর সঙ্গে সতত একাত্ম হয়ে আছি বলেই তাঁকে হারিয়ে আছি। তাই চিরমিলনের ক্রোড়ে শায়িত থেকেও বিরহস্বপ্নের এই পরম বিধুরতা।

প্রিয়াজীর নিস্পন্দ দেহ আনন্দ-অবগাহনে দিব্যজ্যোতির্ময়। পরমপ্রেমলোকের উৎস-সঙ্গমে এগিয়ে চলেছে বিরহ-তীর্থের বিদেহী আলোক-বিহঙ্গ।

টীকা

পরম প্রেম ঃ প্রথম পর্ব

১ম অধ্যায়— শ্রীমতী রাধার প্রসাধন-বর্ণনা দিয়ে সুরু হয়েছে। প্রকৃষ্ট সাধনই প্রসাধন। বাহ্যিক প্রসাধনই দেহসজ্জা আর অন্তর-প্রসাধনই সাধনা। বাহ্যিক প্রসাধন থেকেই কেমন করে অন্তর-সাধনায় পৌছানো যায় শ্রীমতীর মধ্য দিয়ে তাই দেখবার চেষ্টা হয়েছে।

যদিও বৈষ্ণবশাস্ত্র অনুসারে শ্রীমতী রাধার প্রেমকে বলা হয় রাগময়ী ভক্তি অর্থাৎ এই প্রেম বা ভক্তি নিত্যসিদ্ধ, তাই এতে সাধনা বা ক্রমবিকাশের স্থান নেই, কিন্তু রসবৈচিত্র্যের জন্ত কাব্যের দিক থেকে এর বিভিন্ন প্রকার স্তর দেখানো যেতে পারে।

বড়িমা—বড়মা বা বৃদ্ধ মা। মাতামহী বা পিতামহী-স্থানীয়া। অনেকে বলেন যোগমায়াই বৃন্দাবনে বড়িমারূপে আবির্ভূতা। বড়ুচণ্ডীদাসরচিত প্রাচীন 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' গ্রন্থে বড়িমার বিশেষ ভূমিকা আছে। প্রচলিত পালাকীর্তন প্রভৃতিতেও বড়িমার উল্লেখ আছে। এই গ্রন্থে শ্রীমতীর রাগময়ী ভক্তির বিপরীতে বৈধীশক্তির সাধিকা রূপে এঁকে উপস্থিত করা হয়েছে।

গর্গদেব—এঁর রচিত 'গর্গসংহিতা' গ্রন্থে রাধাকৃষ্ণের লীলাবিষয়ক বহু তত্ত্ব বর্ণিত আছে।

পদচিহ্ন—বৈষ্ণবশাস্ত্রে পূর্বরাগ পর্যায়ে নামশ্রবণ ও বংশীধ্বনিশ্রবণের বিষয় বলা হয়েছে। এই গ্রন্থে সর্বপ্রথমে পদচিহ্নশ্রবণের বিষয় কল্পিত হয়েছে।

২য় অধ্যায়— বংশীধ্বনিশ্রবণে শ্রীমতীর ভাবানুভূতি এই অংশে বর্ণনা করা হয়েছে। এই বংশীধ্বনি মহাজাগতিক অনাহত ধ্বনিরই নামান্তর, যার সূক্ষ্মতম সুর প্রথমে হৃদয়ে ধরা পড়ে তারপর কানে। জাগতিক সুর শ্রুতিগ্রাহ্য বলেই মহাজাগতিক সুরকে তা আচ্ছন্ন করতে পারে না। বংশীর আহ্বান পরম-প্রেমেরই আহ্বান।

৩য় অধ্যায়— বৈষ্ণব কাব্যে দেখা যায় যমুনাস্নানে গিয়ে শ্রীমতী রাধা শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করেছিলেন। কিন্তু এই গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণকে যথাসম্ভব অন্তরালে বা পশ্চাদপটেই রাখবার চেষ্টা করা হয়েছে। তাই সাক্ষাৎ দর্শন না দেখিয়ে যমুনাজলে ছায়া-দর্শন বর্ণিত হয়েছে। এই ছায়াতে শ্রীকৃষ্ণের ছবি বিশ্বছবির অঙ্গীভূত।

বক্ষোমণি—'লকেট'। বক্ষোমণি এখানে হৃদয়েরই প্রতীক।

৪র্থ অধ্যায়— পূর্বরাগের অন্তর্গত চিত্রদর্শন। তুলনীয়—

"হামসে অবলা হৃদয়ে অখলা ভালমন্দ নাহি জানি।
বিরলে বসিয়া পটেতে লিখিয়া বিশাখা দেখাল আনি। ॥"

—চণ্ডীদাস

৪র্থ অধ্যায়ের শেষদিকে নামশ্রবণ-প্রসঙ্গ বর্ণনা করা হয়েছে। কৃষ্‌ ধাতু আকর্ষণে। এই কৃষ্‌ ধাতু থেকেই কৃষ্ণ শব্দের উৎপত্তি, তাই এই নামে এত আকর্ষণ। কৃষ্ণ নামের প্রভাবে শ্রীমতী ধীরে ধীরে আত্মবিস্মৃতা হচ্ছে।

৫ম অধ্যায়— শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি যার হৃদয় স্পর্শ করে সে বিহ্বল হয়ে যায়, সাংসারিক কর্তব্য তার আর ভাল লাগে না। শ্রীমতীর রন্ধন-কার্যেও তাই বিশৃঙ্খলা ঘটছে। তুলনীয় 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনে'—

"আকুল শরীর মোর বে-আকুল মন।
বাঁশীর শবদেঁ মো আউলাইলো রান্ধন ॥"

অলৌকিক আনন্দের মধ্যে গভীর বেদনাবোধও মিশ্রিত

থাকে। তবু এই আনন্দের স্পর্শ একবার যে পেয়েছে সে আর এর অভাব সহ্য করতে পারে না। তাই শ্রীমতী থেমে-যাওয়া বাঁশীকে আবার বেজে উঠবার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছে।

আমার অন্তরাত্মাকে·········বেজে ওঠ—তুলনীয় :

"কত তীব্র তারে তোমার বীণা সাজাও হে।
শত ছিদ্র করে জীবন বাঁশী বাজাও যে॥" —"রবীন্দ্রনাথ।

৬ষ্ঠ অধ্যায়— ব্রজবাসীদের মধ্যে সেকালে পশুপতি-অম্বিকা পূজা বা কাত্যায়নীপূজা প্রভৃতি প্রচলিত ছিল। বৈষ্ণবের ইষ্ট শ্রীকৃষ্ণ হলেও তাঁরা শিব ও কৃষ্ণে অভেদ জ্ঞান করে থাকেন।

মানুষ ভগবানকে প্রত্যাখ্যান করলেও ভগবান তাকে ত্যাগ করেন না, বার বার তার কাছে নানাভাবে আসেন এবং একদিন না একদিন ভালবাসা দিয়েই তার মন জয় করেন শক্তি দিয়ে নয়। তুলনীয় :—

"I am able to love God because He gives me freedom to deny Him."—Tagore.

বাইরে দাঁড়িয়ে কে যেন·········দ্বার খোলো—তুলনীয় :

"খোলো খোলো দ্বার রাখিও না আর
বাহিরে আমায় দাঁড়ায়ে।" —রবীন্দ্রনাথ।

৭ম অধ্যায়— শ্রীমতী মহাভাবস্বরূপিনী এবং নিত্যসিদ্ধা হলেও প্রেমস্বরূপ কৃষ্ণের লীলা অনন্ত। তাই শ্রীমতী যেন তাঁকে চিনেও চিনতে পারছে না—জেনেও জানতে পারছে না। তিনি 'অখিলরসামৃতসিন্ধু'—রসমাধুর্য তাঁর অফুরন্ত। তিলে তিলে তা নূতন হয়। তুলনীয় :

"সোই পিরীতি অনুরাগ বাখানিতে তিলে তিলে নূতন হোয়"
—বিদ্যাপতি॥

অথবা, "মধুর তোমার শেষ যে না পাই
প্রহর হল শেষ।" —রবীন্দ্রনাথ

অনন্তকাল ধরে আমার আরাধিতা·········আরাধিকা—

রাধ্ ধাতু থেকে রাধা শব্দের উৎপত্তি। ভাগবত গ্রন্থে রাধার নাম উল্লেখ করা হয় নি, কিন্তু আরাধনার কথা বলা হয়েছে—"অনয়ারাধিতঃ নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।" ৭ম অধ্যায়ের মাঝামাঝি জায়গায় শ্রীমতী প্রেমস্বরূপকে প্রত্যক্ষভাবে জানবার জন্য অভিসার-যাত্রার সঙ্কল্প করেছে। এ অভিসার বহির্যাত্রা হলেও প্রকৃতপক্ষে মানস-যাত্রারই রূপান্তর, তাই দুর্গম। তুলনীয়ঃ

"ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।"

—কঠোপনিষদ॥

অভিসারের সাধনা অর্থাৎ প্রস্তুতির কথা বৈষ্ণব পদাবলীতেও বর্ণিত আছে। যথা—

গোবিন্দদাসের "কণ্টক গাড়ি কমলসম পদতল
মঞ্জির চীরহি ঝাঁপি।" ইত্যাদি পদ।

৮ম অধ্যায়— শ্রীমতীর অভিসার ও প্রিয়তমের সঙ্গে তার মানস-মিলন এ অধ্যায়ের বিষয়-বস্তু। বিভিন্ন সময়ের অভিসারকে বৈষ্ণবশাস্ত্রে বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়েছে। কৃষ্ণাতিথির অন্ধকার রাত্রিতে যে-অভিসার তাকে বলা হয় তিমিরাভিসার। অভিসার যেহেতু গোপন-যাত্রা তাই আত্মগোপন করবার জন্য সময়োচিত সাজ-সজ্জা প্রয়োজন হয়। এখানে সখিরা তাই শ্রীমতীকে বলছে শুভ্র সব কিছু ত্যাগ করতে।

'অভিসার' কথাটির তাৎপর্য শ্রীমতীর আত্মচিন্তার মধ্য দিয়ে প্রকাশের চেষ্টা করা হয়েছে। অভি+সৃ ধাতু থেকে অভিসার শব্দের উৎপত্তি অর্থাৎ অভিমুখে প্রসার বা প্রসরণ। কিসের অভিমুখে কিসের প্রসার তার কিছু ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যথাস্থানে।

অলৌকিক চেতনার যাত্রাপথে লৌকিক বস্তুর মায়ামোহ বাধা সৃষ্টি করে। তাই শ্রীমতীকে একে একে ত্যাগ করে যেতে হল তার অলঙ্কার উত্তরীয় প্রভৃতি। পরমপ্রেমের যাত্রাপথ একান্ত নিঃসঙ্গ, তাই সখীদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে

একাকী শ্রীমতী গিয়ে পৌঁছালো তার প্রিয়তমের কাছে—অনুভব-উপলব্ধির সীমানায়।

শ্রীমতীর মধ্যে যে-রাধাভাব ছিল নিত্যস্থায়ী, রস-বৈচিত্র্যের জন্য এখানে তার স্ফুরণ দেখানো হয়েছে।

৯ম অধ্যায়— পরমপ্রেমের দিব্যানুভূতি লাভ করলে জাগতিক কোনো বস্তুই আর স্পৃহণীয় বলে মনে হয় না। শ্রীমতী সেই লীলাই এখানে প্রকাশ করছেন। গীতায় বলেছে—"যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।" অর্থাৎ যা লাভ করলে অপর কোনো লাভই আর অধিক বলে মনে হয় না। নারদভক্তিসূত্রে বলা হয়েছে—"যল্লব্ধ্বা পুমান্ সিদ্ধো ভবতি, অমৃতো ভবতি, তৃপ্তো ভবতি।"

শ্রীমতী তার অনুভবের কথা প্রকাশ করতে পারছে না, কেননা, তা অনির্বচনীয়। তুলনীয় :

"যতো বাচঃ নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসাসহ"—উপনিষদ।

"অনির্বচনীয়ং প্রেমস্বরূপম্।"—নারদভক্তিসূত্র।

সাত্ত্বিক লক্ষণ—পরিপূর্ণ প্রেমভক্তির আবির্ভাবে আটটি সাত্ত্বিক লক্ষণ বা বিকার প্রকাশিত হয়। যথা—

"তে স্তম্ভ-স্বেদ-রোমাঞ্চাঃ স্বরভেদোহথ বেপথুঃ।
বৈবর্ণ্যমশ্রুপ্রলয় ইত্যষ্টৌ সাত্ত্বিকাঃ স্মৃতা॥"

—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু।

প্রিয়তমকে দেবার যোগ্য উপহার শ্রীমতী খুঁজে পাচ্ছে না। কেননা নিজেকে নিঃশেষে উৎসর্গ করে তবেই তো তাঁকে ধরা গেছে। তুলনীয় :

"আমায় যে সব দিতে হবে সে তো আমি জানি,
আমার যত বিত্ত প্রভু আমার যত বাণী
সব দিতে হবে।" —রবীন্দ্রনাথ।

১০ম অধ্যায়— বৈষ্ণবকাব্যে রাধা এবং কৃষ্ণ উভয়েরই অভিসার বর্ণিত হয়েছে। ভগবান প্রেমভিখারী হয়ে চিরদিনই রূপ-রস-শব্দ-

গন্ধরূপে আমাদের কাছে অভিসার করছেন। যখনি সে-সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ভক্ত তার দিকে এগিয়ে যায় তখনি তিনি সাক্ষাৎভাবে স্বরূপে অভিসারে আসেন।

প্রিয়তমকে অভ্যর্থনার আয়োজন কিভাবে করবে তা আনন্দ-বিহ্বল শ্রীমতী বুঝতে পারছে না। প্রতীক্ষা, দুঃসহ হয়ে উঠছে—এক মুহূর্ত এক যুগ বলে মনে হচ্ছে। রাধার প্রতীক্ষার চিত্র জয়দেব তাঁর 'গীতগোবিন্দ' কাব্যে বর্ণনা করেছেন রাধার সখির মুখে।

নয়নে যেন না নামে······জানতে পারবে না শ্রীমতী—মোহ-নিদ্রাচ্ছন্ন হৃদয় ভগবানের উপস্থিতি অনুভব করতে পারে না। তুলনীয় ঃ

"সে যে পাশে এসে বসেছিল তবু জাগিনি।
কি ঘুম তোরে পেয়েছিল হতভাগিনী?" —রবীন্দ্রনাথ।

অভিসারপথে প্রিয়তমের কষ্ট অনুভব করে শ্রীমতী ব্যথিত হচ্ছে। তুলনীয় ঃ

"এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা কেমনে আইল বাটে।
আঙ্গিনার মাঝে বঁধুয়া তিতিছে দেখিয়া পরাণ ফাটে॥"

অথবা—"পার হয়ে এসেছ মরু, নাই যে সেথায় ছায়াতরু—
পথের দুঃখ দিলেম তোমায় গো এমন ভাগ্যহত।"
—রবীন্দ্রনাথ।

রাধা অভিসারে গিয়ে যে-কষ্ট স্বীকার করেছিল তারই বিনিময়ে কৃষ্ণের এই দুঃখ-বরণ। কারণ—"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।"—গীতা। সব দুয়ার আপনা হতে খুলে গেল—তুলনীয় ঃ

"সকল দুয়ার আপনি খুলিল,
সকল প্রদীপ আপনি জ্বলিল,
সব বীণা বাজিল নব নব সুরে সুরে।"—রবীন্দ্রনাথ।

ভগবৎ-আবির্ভাবে সবকিছু মধুময় হয়ে যায়, ভক্ত স্বয়ং ও হয় মধুময়। ঋগ্‌বেদের 'মধুবাতা ঋতায়তে'···আদি মধুস্তোত্র স্মরণীয়। তাই শ্রীমতীও লীলায় আজ মধুমতী।

১১শ অধ্যায়— প্রকৃতির সঙ্গে শ্রীমতীর একাত্মতা বিভিন্ন ঋতুর মধ্য দিয়ে বর্ণিত হয়েছে। প্রতিটি ঋতুর মধ্যে সেই একই অন্তর্যামী ভগবানের মর্মসাধিকাকে রাধা গুরুরূপে উপলব্ধি করছে।

সে আছে সুদূর মানস-গঙ্গার পারে—তুলনীয় :

"সুন্দরী, কৈছে করবি অভিসার।
হরি রহ মানস-সুরধুনী পার।"

—গোবিন্দদাস।

১২শ অধ্যায়— মহাভাবস্বরূপিনী শ্রীরাধার চিত্র এখানে কল্পিত হয়েছে। মিলনের আনন্দের মধ্যেও বিরহের আশঙ্কায় সে ব্যাকুল। বৈষ্ণবশাস্ত্রে একেই বলা হয় 'প্রেমবৈচিত্ত্য'। এর লক্ষণ :

"প্রিয়স্য সন্নিকর্ষেহপি, প্রেমোৎকর্ষ-স্বভাবতঃ।
যা বিশ্লেষধিয়ার্তিস্তৎ প্রেমবৈচিত্ত্যমুচ্যতে॥"

অকল্পনীয় তাঁর পরিপূর্ণতা—তুলনীয় :

"পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।"

কৃষ্ণের মধ্যে ঐশ্বর্য এবং মাধুর্য দুই-ই আছে, কিন্তু ঐশ্বর্যভাবের উপাসনা অপেক্ষা মাধুর্যভাবের উপাসনাই গোস্বামীমতে ভগবানের প্রিয়। তাই চৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীকৃষ্ণের উক্তিরূপে বলা হয়েছে :

"ঐশ্বর্য্য জ্ঞানেতে সব জগৎ মিশ্রিত।
ঐশ্বর্য্যশিথিল প্রেমে নাহি মোর প্রীত॥"

রাগময়ী ও রাগানুগা ভক্তি মাধুর্যভাবের এবং বৈধী ভক্তি ঐশ্বর্যভাবের উপাসনা। ঐশ্বর্যগুণে অসীম হয়েও মাধুর্যগুণে তিনি সসীম হতে পারেন। তুলনীয় :

"সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর।
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর।"

—রবীন্দ্রনাথ।

অভিমান পরম প্রেমেরই অভিব্যক্তি। তাই এখানে শ্রীরাধার অভিমান ও শ্রীকৃষ্ণের মানভঞ্জনের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। শ্রীমতী কৃষ্ণের পূর্ণস্বরূপ জানবার আকাঙ্ক্ষা

করেছিল। সেই আকাঙ্ক্ষা মিটাবার জন্যই রাসলীলার পরিকল্পনা। এখানে রাসলীলার বর্ণনাটিকেও শ্রীরাধার অনুভব-উপলব্ধির মধ্যেই রাখা হয়েছে। এ এক দিব্যানুভূতি।

এ অধ্যায়ে মূলতঃ ভাগবত অনুসারেই রাসলীলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু সমগ্র বিশ্ব-ভুবনের গতিচ্ছন্দের নৃত্যপ্রতীকরূপে তাকে উপস্থাপিত করা হয়েছে। কারণ তত্ত্বকে শিল্পে প্রকাশ করাই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য।

রাসলীলার মধ্য দিয়েই বোঝা গেল কৃষ্ণের বিস্ময়কর অচিন্ত্য স্বরূপ, যাকে উপনিষদ বলেছে "অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্।"

১৩শ অধ্যায়— পরম মিলনের জন্য চরম বিরহ প্রয়োজন, তাই শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন ত্যাগ করে মথুরা যাত্রা। দুর্ভাগ্যের প্রতীকরূপে অক্রুরের রথ এগিয়ে আসছে যমুনাতীর ধরে।

শ্রীমতীকে এখানে সেবাপরায়ণা দেখা যায়। মধুর ভাবের উপাসনায় সেবাই প্রধান। দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর—এই সমস্ত রকম ভাবের মধ্যেই সেবাভাবের অস্তিত্ব অপরিহার্য।

ভগবৎসেবা মনে করে যে সমস্ত কাজের সঙ্গে নিজেকে আনন্দে যুক্ত করে সেই কর্মযোগী, আর যে ফলাফলের আকাঙ্ক্ষা না রেখে কর্তব্যকর্মমাত্র সম্পন্ন করে সেই কর্মসন্ন্যাসী। বস্তুতঃ উভয়েরই তাৎপর্য এক।

তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক্—পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণই শুদ্ধ প্রেমের লক্ষণ। এরই অন্য নাম শরণাগতি। তাই গীতার বাণী—"সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।" তুলনীয় :

"তোমারি ইচ্ছা হউক পূর্ণ করুণাময় স্বামী।"

—রবীন্দ্রনাথ।

সব রস আজ এসে······মুধুর রসে—পঞ্চরসের একত্র সমাবেশ হয়েছে শ্রীমতীকে কেন্দ্র করে। বড়িমা শান্তরসের সাধিকা। ধেনু-বৎস দাস্যভাবের প্রতীক। রাখালদের মধ্যে

সখ্যরস। যশোদা বাৎসল্যরসের আধার। আর শ্রীমতী মধুর রসের মূর্তিমতী বিগ্রহ। শ্রীরাধার মধ্যে যে কান্তা-প্রেম, তাকেই বৈষ্ণবশাস্ত্রে 'সর্বসাধ্যসার' শুধু নয় 'সাধ্যশিরোমণি' বলা হয়েছে। যথা—

"ইহার মধ্যে রাধার প্রেম সাধ্যশিরোমণি।
যাহার মহিমা সর্বশাস্ত্রেতে বাখানি॥"
—চৈতন্যচরিতামৃত॥" মধ্যলীলা।

মধুর রসে অন্য সমস্ত রসের গুণই পরপর বর্তমান। যেমন—

কৃষ্ণনিষ্ঠা = শান্তরস
কৃষ্ণনিষ্ঠা + কৃষ্ণসেবা = দাস্যরস
কৃষ্ণনিষ্ঠা + কৃষ্ণসেবা + কৃষ্ণে অসঙ্কোচ = সখ্যরস
কৃষ্ণনিষ্ঠা + কৃষ্ণসেবা + কৃষ্ণে অসঙ্কোচ + কৃষ্ণে মমতাধিক্য = বাৎসল্যরস
কৃষ্ণনিষ্ঠা + কৃষ্ণসেবা + কৃষ্ণে অসঙ্কোচ + কৃষ্ণে মমতাধিক্য + নিজাঙ্গদ্বারা কৃষ্ণসেবন = মধুররস।

১৪শ অধ্যায়— রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলার দুইটি প্রধান পর্ব—মিলন ও বিরহ। বৈষ্ণবশাস্ত্রে একে বলা হয়েছে সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ। প্রবাসেই এই বিরহ বা বিপ্রলম্ভরসের প্রকাশ। এই অধ্যায় থেকে বিরহিনী রাধিকার হৃদয়ানুভবের ক্রম-বিকাশ ও পরমপ্রেমের ক্রম-গভীরতা দেখবার চেষ্টা হয়েছে।

জড়িমাদশা—অষ্টসাত্বিক লক্ষণের প্রথম লক্ষণ যাকে বলা হয় স্তম্ভ।

দশমীদশা—বিরহের দশ দশার শেষদশা, যাকে বলে মৃত্যুদশা। যেমন :

"চিন্তাত্র জাগরোদ্বেগৌ তানবং মলিনাঙ্গতা।
প্রলাপো ব্যধিরুন্মাদো মোহো মৃত্যুর্দশা দশ॥"
—উজ্জ্বলনীলমণি।

এই অধ্যায়ে রাধাকে অতীত স্মৃতি মনে করিয়ে দিতে গিয়ে সখীরা যে ভারবহন ও ছত্রধারণের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছে তার বর্ণনা আছে বড়ু চণ্ডীদাস রচিত 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন' গ্রন্থের ভারখণ্ড ও ছত্রখণ্ডে। পূর্বস্মৃতি জাগরণের ফলে শ্রীরাধার মন কৃষ্ণময় হয়ে গেছে এবং চারদিকে সর্বপদার্থেই কৃষ্ণদর্শন হচ্ছে। তুলনীয়:

"যাহা যাহা নেত্র পড়ে তাহা কৃষ্ণ স্ফুরে।"

কখনো হাসছে কখনো কাঁদছে শ্রীমতী—দশদশার অন্তর্গত উন্মাদদশার লক্ষণ। তুলনীয়:

"যার মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্র করেন উদয়।
তার বাক্য ক্রিয়া মুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয়॥"

—চৈতন্যচরিতামৃত।

১৪শ অধ্যায়— আমায় তোরা গরল এনে দে—তুলনীয়:

"সো হি যদি ত্যজল কি কাজ ইহ জীবনে
আনহ সখী গরল করি গ্রাসে।"

যেন সে একবার এ হারখানি গলায় পরে—তুলনীয়:

"নিকুঞ্জে রাখিনু এই মোর হিয়ার হার।
পিয়া যেন গলায় পরয়ে একবার॥" —শেখর।

এসবই শ্রীরাধার দশমী দশার উক্তি।

মাধুর্যভূমি থেকে ঐশ্বর্যনিকেতনে প্রবেশ করতে পারবে কোন সখী—যারা শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্যভাবের ভক্ত তারা ঐশ্বর্যভাব সহ্য করতে পারে না। মাধুর্যভূমি বৃন্দাবন ত্যাগ করে ঐশ্বর্যনিকেতন মথুরায় প্রবেশ করা তাই তাদের পক্ষে অতি কঠিন।

মহাদুর্যোগের দিনেই সে⋯ ⋯ দুয়ারে এসে—তুলনীয়:

"যে-রাতে মোর দুয়ারগুলি ভাঙল ঝড়ে।
জানি নাই তো তুমি এলে আমার ঘরে॥"

—রবীন্দ্রনাথ।

অথবা, "আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার।
পরাণসখা বন্ধু হে আমার॥" —রবীন্দ্রনাথ।

১৫শ অধ্যায়— ঐশ্বর্যভূমি মথুরায় বৃন্দার অভিজ্ঞতা এ অধ্যায়ে বিবৃত হয়েছে। মথুরায় ভগবান ঐশ্বর্যময়। এই ঐশ্বর্য্যময় ভগবানকে লাভ করা যায় যোগমার্গ অবলম্বনে। তাই যোগীর ষট্‌চক্রভেদের মত ছয়টি দ্বার অতিক্রম করে তবেই সপ্তম দ্বারে কৃষ্ণমহারাজের দর্শন পেয়েছিল বৃন্দা। যোগসাধনায় অষ্টসিদ্ধি লাভ হয়ে থাকে, কিন্তু প্রকৃত ভক্ত তা তুচ্ছজ্ঞানে ত্যাগ করে। বৃন্দাও মথুরা থেকে যে মূল্যবান সাজসজ্জা নিয়ে এসেছিল তা কৌতুকভরে ত্যাগ করেছিল।

প্রথম তোরণ—ষট্‌চক্রের প্রথম মূলাধার চক্র—রক্তবর্ণ—চতুর্দল পদ্ম।

দ্বিতীয় তোরণ—দ্বিতীয় চক্র স্বাধিষ্ঠান—রক্তাভ ষড়দল পদ্ম।

তৃতীয় তোরণ—তৃতীয় চক্র মণিপুর—নীলবর্ণ দশদল-পদ্ম। এক এক চক্রভেদ করে এক একটি বিভূতি লাভ হচ্ছে।

চতুর্থ তোরণ—অনাহত চক্র—বান্ধুলি পুষ্পের ন্যায় লোহিতবর্ণ দ্বাদশদল পদ্ম।

পঞ্চম তোরণ—বিশুদ্ধ চক্র—ধূম্রাভ ষোড়শদল পদ্ম।

ষষ্ঠ তোরণ—আজ্ঞা চক্র—শুভ্র জ্যোতির্ময় দ্বিদল পদ্ম।

স্বর্ণময় পদ্মসিংহাসন—ষট্‌চক্র ভেদ করে যোগীর মন যে সহস্রারএ গিয়ে পৌছায় তার বর্ণনা—স্বর্ণাভ সহস্রদলপদ্ম। সেখানেই সর্বৈশ্বর্যময় বিশ্বপতির সঙ্গে সাক্ষাত হয়।

অতিপ্রিয় সেই পরিচিত বেশ—মাধুর্যরূপ। ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্যরূপের আড়ালেই তাঁর মাধুর্যরূপ বর্তমান থাকে।

বায়ু প্রবাহিত হচ্ছে মধুচ্ছন্দে······মধুময়—তুলনীয় :

“ওঁ মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।
মাধ্বীর্ণঃ সন্ত্বোষধী :
মধু নক্তমুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ।
মধুমান্নো বনস্পতির্মধুমাং অস্তু সূর্য :।”

প্রতিজ্ঞা-বাক্য—“বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি॥”

১৬শ অধ্যায়— আনন্দচেতনায় আত্মহারা শ্রীমতী—সর্বত্র ইষ্টদর্শনে দিব্যানন্দ।

"কত বিরাট হয়ে দেখা দিলে তুমি
আবার কত ছোট হয়ে তুমি ধরা দিলে" } —তুলনীয় :

"অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্।"

আনন্দ-বিহ্বল শ্রীমতী—তুলনীয় :

"সুন্দর বহে আনন্দমন্দানীল,
সমুদিত প্রেমচন্দ্র, অন্তর পুলকাকুল ॥"

—রবীন্দ্রনাথ

শ্রীমতী অন্ত পায় না এ সৌন্দর্যের—এ আনন্দের—তুলনীয় :

"তার অন্ত নাই গো যে আনন্দে গড়া আমার অঙ্গ
তার অণু-পরমাণু পেল কত আলোর সঙ্গ
ও তার অন্ত নাইগো নাই।" —রবীন্দ্রনাথ

এই দর্শন অদর্শন—তুলনীয় :

"তোমায় নতুন করে পাব বলে হারাই ক্ষণে-ক্ষণ
ও মোর ভালোবাসার ধন।
দেখা দেবে বলে তুমি হও যে অদর্শন
ও মোর ভালোবাসার ধন ॥" —রবীন্দ্রনাথ।

দিব্যোন্মাদ—ভগবৎ-প্রেমে উন্মত্তবৎ অবস্থাই দিব্যোন্মাদ। এই অধ্যায়ে শ্রীমতী রাধার এই দিব্যোন্মাদ অবস্থাই বর্ণনা করা হয়েছে। এরই নাম মহাভাব। নীলাচলে মহাপ্রভুরও এরূপ অবস্থা হয়েছিল।

১৭শ অধ্যায়— এ অধ্যায়ে রাধা চিন্ময়ীরূপা। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মানসে তার নিত্যমিলন। কৃষ্ণচিন্তা করে শ্রীরাধা সবকিছু কৃষ্ণময় দেখতে পাচ্ছে, এমন কি নিজেও সে কৃষ্ণময় হয়ে যাচ্ছে। তুলনীয় :

"অনুখন মাধব মাধব সোঙরিতে
সুন্দরী ভেলি মাধাই।"

কৃষ্ণ অঙ্গ আজ গৌরাঙ্গ হোক—চৈতন্য অবতারের সূচনা এখানেই। এর পরই বৃন্দাবনলীলার অনুবৃত্তি হবে নবদ্বীপ-লীলায়—যা বর্তমানে গ্রন্থের দ্বিতীয় পর্বে বিবৃত।

পরম প্রেম ঃ দ্বিতীয় পর্ব

২য় অধ্যায়— **অনুক্ষণ গঙ্গাজল**···আকর্ষণ করে এনেছেন—এ বিষয়ে চৈতন্যচরিতামৃতে আছে—

"গঙ্গাজল তুলসী-মঞ্জরী অনুক্ষণ।
কৃষ্ণপাদপদ্ম ভাবি করে সমর্পণ॥
কৃষ্ণের আহ্বান করেন করিয়া হুঙ্কার।
এ মতে কৃষ্ণেরে করাইল অবতার॥"—আদিলীলা, ৩য়।

অকৃষ্ণবর্ণ অবতারের ইঙ্গিত—ভাগবতে শ্লোক আছে—

"কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র-পার্ষদম্।
যজ্ঞৈ সংকীর্তন-প্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥" ১১।৫।২৯

কে কার পতিপুত্র···মোহমাত্র—"কে কস্য পতিপুত্রাদ্যা মোহ এবহি কারণম্।"

ঈশ্বরপুরী—মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য এবং চৈতন্যদেবের দীক্ষাগুরু।

তীর্থীভূত—তুলনীয় ঃ

"ভবদ্বিধা ভাগবতাস্তীর্থীভূতাঃ স্বয়ংপ্রভো।
তীর্থীকুর্বন্তি তীর্থানি স্বান্তস্থেন গদাভৃতা॥" ১।১৩।৮

রুক্মিনীদেবীর কাহিনী—ভাগবতে ১০ম স্কন্ধে ৬০ সংখ্যক অধ্যায়ে বর্ণিত আছে।

৩য় অধ্যায়— গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার বিবাহের বর্ণনা 'চৈতন্যভাগবত' অনুযায়ী করা হয়েছে।

পবিত্র বেদমন্ত্র—যথা "যদিদং হৃদয়ং মম তদিদং হৃদয়ং তব।"
এবং "মম ব্রতে তে হৃদয়ং দদাতু, মম চিত্তমনু

৪র্থ অধ্যায়— শ্রীরাধার নামানুরাগ—"সই কেবা শুনাইল শ্যামনাম।
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ॥

না জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো
কেমনে পাইব সই তারে ॥"

—চণ্ডীদাস।

'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' ডাক ছেড়ে চিৎকার করছে—গয়া থেকে ফিরে আসার পরই গৌরাঙ্গের মধ্যে এরূপ ভাবান্তর দেখা যায়। এই অধ্যায়ে সে অবস্থার চিত্রই বর্ণিত।

কৃষ্ণবর্ণ—দুইপ্রকার অর্থে ব্যবহৃত—(১) কৃষ্ণরূপ, (২) কৃষ্ণশব্দের অন্তর্গত বর্ণ বা অক্ষর অর্থাৎ কৃষ্ণনাম।

৫ম অধ্যায়— শুধু জানি নীরবে অপেক্ষা করতে—প্রতীক্ষা প্রেমেরই লক্ষণ।
তুলনীয় :

"প্রভু তোমা লাগি আঁখি জাগে।
দেখা নাহি পাই পথ চাই সেও মনে ভাল লাগে।"

—রবীন্দ্রনাথ।

বিশ্বরূপ—গৌরাঙ্গের বড় ভাই। তিনিও পূর্বেই সন্ন্যাসী হয়ে গৃহত্যাগ করেছিলেন।

স্বস্তি পাচ্ছে না বিষ্ণুপ্রিয়া—কারণ "রূপে তোমায় ভোলাব না ভালবাসায় ভোলাবো।"

—রবীন্দ্রনাথ।

বার বার প্রদীপ নিভে যেতে লাগল—তুলনীয় :

"যতবার আলো জ্বালাতে যাই
নিভে যায় বারে বারে।"

—রবীন্দ্রনাথ।

৬ষ্ঠ অধ্যায়— শ্রীগৌরাঙ্গের মধ্যে দিব্যভাব জাগরণের বিভিন্ন কারণ বলা হয়েছে। (১) বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রেম, (২) গয়াধামে বিষ্ণু-পাদপদ্মদর্শন, (৩) ঈশ্বরপুরী কর্তৃক দীক্ষাদান।

আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিইচ্ছা—চৈতন্যচরিতামৃতে আছে—

"আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥
অতএব কামপ্রেম বহুত অন্তর।
কাম অন্ধতম প্রেম নির্মল ভাস্কর॥"

এ বড় নিষ্ঠুর খেলা—তুলনীয় :

"নয় এ মধুর খেলা—
কতবার যে নিবল বাতি গর্জে এল ঝড়ের রাতি
সংসারের এই দোলায় দিলে সংশয়েরই ঠেলা।"

—রবীন্দ্রনাথ।

৭ম অধ্যায়— ভবিষ্যত দুঃখ-আঘাতের জন্য বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রস্তুতির কথা দিয়ে এই অধ্যায়ের আরম্ভ।

দুঃখের মাধুরী—তুলনীয় :

"দুখের মাধুরীতে করিল দিশাহারা।"

—রবীন্দ্রনাথ।

বেদনার দান—তুলনীয় :

"তোমার হাতের বেদনার দান
এড়ায়ে চাহি না মুকতি।"

—রবীন্দ্রনাথ।

জেনে শুনে পান করব—তুলনীয় :

"আমি জেনে শুনে বিষ করেছি পান।
প্রাণের আশা ছেড়ে সঁপেছি প্রাণ॥"

—রবীন্দ্রনাথ।

৮ম অধ্যায়— শরণাগতির ছয়টি শীতলছায়া—শরণাগতি ছয়প্রকার। যথা—

"আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ প্রাতিকূল্যবিবর্জনম্।
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা॥
আত্মনিক্ষেপকার্পণ্যে ষড়বিধা শরণাগতি॥"

তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক্—তুলনীয় :

"তোমারি ইচ্ছা পূর্ণ হউক করুণাময় স্বামী।"

—রবীন্দ্রনাথ।

তোমার প্রেমে সংশয় না জাগে—তুলনীয় :

"দুখের রাতে নিখিল ধরা যেদিন করে বঞ্চনা
তোমারে যেন না করি সংশয়।"—রবীন্দ্রনাথ।

৯ম অধ্যায়— নববিধাভক্তি—"শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥
ইতি পুংসর্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়তে ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্॥"

—ভাগবত ॥ ৭।৫।২৩-২৪ ॥

সুখ-দুঃখ যা কিছু দেবেন—তুলনীয় :

"তুমি নিজহাতে যাহা সঁপিবে তাহা মাথায় তুলিয়া লব।
আমি কী আর কব॥"—রবীন্দ্রনাথ।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—গৌরাঙ্গের সন্ন্যাসজীবনের নাম।

১০ম অধ্যায়— শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীচৈতন্য যে অভিন্ন—এই অধ্যায়ের আরম্ভে বৈষ্ণবীর গানে এবং বিষ্ণুপ্রিয়ার দিব্যদর্শনে তারই আভাস দেওয়া হয়েছে।

অন্তরে কৃষ্ণ বাহিরে গৌর—"অন্তঃকৃষ্ণং বহির্গৌরং
দর্শিতাঙ্গাদিবৈভবম্।
কলৌ সংকীর্তনাদ্যৈঃ স্মঃ
কৃষ্ণচৈতন্যমাশ্রিতাঃ॥"

—ভাগবৎসন্দর্ভ।

১১শ অধ্যায়— এই অধ্যায়ে বিষ্ণুপ্রিয়ার উপলব্ধির মধ্য দিয়ে শচীমাতাপূর্বর পূর্ব জন্মের আভাস দেওয়া হয়েছে। সত্যযুগে দেবহূতি, ত্রেতাযুগে কৌশল্যা, দ্বাপরে দেবকীরূপে শচীমাতা পুত্র বিচ্ছেদের শোক সহ্য করেছেন।

সাধনার নির্দিষ্ট ক্রমগুলি—যথা—

"আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাত্ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ॥
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্নঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ॥"

—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু।

তদ্‌বিস্মরণে পরমব্যাকুলতা—নারদভক্তিসূত্রে পরাভক্তির লক্ষণ—

"নারদস্তু তদর্পিতাখিলাচারতা তদ্বিস্মরণে পরমব্যাকুলতেতি।"

চিত্তদর্পণের মার্জনা হয় ইত্যাদি—মহাপ্রভু কথিত শিক্ষাষ্টকের একটি শ্লোকে এসব কথা বলা হয়েছে। মূল শ্লোকটি হচ্ছে—

"চেতো দর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপনং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তনম্॥"

কেবল হরিনাম, অন্য কোনো গতি নেই—

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥"

তাঁর নামগ্রহণই দান-যজ্ঞ ইত্যাদি—যথা :

"তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্যা
ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে॥"—ভাগবত॥ ৩।৩৩।৭

পদানুকীর্তনে কর্মবন্ধনমুক্তি ইত্যাদি— যথা :

"নতেঃ পরং কর্ম্মনিবন্ধকৃন্তনং
মুমুক্ষতাং তীর্থ-পদানুকীর্তনাৎ।
ন যৎ পুনঃ কর্ম্মসু সজ্জতে মনো-
রজস্তমোভ্যাং কলিলং ততোঽন্যথা॥ ভা—৬।২।৪৬

পদ্মপুরাণে— "সকৃদুচ্চারিতং যেন হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্।
বদ্ধঃ পরিকরস্তেন মোক্ষায় গমনং প্রতি॥"

উত্তরখণ্ড। ৪৬ অধ্যায়

গরুড়পুরাণে—"যদিচ্ছসি পরং জ্ঞানং জ্ঞানাৎ যৎ পরমং পদম্।
তদাদরেণ রাজেন্দ্র কুরু গোবিন্দকীর্তনম্॥"

প্রভাসখণ্ডে—"সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা
ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম॥"

১২শ অধ্যায়— কৃষ্ণনামকীর্তনেই সর্বকার্য-সিদ্ধ হয়—ভাগবতে আছে :

"কলিং সভাজয়ন্ত্যার্য্যা গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ।
যত্র সংকীর্তনেনৈব সর্বস্বার্থোঽপি লভ্যতে॥" ১১।৫।৩৩

বেদনানয় মধুর আনন্দ—তুলনীয় :

"নিবিড় বেদনাতে পুলক লাগে গায়ে।" —রবীন্দ্রনাথ।

১৩শ অধ্যায়— রুদ্ধ করে দিয়েছে বহিরিন্দ্রিয়ের দ্বার—তুলনীয় :

"আমার বাহির দুয়ারে কপাট লেগেছে
ভিতর দুয়ার খোলা" —চণ্ডীদাস।

বৈষ্ণব-অপরাধ—ভক্তবৈষ্ণবদের নামাপরাধ, সেবাপরাধ প্রভৃতি নানাপ্রকার অপরাধ আছে। তাহার মধ্যে বৈষ্ণব-অপরাধ অতীব গুরুতর।

ভবিষ্যত কর্মযজ্ঞ—পরবর্তীকালে বৈষ্ণবধর্মপ্রচারের ক্ষেত্রে শ্রীনিবাস আচার্যের অবদান অপরিসীম।

১৪শ অধ্যায়— নামময় জীবন—তুলনীয় :

"তোমারি নামে জীবনসাগরে
জাগিল লহরীলীলা।" —রবীন্দ্রনাথ।

অথবা "জীবনপদ্মে সঙ্গোপনে রবে নামের মধু,
তোমায় দিব মরণক্ষণে তোমারি নাম বঁধু॥"
—রবীন্দ্রনাথ।

অন্তর্দশা—প্রেম-সমাধির অবস্থা।

প্রিয়াজীর লীলারহস্য—ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

রোদনই সর্বশ্রেষ্ঠ ভজন—তুলনীয় :

"আজ গাঁথল কে সেই অশ্রুমালা
তোমার গলার হার হল।" —রবীন্দ্রনাথ।

অথবা "নয়নজলে ভেসে হৃদয় চরণতলে লুটল রে।"

—রবীন্দ্রনাথ।

১৫শ অধ্যায়— বিপ্রলম্ভ প্রতিমা—বিরহের প্রতিমা।

শ্রীবৃন্দাবনের যুগল-কিশোরের রসবিলাস একটি গতিমতী প্রবাহিনীর মত। এই প্রবাহের দুইটি তট। মিলন আর বিরহ—সম্ভোগ আর বিপ্রলম্ভ।"

—মহানামব্রত ব্রহ্মচারী।

অর্চ্চা-বিগ্রহ—ভক্তি-বিধি অনুসারে অর্চিত বিগ্রহ।

অধিচেতনা—অতিচেতনা। ঊর্ধ্বতন চেতনা। সাধনার দ্বারা এ চেতনার জাগরণ হয়। এই চেতনায় প্রাপ্ত বাণীই দৈববাণী।

তটস্থাশক্তি—বৈষ্ণবশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণের তিনটি শক্তির কথা বলা হয়েছে। (১) অন্তরঙ্গা অর্থাৎ চিৎ-শক্তি, (২) বহিরঙ্গা মায়াশক্তি, (৩) তটস্থা অর্থাৎ জীবশক্তি।

"চিচ্ছক্তি, স্বরূপশক্তি, অন্তরঙ্গা নাম।
তার বৈভাবানন্ত বৈকুণ্ঠাদি ধাম॥
মায়াশক্তি বহিরঙ্গা জগৎ-কারণ।
তাহার বৈভাবানন্ত ব্রহ্মাণ্ডের গণ॥
জীবশক্তি তটস্থাখ্য নাহি যার অন্ত।
মুখ্য তিন শক্তি তার বিভেদ অনন্ত॥"

—চৈতন্যচরিতামৃত।

তটস্থাশক্তি অন্য দুই শক্তির মাঝখানে অবস্থিত। জীবশক্তি তটস্থা এজন্য যে চৈতন্যযুক্ত বলে অন্তরঙ্গা বা স্বরূপশক্তির সঙ্গে যুক্ত আবার বহির্মুখী বলে বহিরঙ্গা বা মায়াশক্তির সঙ্গে যুক্ত। তাই যে কোনো দিকে যাবার শক্তি জীবের আছে।

অচিন্ত্যভেদাভেদ—এই জীবশক্তি বা তটস্থাশক্তির সঙ্গে ব্রহ্মের ভেদও আছে আবার অভেদও আছে, যা সাধারণ জ্ঞানে চিন্তা করা যায় না। তাই এই তত্ত্বকে অচিন্ত্য-ভেদাভেদ আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

ছদ্ম-সন্ন্যাসী—'ভূমিকা' দ্রষ্টব্য।

১৬শ অধ্যায়— গুরুপ্রদর্শিত পথে যাত্রা করল ইষ্টসকাশে—বংশীবদনের গুরু বিষ্ণুপ্রিয়া এবং ইষ্ট শ্রীচৈতন্য।

রূপাতীতলোকে—তুলনীয় :

"অরূপ তোমার বাণী
অঙ্গে আমার চিত্তে আমার মুক্তি দিক সে আনি।"

—রবীন্দ্রনাথ।

গম্ভীরা—দেবমন্দিরের অভ্যন্তর অথবা নিঃসঙ্গ গভীরতাময় ভজন-স্থান।

ষোলো নাম বত্রিশ অক্ষর—তারকব্রহ্মনাম। যথা—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

প্রতি ছত্রে আট নাম হিসাবে ষোলো নাম আছে এবং প্রতি নামে দুই অক্ষর হিসাবে বত্রিশ অক্ষর আছে।

আপনা থেকেই জিহ্বায় স্ফুরিত হয়—

"যাহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম।
নিশ্চয় জানিও সেই বৈষ্ণবপ্রধান॥"

—চৈতন্যচরিতামৃত।

নীরেন্দ্র গুপ্ত : ২৪৬

১৭শ অধ্যায়— ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথি—১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ফাল্গুনী পূর্ণিমায় শ্রীচৈতন্যদেব আর্বিভূ´ত হন।

ভক্তিপরিভাবিত হৃদয়সরোজে—তুলনীয় :

"ত্বং ভক্তিযোগপরিভাবিতহৃৎসরোজ
আস্সে শ্রুতেক্ষিতপথো ননু নাথ পুংসাম্।"
—ভাগবত॥ ৩।৯।১১॥

বিরহবিদ্ধা ও বিরহসিদ্ধা—বিষ্ণুপ্রিয়ার বিরহ রাধাবিরহ অপেক্ষাও দুঃসহ। কারণ ভূমিকায় বিশ্লেষিত হয়েছে।

—